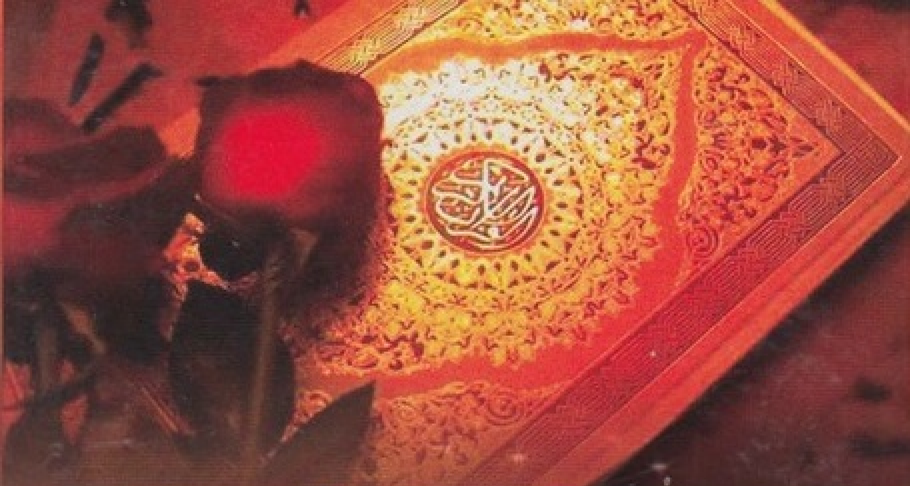


সাইয়েদ কুতুব

আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য

আল-কুরআনের

শৈল্পিক সৌন্দর্য

সাইয়েদ কুতুব

ভাষান্তর ঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
দোকান নং - ২০৯, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০,
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ০১৭১২-১৮৫০০০।

আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য
সাইয়েদ কুতুব

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৭ ইংরেজি
৬ষ্ঠ প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ঃ ২০১৩ ইংরেজি
জিলক্বদ ঃ ১৪৩৪ হিজরী
আশ্বিন ঃ ১৪২০ বাংলা

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা রশিদুল হাসান
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
আবদুল্লাহ্ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
৬৮, ফকিরাপুল,
ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা।

মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা

ISBN : 984-8455-15-3

প্রকাশকের কথা

আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য গ্রন্থটি আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৭ সালে প্রথম এবং ২০০১ সালে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশ করে। মাস তিনেক আগে অনুবাদক সাহেব আমাদের কাছে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য নিয়ে আসে। অনুবাদকের কাছ থেকে অনুবাদস্বত্ব নিয়ে আমরা এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছি।

আল্লাহ্ অহী এ কুরআনকে অনুপম রচনাশৈলীর মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য লেখক যেমন মহান আল্লাহ্র কাছে পুরস্কৃত হবেন। তেমনি বর্তমান মুসলিম জাতির কাছেও অমর হয়ে রইলেন। সাথে সাথে এর অনুবাদকও বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে অপূর্ব এ গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতার জালে আবদ্ধ হয়ে রইলেন।

খায়রুন প্রকাশনী এ গ্রন্থখানী প্রকাশ করে জাতির কাছে ভালো ভালো গ্রন্থ উপহার দেওয়ার তাদের যে ওয়াদা তা পূরণ করে যাচ্ছে।

প্রকাশক

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ নাম সাইয়েদ। কুতুব তাঁদের বংশীয় উপাধি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরব উপদ্বীপ থেকে এসে মিসরের উত্তরাঞ্চলে মূসা নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী ইবরাহীম কুতুব। মায়ের নাম ফাতিমা হুসাইন ওসমান। তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাহ্ভীরু মহিলা ছিলেন। সাইয়েদ কুতুব ১৯০৬ সনের ২০শে জানুয়ারী শুক্রবার পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বড় সন্তান। মেজো মুহাম্মদ কুতুব। তারপর তিন বোন, হামিদা কুতুব, আমিনা কুতুব, তৃতীয় বোনের নাম জানা যায়নি।

শিক্ষা জীবন ঃ মায়ের ইচ্ছেনুযায়ী তিনি শৈশবেই পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থ (হিফ্য) করেন। অতপর গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয়। তখনকার একটি আইন ছিল, কেউ যদি তার সন্তানকে মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে ইচ্ছে করতেন তাহলে সর্বপ্রথম তাকে কুরআন হিফ্য করাতে হতো। যেহেতু পিতা-মাতার ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল তাদের বড় ছেলে সাইয়েদকে আল-আজহারে পড়াবেন, তাই তাকে হাফেযে কুরআন বানান। পরবর্তীতে পিতা মূসা গ্রাম ছেড়ে কায়রোর উপকণ্ঠে এসে হালওয়ান নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন এবং তাঁকে তাজহীযিয়াতু দারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। এ মাদ্রাসায় শুধু তাদেরকেই ভর্তি করা হতো যারা এখান থেকে পাশ করে কায়রো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাইত। তিনি এ মাদ্রাসা থেকে ১৯২৯ সনে কৃতিত্বের সাথে পাশ করে দারুল উলুম কায়রো (বর্তমান নাম কায়রো ইউনিভার্সিটিতে) ভর্তি হোন। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৩৩ সনে বি, এ, পাশ করেন এবং ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন ডিগ্রী লাভ করেন। এ ডিগ্রীই তখন প্রমাণ করতো, এ ছেলে অত্যন্ত মেধাবী।

কর্মজীবন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নেবার পর সেখানেই তাঁকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বেশ কিছুদিন সফলভাবে অধ্যাপনা করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। এ পদটি ছিল মিসরে অত্যন্ত সম্মানজনক পদ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেই তাঁকে ১৯৪৯ সনে শিক্ষার ওপর

গবেষণামূলক উচ্চতর ডিগ্রী সংগ্রহের জন্য আমেরিকা পাঠানো হয়। সেখানে দু'বছর লেখাপড়া ও গবেষণা শেষে ১৯৫১ সনে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আমেরিকা থাকাকালিন সময়েই বস্তুবাদী সমাজের দুরাবস্থা লক্ষ্য করেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, একমাত্র ইসলামই আক্ষরিক অর্থে মানব সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে।

এরপর তিনি দেশে ফিরে ইসলামের ওপর ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করেন। সেই গবেষণার ফসল 'কুরআনে আঁকা কিয়ামতের চিত্র' ও 'আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য'।

ইসলামী আন্দোলনে যোগদান ঃ আমেরিকা থেকে ফিরেই তিনি 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' নামক ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কর্মসূচী যাচাই করে মনোপুত হওয়ায় ঐ দলের সদস্য হয়ে যান। ১৯৫২ সনের জুলাই মাসে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তখন থেকে তিনি পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৪ সনে সাইয়েদ কুতুবের সম্পাদনায় ইখওয়ানের একটি সাময়িকী প্রকাশ করা হয়। কিন্তু দু'মাস পরই কর্ণেল নাসেরের সরকার তা বন্ধ করে দেন।

গ্রেফতার ও শাস্তি ঃ শুরু হয় ইখওয়ান নেতা ও কর্মীদেরকে গ্রেফতার ও নির্যাতন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুবও ছিল। সাইয়েদ কুতুবকে বিভিন্ন জেলে রাখা হয় এবং তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। তাঁরই এক সহকর্মী জনাব ইউসুফ আল আযম লিখেছেন ঃ 'নির্যাতনের পাহাড় তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাঁকে আগুনে ছ্যাঁকা দেয়া হতো, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হতো, মাথার ওপর কখনো অত্যন্ত গরম পানি আবার কখনো অত্যন্ত ঠান্ডা পানি ঢালা হতো। লাথি, ঘুষি, বেত্রাঘাত ইত্যাদির মাধ্যমেও নির্যাতন করা হতো, কিন্তু তিনি ছিলেন ঈমান ও ইয়াকীনে অবিচল—নির্ভিক। —('শহীদ সাইয়েদ কুতুব' পৃষ্ঠা-৩০)।

১৯৫৫ সনের ১৩ই জুলাই বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁকে পনের বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। তাঁকে নির্যাতন করে এতো অসুস্থ ও দুর্বল করা হয়, যার ফলে তিনি আদালতে পর্যন্ত হাজির হতে পারেননি। এক বছর সশ্রম দণ্ড ভোগের পর নাসের সরকার তাকে প্রস্তাব করেন, তিনি যদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। মর্দে মুমিন এ প্রস্তাবের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। তিনি বলেছিলেন ঃ

আমি এ প্রস্তাবে এ কারণেই বিস্ময় বোধ করছি যে, একজন জালিম কি করে একজন মজলুমকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলতে পারে। আল্লাহ্‌র কসম! যদি ক্ষমা প্রার্থনার কয়েকটি শব্দ আমাকে ফাঁসি থেকেও রেহাই দিতে পারে তবু আমি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে রাজী নই। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে এমনভাবে পৌছুতে চাই যে, তিনি আমার ওপর এবং আমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট।

জেল থেকে মুক্তি লাভ ঃ ১৯৬৪ সনের মাঝামাঝি ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফ মিসর সফরে যান এবং তিনি সাইয়েদ কুতুবের মুক্তির সুফারিশ করেন। ফলে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। তিনি জেলে থাকা অবস্থায় দীর্ঘ ১০ বছরে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' রচনা করেন।

দ্বিতীয়বার গ্রেফতার ও শাহাদাত ঃ এক বছর যেতে না যেতেই তাঁকে ক্ষমতা দখলের চেষ্টার অপবাদ দিয়ে আবার গ্রেফতার করা হয়। সাথে চার ভাই-বোনসহ বিশ হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় ৭শ' মহিলাও ছিল।

অতপর নামমাত্র বিচার অনুষ্ঠান করে তাঁকে এবং তাঁর দুই সাথীকে ফাঁসির নির্দেশ দেয়া হয় এবং ১৯৬৬ সনের ২৯শে আগস্ট সোমবার তা কার্যকর করা হয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইল্লাইহি রাজিউন)।

সাইয়েদ কুতুব রচিত গ্রন্থাবলী

(ক) গবেষণামূলক ঃ

(১) ফী যিলালিল কুরআন (৬ খণ্ড)

(২) আত্ তাসবীরুল ফান্নী ফিল কুরআন (আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য)

(৩) মুশাহিদুল কিয়ামতি ফিল কুরআন (কুরআনে আঁকা কিয়ামতের চিত্র)

(৪) আল আদালাতুল ইজতিমাইয়্যা ফিল ইসলাম (ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার)

(৫) আস সালামুল 'আ'লামী ওয়াল ইসলাম (বিশ্বশান্তি ও ইসলাম)

(৬) দারাসাতে ইসলামীয়্যা (ইসলামী রচনাবলী)

(৭) মা'রিফাতুল ইসলাম ওয়ার রিসমালিয়াহ (ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব)

(৮) নাহ্‌যু মুজতামিউ' ইসলামী (ইসলামের সমাজ চিত্র)

(৯) মুয়াল্লিম ফিত্ তরীক (ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা)

(১০) হাযা আদ্ দ্বীন (ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা)

(খ) কাব্য ও কবিতা ঃ

১। কাফিলাতুর রাকীক (কাব্য)

২। হুলুমুল ফাজরী (কাব্য)

৩। আল শাতিয়্যুল মাজহুল (কাব্য)

(গ) উপন্যাস ঃ

১। আশওয়াক (কাঁটা)

২। তিফলে মিনাল ক্বারিয়া (গ্রামের ছেলে)

৩। মদীনাতুল মাসহুর (যাদুর শহর)

(ঘ) শিশু-কিশোরদের জন্য ঃ

১। কাসাসুদ দীনিয়াহ্ (নবী কাহিনী)

(ঙ) অন্যান্য ঃ

১। মুহিম্মাতুশ শায়ির ফিল হায়াত (কবি জীবনের আসল কাজ)

২। আল আত্‌ইয়াফুল আরবাআ' (চার ভাই বোনের চিন্তাধারা)

৩। আমেরিকা আল্লাতি রাআইতু (আমার দেখা আমেরিকা)

৪। কিতাব ওয়া শাখছিস্যাত (গ্রন্থ ও ব্যক্তিত্ব)

৫। আন্ নাকদুল আদাবী উছুলুহু ওয়া মানাহাজাহু (সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নিবেদন

মুহতারামা আম্মা! আমি এ গ্রন্থখানাকে আপনার নামে নিবেদন করছি।

প্রিয় মা আমার! স্মৃতিপটে একথা এখনো জ্বলজ্বল করছে, প্রতিটি রমযান মাস এলে কারী সাহেব আমাদের ঘরে এসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তা কান লাগিয়ে পর্দার আড়াল থেকে তন্ময় হয়ে শুনতেন। যখন আমি শিশুসুলভ চীৎকার জুড়ে দিতাম তখন আপনি ইঙ্গিতে আমাকে চুপ করতে বলতেন। তখন আমিও আপনার সাথে কুরআন শ্রবণে শরীক হয়ে যেতাম। যদিও আমি তখন তা অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলাম না। কিন্তু আমার মনে আক্ষরিক উচ্চারণগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেতো। তারপর আমি যখন আপনার হাত ধরে হাটতে শিখলাম তখন আপনি আমাকে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আপনার বড় ইচ্ছে ছিল আল্লাহ্ যেন তাঁর কালামকে কণ্ঠস্থ করার জন্য আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন। অবশ্য আল্লাহ্ আমাকে খুশ ইলহানের মতো নিয়ামত দান করেছেন। আমি যেন আপনার সামনে বসে প্রায় সময় তা তিলাওয়াত করতে পারি। আমি পূর্ণ কুরআন হিফ্‌জ করে নিলাম। আপনার আকাংখার একটি অংশতো পূর্ণ হয়ে গেল।

প্রিয় আম্মা আমার! আজ আপনি আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এখনো আপনার সেই ছবি আমার স্মৃতিপটে অম্লান। ঘরে আপনি রেডিও সেটের কাছে বসে যেভাবে কারী সাহেবের তিলাওয়াত শুনতেন, আমি আজও সে স্মৃতি ভুলতে পারিনি। তিলাওয়াত শ্রবণরত অবস্থায় মুখমণ্ডল যে সুন্দর ও পবিত্র রূপ ধারণ করতো, আপনার মন-মস্তিকে তার যে প্রভাব পড়তো সে স্মৃতি আজও মূর্তমান আমার হৃদয় পটে।

ওগো আমার জন্মদাত্রী! আপনার সেই মা'সুম শিশুটি আজ নওজোয়ান যুবক। আপনার সেই চেষ্টার ফসল আজ আপনার নামে নিবেদন করছি। আল্লাহ্ যেন আপনার কবরের ওপর ভোরের শিশিরের মতো শান্তি অবতীর্ণ করেন এবং আপনার সন্তানকেও যেন মাহফুজ রাখেন।

আপনার সন্তান

সাইয়েদ কুতুব

আপনি কি কুরআন বুঝতে চান ? কুরআন যে এক জীবন্ত মুজিযা, সম্মোহনী শক্তির উৎস তা কি স্বীকার করেন ? আপনি কুরআন পড়েন ঠিকই কিন্তু তা আপনাকে পুরোপুরি আকৃষ্ট করতে পারে না, কিন্তু কেন ? এ কুরআনে এমন কাহিনী আছে যা রূপকথাকেও হার মানায়, এমন ছবি আছে যা আজ পর্যন্ত কোন শিল্পীই আঁকতে পারেনি, এমন সুরের মুর্ছনা ও ব্যাথার রাগিণী আছে যা সমস্ত সুরের জগতকে আচ্ছন্ন করে রাখে— এগুলোর সাথে আপনার পরিচয় হয়েছে কি ? না হলে আল-কুরআনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক, অমর কথাশিল্পী ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, হাফেজে কুরআন জনাব সাইয়েদ কুতুবের এ গ্রন্থখানা পড়ুন। এটি আপনাকে দেবে এক নতুন দিগন্তের পথ-নির্দেশ। আপনার সামনে উন্মুক্ত করে দেবে কুরআনের সমস্ত রহস্যের দ্বার। আপনি হারিয়ে যাবেন কুরআনের অসীমতায়, অতল গহনে। কোন শক্তিই আপনাকে ফেরাতে পারবে না সে গভীর মায়াপুরী থেকে।

সাইয়েদ কুতুব একজন গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন, এ পরিচয়েই ইসলামী দুনিয়া তাঁকে চেনেন। কিন্তু তিনি যে আধুনিক আরবী সাহিত্যের উঁচুস্তরের একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন এক অমর কথাশিল্পী সে কথা ক'জন খবর রাখেন। শুধু তাই নয়, শিল্পকলা, ললিত কলা, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাই আল-কুরআনকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। কারাজীবনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তিনি এ কুরআন নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি ছিলেন একদিকে হাফেজে কুরআন, অপরদিকে তাঁর মাতৃভাষা ছিল আরবী, আর এ দুটো দিকই গবেষণা কর্মে তাঁকে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

> আমার মতো এক অধম ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ, আমি যখন আল-কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছি, তখন তিনি আমার জন্য রহমতের সব ক'টি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আমাকে আল-কুরআনের রূহের এতো নিকটবর্তী করে দিয়েছেন, মনে হয় যেন কুরআন নিজেই বুঝি আমার জন্য তার সমস্ত সত্য ও রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। —(ফী যিলালিল কুরআনের মূল ভূমিকা থেকে)

এ মূল্যবান গ্রন্থখানার পরতে পরতে সাহিত্যের ছোঁয়া, এটি বিনিসূতার এক কথামালা। ভাষা এতো উন্নত ও সমৃদ্ধ যে, আমি ইতোপূর্বে তিনবার এ গ্রন্থখানা অনুবাদে মনস্থ করে বিরত রয়েছি। সাহস পাইনি। তাই বলে এটি অনুবাদের লোভও সম্বরণ করতে পারিনি। পরিশেষে চতুর্থবারে মহান আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি মিনতির সাথে কৃপাভিক্ষা চেয়ে এ মহান কাজে হাত দিয়েছি। কাজ পিঁপড়ের গতিতে আগালেও করুণাময়ের রহমতের পরশে তা পূর্ণতায় পৌঁছে গেল। তবে সাহিত্যের সেই উচ্চ মানটা পুরোপুরি ধরে রাখতে পেরেছি সে দাবি আমি করছি না, কিন্তু লেখক যা বুঝাতে চেয়েছেন তা আপনাদের সামনে হুবহু উপস্থাপনে স্বেচ্ছায় কোন ত্রুটি করিনি। তারপরও কথা থেকে যায়, আমি একেতো কোন বড় আলিম নই। তারপর আধুনিক আরবী সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান নেই বললেই চলে, তদুপরি আমি এক দুর্বল মানুষ, ভুল-ত্রুটিই যার নিত্যদিনের সাথী। তাই এ কাজ করতে গিয়েও হয়তো কোন জায়গায় ভুল করে থাকতে পারি, যা আমি এখনো অবগত নই। যদি কোন আল্লাহ্‌র বান্দার নিকট এ ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তবে মেহেরবানী করে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি পরবর্তীতে সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করবো, ইনশা আল্লাহ্‌।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে নতশিরে প্রার্থনা, তিনি যেন এ গ্রন্থের লেখককে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন। তার সাথে এ অধম অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকগণকেও যেন আল্লাহ্‌ মা'ফ করে দেন এবং জান্নাতে লেখকের সাথে মিলিত হবার তওফিক দেন। আরো মিনতি এই যে, লেখকের মতো আমাদের কাছেও যেন আল্লাহ্‌ তাঁর কুরআনে হাকীমের সমস্ত রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

সূচি পত্র

বিষয়

লেখকের কথা
আমি কুরআনকে কিভাবে পেয়েছি ? ১৫

প্রথম অধ্যায়
আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তি ১৯
হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১৯
ওয়ালীদ বিন মুগিরার ঘটনা ২১
আল কুরআন সম্মোহনী শক্তির উৎস ২৬
ইসলাম গ্রহণের মূল চালিকা শক্তি ২৭
আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তির উৎস কোথায় ? ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল-কুরআনের গবেষণা ও তফাসীর ৩৫
সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের যুগে তাফসীর ৩৭

তৃতীয় অধ্যায়
শৈল্পিক চিত্র ৪৭
ভাবকে বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ ৪৮
মনোজাগতিক চিত্র ৫৫
মানবিক চিত্র ৫৯
সংঘটিত বিপর্যয়ের চিত্র ৬৩
রূপক ঘটনাবলীর চিত্র ৬৭
১. বাগান মালিকদের কাহিনী ৬৭
২. দুটো বাগানের মালিকের কাহিনী ৬৯
প্রকৃত ঘটনাবলীর চিত্র ৭৩
১. হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) ৭৩
২. হযরত নূহ (আ)-এর প্লাবন ৭৪
কিয়ামতের চিত্র ৭৬
শাস্তি ও শাস্তির দৃশ্যাবলী ৮২

চতুর্থ অধ্যায়

কল্পনা ও রূপায়ণ ৯১

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ১১৫

শৈল্পিক বিন্যাসের ধরন ১১৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল-কুরআনের সুর ও ছন্দ ১৩৪

প্রথম অবস্থা ১৩৮

দ্বিতীয় অবস্থা ১৪০

বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল ১৪২

সপ্তম অধ্যায়

কুরআনী চিত্রের উপাদান ১৫৩

শৈল্পিক বিন্যাসের একটি সূক্ষ্ম দিক ১৬৫

কুরআনী চিত্রের স্থায়িত্বকাল ১৬৯

দীর্ঘ চিত্র ১৭৫

অষ্টম অধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী ১৮৮

আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১৮৯

১. ওহী ও রিসালাতের স্বীকৃতি ১৮৯

২. এক ও অভিন্ন দ্বীন ১৯১

৩. আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান ১৯৬

৪. সমস্ত নবী-রাসূল একই দাওয়াত দিয়েছেন ১৯৭

৫. প্রত্যেক নবী-রাসূলের দ্বীনের যোগসূত্র ২০০

৬. নবী-রাসূলদের সফলতা ও মিথ্যেবাদীদের ধ্বংস ২০১

৭. সুসংবাদ ও সতর্কীকরণের সত্যতা ২০৪

৮. নবী-রাসূলদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের বর্ণনা ২০৫

৯. আদম সন্তানকে শয়তানের শত্রুতা থেকে সতর্ক করা ২০৬

১০. অন্যান্য আরো কতিপয় কারণ ২০৬

নবম অধ্যায়

আল-কুরআনের ঘটনাবলী দ্বীনি উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়ার প্রমাণ ২০৭

কাহিনীর সংক্ষেপ ও বিস্তৃতি ২১৯

উপসংহার ও পরিণতি বর্ণনা ২২২
কাহিনী বর্ণনায় দ্বীনি ও শৈল্পিক সংমিশ্রণ ২২৬
কাহিনীর শৈল্পিক রূপ ২২৬

দশম অধ্যায়

কাহিনীর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ২৪০
১. বর্ণনার বিভিন্নতা ২৪০
২. হঠাৎ রহস্যের জট খোলা ২৪৩
৩. দৃশ্যান্তরে বিরতি ২৫০
৪. ঘটনার মাধ্যমে দৃশ্যাংকন ২৫৩
আবেগ অনুভূতির চিত্র ২৬০
কাহিনীতে ব্যক্তিত্বের ছাপ ২৬৬
১. চঞ্চল প্রকৃতির নেতা ২৬৬
২. কোমল হৃদয়— সহনশীল ব্যক্তিত্ব ২৭০
৩. হযরত ইউসুফ (আ) ২৭৪
৪. হযরত আদম (আ) ২৮০
৫. হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনা ২৮০

এগার অধ্যায়

মানুষের স্বরূপ ২৮৯
১. মানব প্রকৃতি ২৮৯
২. ঠুনকো বিশ্বাসী ২৯১
৩. সুবিধাবাদী ধূর্ত প্রকৃতির লোক ২৯২
৪. ভীরু কাপুরুষ ২৯৩
৫. হাসি-কৌতুক উদ্রেককারী লোক ২৯৩
৬. শুধু আকৃতিতেই মানুষ ২৯৪
৭. প্রশংসাকাংখী ২৯৪
৮. সুবিধাবাদী ২৯৪
৯. অদ্ভুদ অহংকারী ২৯৫
১০. ভীতু বেহায়া ২৯৫
১১.দুর্বল মুনাফিক ২৯৬
১২. ওজর আপত্তিকারী ২৯৬
১৩. নির্বোধ প্রতারক ২৯৭
১৪. বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ২৯৭

১৫. পার্থিব জীবনের মোহে মোহ্গ্রস্ত ২৯৭
১৬. গোঁয়ার ও স্থবির প্রকৃতির লোক ২৯৮
১৭. স্বেচ্ছাচারী দল ২৯৮
১৮. সত্য হোক কিংবা মিথ্যে, ঝগড়া তারা করবেই ২৯৮
১৯. কৃপণ ২৯৯
২০. ভেতর ও বাইরের বৈপরীত্য ৩০০
২১. মুমূর্ষু অবস্থায় তওবাকারী ৩০০
২২. স্বল্প বুদ্ধির লোক ৩০১
২৩. প্রকৃত ঈমানদার ৩০১
২৪. দরিদ্র অথচ অল্পে তুষ্ট ৩০১
২৫. আল্লাহ্কে ভয়কারী ৩০২
২৬. আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা ৩০২
২৭. দানশীল ও উদার ৩০২
২৮. ধৈর্যশীল ৩০৩
২৯. অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দানকারী ৩০৩
৩০. ক্রোধ দমনকারী ও অপরকে ক্ষমাকারী ৩০৩

বারো অধ্যায়

প্রজ্ঞা প্রসূত যুক্তি ৩০৪
আল-কুরআনের সহজ সরল বক্তব্য ৩০৭
তওহীদ (একত্ববাদ) সমস্যা ৩০৯
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ৩১২

আল-কুরআনের বর্ণনা রীতি ৩২০
উপসংহার ৩৩০
আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গির আরো একটি বৈশিষ্ট্য ৩৩৩
পরিশিষ্ট-১ ৩৩৫
পরিশিষ্ট-২ ৩৪০
আল-কুরআনের সূরা অবতীর্ণের ক্রমধারা ৩০৪

আমি কুরআনকে কিভাবে পেয়েছি?

এ মুহূর্তে আপনার হাতে যে বইটি আছে তা শুরু করার আগে এর আনুসাঙ্গিক একটি ঘটনা বলে নেয়া দরকার। যতোক্ষণ এ বইটি আমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত ছিল, নির্দিষ্ট কোন আকার আকৃতিতে ছিল না, ততোক্ষণ সে ঘটনাটিকে বর্ণনা করার তেমন প্রয়োজনও ছিল না। যখন এটি অস্তিত্ব লাভ করার জন্য ছাপাখানার টেবিলে গেল, তখন ঘটনাটিও আর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। এখন তা প্রকাশ হওয়াই দরকার।

তখন আমি খুব ছোট্ট। সবেমাত্র কুরআন পড়া শুরু করেছি, কিন্তু এর মর্মার্থ বা পাঠোদ্ধার ছিল আমার আয়ত্তের বাইরে। তাছাড়া এর উচ্চমানের বিষয়বস্তুগুলো আমার জ্ঞানের পরিসীমায় আবদ্ধ করা, তাও ছিল অসম্ভব। তবু আমি এর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছি। তিলাওয়াতের সময় আশ্চর্যজনক বহু ঘটনা আমার মনের পর্দায় উঁকি মারতো। এ ছবিগুলো ছিল সাদাসিদা ও রঙহীন। তবু আমি তা আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে বার বার কল্পনা করতাম। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত ছিল এবং আমাকে তা আনন্দ দিত।

সাদাসিদা এ ছবিগুলোর মধ্যে যেগুলো আমার মনমগজে বদ্ধমূল হয়ে ছিল তার একটি ছবি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করা মাত্র আমার সামনে ভেসে উঠতো।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ
اطْمَاَنَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ج خَسِرَ
الدُّنْيَا وَلْاٰخِرَةَ ط

মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যারা প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে। যদি পার্থিব কোন স্বার্থ দেখে, সেদিকে ঝুকে পড়ে।

আর যদি কোন বিপদ বা পরীক্ষায় নিমজ্জিত হয় তখন তাদের চেহারাকে ঘুরিয়ে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষতিগ্রস্ত দুনিয়ায় এবং আখিরাতে।
(সূরা আল-হাজ্জ ঃ ১১)

এই খেয়ালী ছবিটি যদি আমি কারো সামনে উপস্থাপন করি, তার হাসা উচিত নয়। এ আয়াত শোনা মাত্র আমার স্মৃতিপটে যখন এ ধরনের ছবি ভেসে ওঠতো তখন আমি এক গ্রামে থাকতাম। গ্রামের পাশে উপত্যকার মাঝে একটি টিলা ছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়লেই মনের পর্দায় ভেসে উঠতো— এক ব্যক্তি সেই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে কিন্তু সে সংকীর্ণ টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, তা থর থর করে শুধু কাঁপছে। যে কোন মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে এ অবস্থা দেখছি এবং মনে মনে আশ্চর্য ও রোমাঞ্চিত হয়েছি।

এ রকম যে সমস্ত কল্পিত ছবি আমার মানসপটে ভেসে বেড়াতো তার একটি ছবি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠে প্রতিভাত হয়ে উঠতো। আয়াতটি হলো ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ - وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط

আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সেই লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছে করলে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম কিন্তু সেতো জমিনের দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং নিজের নফসের খাহেস পূরণেই নিমগ্ন হয়। তার অবস্থা কুকুরের মতো। তার ওপর আক্রমণ করলে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবু জিহ্বা বের করেই রাখবে।
(সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৭৫-১৭৬)

আমি এ আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতাম না। কিন্তু তিলাওয়াত করা মাত্রই আমার মনের মুকুরে একটি ছবি এসে উপস্থিত হতো। দেখতাম, এক ব্যক্তি হা করে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এসে দাড়াতো। আমি অপলক নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম

না, কেন সে এরূপ করছে। তবে আমি তার কাছে এগিয়ে যেতে সাহস পেতাম না। এমনি ধরনের হাজারো ছবি আমার মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখতো, যে সম্পর্কে কল্পনা করতে আমার খুব ভালো লাগতো। ফলে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আমি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতাম, আর কল্পনার তেপান্তরে সেই ছবি খুঁজে বেড়াতাম।

সেই সময়টি আমার মধুর কল্পনা ও বালখিল্যতার সাথেই অতিবাহিত হয়ে গেল। এখন কালের আবর্তনে কিছুটা ইল্‌ম ও বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি। কিছু তাফসীর গ্রন্থ নিজের প্রচেষ্টায় ও শিক্ষকদের সহায়তায় বুঝার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সুন্দর, সুমধুর ও মহিমান্বিত কুরআন তিলাওয়াতের সময় শৈশবে কী করেছি তার দিকে কোন দৃষ্টি যায় না। তবে কি আজকের কুরআন শৈশবের সেই কুরআন থেকে ভিন্নতর ? এর মধ্যে কি কোন-ই সম্পর্ক নেই? সম্ভবত তা ছিল মনগড়া ব্যাখ্যার তেলেসমাতি।

আল-কুরআনের বেশ কিছু তাফসীর দেখার পরও মনে হলো, কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়ে গেছে। তখন আমি সরাসরি কুরআন থেকে কুরআনকে বুঝার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলাম। আশ্চর্য হলেও সত্যি, তখনই আমি সেই প্রিয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত কুরআনের সন্ধান পেলাম। সেই আকর্ষণীয় মনোরম ছবি আবার আমার সামনে ভেসে ওঠলো। শুধু পার্থক্য ছিল তা আগের মতো সাদাসিদা না হয়ে বুঝের পরিপক্কতার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। তখন আমি বুঝতে পারলাম এ ছবি নয়, উপমা। শুধু কুরআন বুঝার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত তা কোন বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবি নয়। তাই বলে তা অবাস্তব কোন কিছুও নয়।

আলহামদু লিল্লাহ! এবার আমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন শুরু করলাম। হঠাৎ আমার মনে খেয়াল সৃষ্টি হলো, আমি যে ছবিগুলো দেখছি তা সাধারণের সামনে উপস্থাপন করবো, যেন তারা এ থেকে কিছু উপকৃত হতে পারে। তাই ১৯৩৯ সনে 'আল মুকতাতাফ' নামক পত্রিকার মাধ্যমে 'আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ করি। যেখানে আল-কুরআনের কতিপয় ছবি ও তার শৈল্পিক সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। আমি সেখানে প্রমাণ করে দেখিয়েছি, আল-কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তা কোন রঙিন ক্যামেরায় বা কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা সম্ভব নয়। সে এক রহস্যময় মোহিনী ছবি। সেখানে আমি এও বলেছিলাম যে, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি পুস্তক রচনা করাও সম্ভব।

তারপর ক'বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। এদিকে কুরআনী ছবিগুলো আমার মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে লাগলো। আমি এর সর্বত্র শৈল্পিক সৌন্দর্যের সন্ধান

পেতে থাকলাম। তখন আমি মনে করলাম, আমি একে পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে যাই যে বিষয়ে আজও কেউ কলম ধরেনি। এ উদ্দেশ্যে আল-কুরআন অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করি এবং তা থেকে সেই সূক্ষ্ম ছবিগুলো একত্রিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব ঝামেলায় জড়িয়ে যেতাম, আমার হাজারো ইচ্ছে ও উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও কাজের গতি মন্থর হয়ে যেতো।

অবশেষে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সংকলনে হাত দিলাম। আমার কাজ ছিল আল-কুরআনের শৈল্পিক ছবিগুলোকে একত্রিত করা এবং তার রচনা শৈলী ও শৈল্পিক সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোকপাত করা। আল-কুরআনের শাব্দিক বিশ্লেষণ ও ফিক্‌হী আলোচনা করার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

যখন আমি অগ্রসর হচ্ছি তখন এক নতুন রহস্য আমার সামনে উদ্ভাসিত হলো। লক্ষ্য করলাম আল-কুরআনে আঁকা ছবিগুলো অন্যান্য আলোচনা ও অংশ থেকে পৃথক কিছু নয়। এর আলাদা কোন অবস্থানও নেই। বরং গোটা কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গিটাই হচ্ছে দৃশ্য ও ছবির শৈল্পিক বুনিয়াদ। শুধু শরয়ী নির্দেশগুলো এর ব্যতিক্রম। তখন আমি ছবিগুলো একত্রিত করার চেয়ে তার আসল উদ্দেশ্য ও সূত্র উদ্ভাবনে মনোযোগী হলাম. তারপর সেই সূত্র ও তার ব্যাখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। যা আজ পর্যন্ত কেউ স্পর্শও করেনি।

সংকলনের কাজ যখন শেষ, তখন মনে হলো কুরআন এক নতুন রূপে আমার মনে আবির্ভূত হলো। আমি এমন এক কুরআনের সন্ধান পেলাম যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাইনি। আগেও কুরআন আমার কাছে সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। তবে তা ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আকারে। এখন পুরো সৌন্দর্য যেন অবিচ্ছিন্ন রূপে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এ যেন এক বিশেষ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যার মধ্যে আশ্চর্য ও বিরল সম্পর্ক বিদ্যমান। যা কোন দিন আমি অনুধাবন করতে পারিনি। যার স্বপ্নও আমি কখনো দেখিনি। এমনকি অন্য কেউ কোন দিন তা কল্পনা করেনি।

আল-কুরআনের এসব দৃশ্যাবলী ও চিত্রসমূহের উপস্থাপনে আমার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার যথাযথ দাবি আদায় করার ব্যাপারে যদি আল্লাহ্ আমাকে তাওফিক দেন তাহলে সেটিই হবে এ পুস্তকের পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের মাপকাঠি।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তি

আল-কুরআন অবতীর্ণের প্রাক্কালে স্বয়ং কুরআনই আরবদেরকে এর সম্মোহনী শক্তিতে সম্মোহিত করেছিল। যার অন্তরকে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তিনি এবং যাদের মনের ওপর ও চোখের ওপর পর্দা পড়ে গিয়েছিল তারাও এ কুরআনের সম্মোহনী প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যদিও তারা এ কুরআন থেকে কোন উপকৃত হতে পারেনি। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তিত্ব এমন ছিল, যারা শুধুমাত্র নবী করীম (স)-এর অনুপম ব্যক্তিত্ব ও মাধুর্যে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন— রাসূল (স)-এর স্ত্রী মুহতারামা খাদিজা (রা), হযরত আবু বকর (রা), নবী করীম (স)-এর চাচাতো ভাই হযরত আলী (রা), তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস হযরত যায়িদ (রা) প্রমুখ। এঁদেরকে ছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তখন রাসূল (স) এতো বেশি শক্তি ও ক্ষমতাশালী ছিল না যে, তাঁরা তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিমত্তায় বিমোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বরং তাঁদের ইসলাম গ্রহণের মূলে ছিল আল-কুরআনের মায়াবী আকর্ষণ।

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এবং ওয়ালীদ বিন মুগিরার প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা দু'টো উপরোক্ত বক্তব্যকেই স্বীকৃতি দেয় এবং প্রমাণ করে যে, আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তি অত্যন্ত প্রবল। যা শুধু ঈমানদারদেরকেই নয়; বরং কাফিরদেরকেও প্রভাবিত করতো।

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে আতা ও মুজাহিদ এক রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন, যা ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ বিন আবু নাজীহ্ থেকে সংকলন করেছেন, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ

আমি সেদিনও ইসলাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলাম, শরাব পানে

মত্ত থাকতাম। আমাদের এক মিলনায়তন ছিল, যেখানে কুরাইশরা এসে জামায়েত হতো। সেদিন আমি তাদের সন্ধানে গেলাম কিন্তু কাউকে সেখানে পেলাম না। চিন্তা করলাম অমুক শরাব বিক্রেতার নিকট যাব, হয়তো সেখানে তাদেরকে পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু সেখানেও তাদের কাউকে আমি পেলাম না। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, মসজিদে হারামে গিয়ে তাওয়াফ করিগে। সেখানে গেলাম। দেখলাম হযরত মুহাম্মদ (স) নামাযে মশগুল। তিনি শামের (সিরিয়ার) দিকে মুখ করে নামাযে দাঁড়িয়েছেন। কা'বা তাঁর ও শামের মাঝে অবস্থিত। তিনি রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়েমেনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তাঁকে দেখে ভাবলাম, আজ রাতে আমি চুপি চুপি শুনবো, তিনি কী পড়েন। আবার মনে হলো, যদি শোনার জন্য কাছে চলে যাই তবে তো আমি ধরা পড়ে যাব। তাই হাতিমের দিক থেকে এসে খানায়ে কা'বার গেলাফের নিচে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ও তাঁর মাঝে একমাত্র কা'বার গেলাফ ছাড়া অন্য কোন আড়াল ছিল না। যখন আমি নবী করীম (স)-এর তিলাওয়াত শুনলাম তখন আমার মধ্যে এক ধরনের ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। আমি কাঁদতে লাগলাম। আর পরিণতিতে আমার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়।

ইবনে ইসহাকের আরেক বর্ণনায় আছে— একদিন উমর (রা) রাসূলে করীম (স)-কে হত্যা করার জন্য নগ্ন তরবারী নিয়ে রওয়ানা হলেন। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে কতিপয় সাহাবীর সাথে নবী করীম (স) একটি ঘরে বসবাস করতেন। সেখানে প্রায় চল্লিশ জনের মতো পুরুষ ও মহিলা ছিল। পথিমধ্যে নাঈম বিন আবদুল্লাহ্র সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ উমর! কোথায় যাচ্ছ? উমর তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। নাঈম বললেন ঃ বনী আবদে মুনাফের শত্রুতা পরে করো, আগে নিজের বোন ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়িদকে সামলাও। তারা মুসলমান হয়ে গেছে। তখন হযরত উমর (রা) সেখানে গিয়ে দেখলেন, খাব্বাব (রা) তাদেরকে কুরআন শরীফ পড়াচ্ছেন।

উমর (রা) সরাসরি দরজার ভেতর ঢুকেছিল এবং ভগ্নিপতি সাঈদকে ধরে ফেললেন। নিজের বোন ফাতিমাকে মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিলেন। কিছুক্ষণ বাক-বিতণ্ডার পর তারা যা পড়ছিল, তা দেখতে চাইলেন। তখন সূরা ত্ব-হা থেকে কিছু অংশ পাঠ করে তাকে শুনানো হলো। যখন সূরা ত্ব-হা'র কিছু অংশ শুনালেন, তখন মন্তব্য করলেন, 'এতো অতি উত্তম কথাবার্তা'। তারপর তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।
—(সীরাতে ইবনে হিশাম)

এ বিষয়ে সমস্ত বর্ণনার মূল কথা একটি। তা হচ্ছে হযরত উমর (রা) কুরআনের কিছু অংশ পড়ে অথবা শুনে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। আমরা তো এ ঘটনা শুনি কিংবা বলি কিন্তু এদিকে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না যে, হযরত উমর (রা)-এর যে পরিবর্তন হয়েছিল, তার মূলে ছিল আল-কুরআনের আকর্ষণ ও অপ্রতিরোধ্য সম্মোহনী শক্তি।

ওয়ালীদ বিন মুগিরার ঘটনা

ওয়ালীদ বিন মুগিরা কুরআনে হাকীমের কিছু অংশ শুনে তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এটি দেখে কুরাইশরা বলাবলি শুরু করলো, সে মুসলমান হয়ে গেছে। ওয়ালীদ ছিল কুরাইশদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি। আবু জাহেলকে তার কাছে পাঠানো হলো। যেন সে কুরআনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের কথা ঘোষণা দেয় যাতে কুরাইশরা তার ঐ কথায় প্রভাবিত হয়। ওয়ালীদ বলতে লাগলো ঃ "আমি কুরআন সম্পর্কে কী বলবো? আল্লাহ্র কসম! আমি কবিতা ও কাব্যে তোমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখি কিন্তু মুহাম্মাদের কাছে যে কুরআন শুনেছি তার সাথে এগুলোর কোন মিল নেই। আল্লাহ্র শপথ! তার কাছে যা অবতীর্ণ হয় তা অত্যন্ত চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর এবং তা প্রাঞ্জল ভাষায় অবতীর্ণ। যা তার সামনে আসে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ওটি বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে পরাজিত হতে আসেনি।"

একথা শুনে আবু জাহেল বললো ঃ 'যতোক্ষণ তুমি কুরআনকে অবজ্ঞা না করবে ততোক্ষণ তোমার কওম তোমার ওপর নারাজ থাকবে।' ওয়ালীদ বললোঃ 'আমাকে একটু চিন্তা করার অবকাশ দাও।' তারপর সে ঘোষণা দিলো ঃ 'এতো সুস্পষ্ট যাদু, তোমরা দেখো না, যে এর সংস্পর্শে যায় তাকেই তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।'[১]

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ فَكَّرَوَقَدَّرَ - فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ - ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ - ثُمَّ نَظَرَ- ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ - ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ - فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ -

১. সীরাতে ইবনে হিশাম ও তাফসীরে ইবনে কাসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। —লেখক।

সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে। সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে মনস্থির করেছে, (আবার বলছি) সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে মনস্থির করেছে! দেখেছে, সে আবার ভ্রুকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করেছে। অতপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং অহংকার করে বলেছে ঃ এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ আর কিছুই নয়। (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ ১৮-২৪)

এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির বক্তব্য যে ইসলামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতো। মুহাম্মদ (স)-এর নিকট পৌছুলে নিজের অজান্তেই তাদের মন ও মাথা ঝুঁকে পড়ে কিন্তু যখন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে আসে তখন সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহ তাদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এতেই প্রমাণিত হয়, আল-কুরআনের আকর্ষণী শক্তি কতো তীব্র, যা যাদুকেও হার মানায়।

এবার চিন্তা করে দেখুন, আল-কুরআন হযরত উমর (রা) ও ওয়ালীদ বিন মুগিরা দু'জনের ওপরই প্রভাব ফেললো। কিন্তু তাদের আচার-আচরণে আসমান-জমিনের পার্থক্য। হযরত উমর (রা) আল্লাহ্‌কে ভয় পাবার কারণে আল্লাহ্ তাঁর দিলকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। পক্ষান্তরে ওয়ালীদ বিন মুগিরাকে অহংকার, দাম্ভিকতা ও নেতৃত্বের মোহ ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিলো।

কুরআন মজীদে কাফিরদের কথার যে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে, তাও আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তির একটি প্রমাণ।

لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ -

তোমরা কুরআন শুনবে না এবং কুরআন পাঠের সময় চেঁচামেচি শুরু করবে, তাতে মনে হয় তোমরা বিজয়ী হবে। (সূরা হা-মিম সিজদা ঃ ২৬)

এখানেও আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের ভয় ছিল যদি সুষ্ঠুভাবে এ কুরআন শুনতে দেয়া হয় বা শোনা হয় তবে তার প্রভাব শ্রোতার ওপর অবশ্যই পড়বে এবং সে তার অনুসারী হয়ে যাবে। কাজেই সকাল-সন্ধ্যায় যেন কেউ কুরআন শুনে মোহগ্রস্থ হতে না পারে সেজন্যই শোরগোল করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য তাদেরকেও প্রতিনিয়ত কুরআন আকর্ষণ করছিল। কিন্তু যাদের ভেতর সামান্য মাত্রায় হলেও আল্লাহ্‌ভীতি ছিল শুধু তারাই জাহেলিয়াতের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। যদি তারা এতে প্রভাবিত না হতো কিংবা প্রভাবিত হওয়ার ভয় না করতো তবে অনর্থক

কেন তারা কুরআনের বিরুদ্ধে এতো কাঠখড় পোড়ালো? এতেই প্রমাণিত হয়, এ কুরআনের আকর্ষণ কত তীব্র, কতো দুর্নিবার।

আল-কুরআনে সুন্দরভাবে কুরাইশ কাফিরদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যে বক্তব্য দিয়ে তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত।

وَقَالُوٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا -

তারা বলে ঃ এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা সে লিখে রেখেছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাকে শেখানো হয়। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৫)

لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ لا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ -

(তারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে বলে ঃ) ইচ্ছে করলে আমরাও এমন বলতে পারি। এতো পুরোনো দিনের কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ -

(এ কুরআন) অলীক স্বপ্ন মাত্র। বরং তার মনগড়া কথা, (না) বরং সে একজন কবি। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৫)

قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ -

হে রাসূল, তাদেরকে বলে দিন, (যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে) তোমরা এ রকম দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো।

فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص

(কিংবা) এ রকম একটি সূরাই তৈরী করে আনো। (সূরা বাকারা ঃ ২৩)

কিন্তু তারা এ চ্যালেঞ্জের মুকাবেলায় একটি সূরাও তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। দশটিতো অনেক দূরের কথা। সত্যি কথা বলতে কি, তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণই করেনি। অবশ্য নবী করীম (স)-এর ওফাতের পর কতিপয় কুলাঙ্গার নবুওয়তের দাবি করেছিল বটে, কিন্তু তার পরিণতি ভালো হয়নি। তাদের এ বাতুলতাকে কেউ গুরুত্বই দেয়নি।

রাসূল (স) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াতের প্রাক্কালে পূর্ববর্তী নবীর অনুসারীদের

মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থে আলিম ও বুজুর্গ ছিল আল-কুরআনের প্রভাব তাদের ওপর তীব্রভাবেই পড়েছিল। ফলে তাঁরা আল-কুরআনের ছায়াতলে স্থান লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সেসব ভাগ্যবানদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج
وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ
بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ - وَاِذَا سَمِعُوْا
مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا
مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

আপনি সব মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরকেই মুসলমানদের অধিকতর শত্রু হিসেবে পাবেন। আর মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীস্টান বলে। এর কারণ খ্রীস্টানদের মধ্যে আলিম ও দরবেশ রয়েছে যারা অহংকার করে না। তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কথা শুনামাত্র দেখবেন তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেছে। কারণ তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা আরো বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম, অতএব আমাদেরকে অনুগতদের তালিকাভুক্ত করে নিন। (সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৮২-৮৩)

জানার তীব্র আকাংখার যে চিত্র পেশ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র কুরআন শোনার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি কুরআন শুনে নিজেদের অজান্তেই তাদের চোখের পানি পর্যন্ত নির্গত হয়েছে। ফলে তারা সত্যের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কুরআন যে সত্যের দাওয়াত ও শিক্ষা দিতে চায় তা তার নিজস্ব প্রভাব ছাড়া কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না। আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ
سُجَّدًا - وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا -

যারা পূর্ব থেকেই আলিম, যখন তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা নত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের

পালনকর্তা পবিত্র মহান। অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৭-১০৮)

কুরআন শুনে আল্লাহ্‌কে ভয় করার চিত্র নিম্নোক্ত আয়াতেও তুলে ধরা হয়েছেঃ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্ উত্তম বাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোমহর্ষণ হয় যারা তার প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের চামড়া ও অন্তকরণ আল্লাহ্‌র স্মরণে বিনম্র হয়।
(সূরা আয-যুমার ঃ ২৩)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এ কুরআনের মধ্যে এমন এক প্রভাব নিহিত আছে যা তার পাঠক কিংবা শ্রোতাকে প্রভাবিত না করে ছাড়ে না। হৃদয়কে করে উত্তাল, চোখকে করে অশ্রুসজল। যে ঈমান গ্রহণে আগ্রহী সে কুরআন শুনামাত্রই তার আনুগত্যের শির নত হয়ে যায়। এমনকি, যে কুফরী ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত সে-ও যদি এ কুরআন শোনে তবে তার ওপরও কুরআন প্রভাব ফেলে, কিন্তু সে এটিকে যাদু মনে করে উড়িয়ে দেয়। লোকদেরকে তা শুনতে বারণ করে। তবু সে এ কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পায় না।

আল-কুরআনে সম্মোহনী শক্তির উৎস

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল-কুরআন আবরদেরকে কিভাবে পরাজিত করলো এবং ঈমানদার ও কাফিরদের মধ্যে এটি কিভাবে এমন প্রচণ্ড প্রভাব ফেললো?

যে সমস্ত মনীষী কুরআন বুঝার ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখনী ধরেছেন তারা তাদের সাধ্যমতো এ ব্যাপারে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কতিপয় আলিম কুরআনী বিষয়বস্তুর মিল ও যোগসূত্র সম্পর্কে কিছু না বলে অন্যভাবে কিছুটা আলোচনা করেছেন। যা কুরআনের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন— আল-কুরআন পূর্ণতা প্রাপ্তির পর যে শরীয়ত পেশ করেছে তা প্রতিটি জায়গা ও সময়ের উপযোগী। সেই সাথে কুরআন এমন কিছু ঘটনাও বলে দিয়েছে যা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া কুরআন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব সৃষ্টি সম্পর্কেও আলোকপাত করেছে ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আল কুরআনে প্রচুর বর্ণনা করা হয়েছে। যা আল-কুরআনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। কিন্তু ছোট ছোট সেই সব সূরার ব্যাপারে বক্তব্য কী, যেখানে কোন শরয়ী বিধান বর্ণনা করা হয়নি ? কিংবা যেখানে কোন অদৃশ্য জগতের বিবরণ পেশ করা হয়নি বা পার্থিব জগতের কোন জ্ঞানও বিতরণ করা হয়নি ? যদিও ছোট সেই সূরাগুলোতে সব বিষয়ের সামষ্টিক আলোচনা করা হয়নি (যা আল-কুরআনের অনেক সূরায় করা হয়েছে)। তবু আল-কুরআন অবতীর্ণের প্রথম দিকে সেগুলো আরবদেরকে সম্মোহন করেছিল। ঐ সূরাগুলোর মাধ্যমেই এসেছিল তাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন এবং তার সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ ছোট্ট সূরাগুলোর যাদুকরী প্রভাব এতো তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য ছিল, যার কারণে শ্রোতা মোহগ্রস্ত না হয়ে পারতো না। আল-কুরআন স্বীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে কাফির ও মুমিনদেরকে তার প্রভাব বলয়ে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী হয়েছেন, তাদের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে আল-কুরআন। একথা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই যে, আল-কুরআনের ছোট একটি সূরা কিংবা তার অংশ বিশেষ তাদের জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

অবশ্য ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্তির পর যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের পেছনে আল-কুরআন ছাড়াও কিছু আচার-আচরণ এবং বাহ্যিক তৎপরতা ক্রিয়াশীল ছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের সৌভাগ্যবান মুমিনদের পেছনে ঈমানের ব্যাপারে যে বস্তুটি ক্রিয়াশীল ছিল তা কেবলমাত্র কুরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলাম গ্রহণের মূল চালিকা শক্তি

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবার পর বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়ে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন ঃ

(১) কতিপয় লোক রাসূলে আকরাম (স) ও সাহাবা কিরামের আমল ও আখলাকে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

(২) যারা ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা সবকিছুর ঊর্ধ্বে দ্বীনকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তারা সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন ভোগ করছিল, কতিপয় লোক এ ব্যাপারে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল।

(৩) কিছু লোক একথা চিন্তা করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল যে, মুহাম্মাদ (স) ও তার সঙ্গী সাথীরা সংখ্যায় অল্প কিন্তু তবু কোন পরাশক্তি তাদেরকে পরাস্ত করতে পারে না এটি আল্লাহ্‌র সাহায্য ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

(৪) কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তখন যখন ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কার্যকরী ছিল। যা তারা ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি।

এ রকম আরো অনেক কারণেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার মধ্যে অন্যতম ছিল আল-কুরআনের প্রাণস্পর্শী আবেদন ও মোহিনী টান। যা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এককভাবে অবদান রেখেছে।

আল-কুরআনে সম্মোহনী শক্তির উৎস কোথায়?

একটি কথা ভেবে দেখা দরকার, তখন পর্যন্ত শরীয়ত পরিপূর্ণ ছিল না, অদৃশ্য জগতের খবর ছিল না, জীবন ও জগৎ সম্পর্কেও জোরালোভাবে তেমন কিছু বলা হয়নি, ব্যবহারিক কোন দিক-নির্দেশনা তখনও কুরআন দেয়নি, কুরআনের অতিসামান্য একটি অংশ ইসলামের দাওয়াতী কাজ করার জন্য বর্তমান ছিল।

তবু সেখানে যাদু ও সম্মোহনী শক্তির উৎস নিহিত ছিল। যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে :

إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ –

এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওয়ালীদ বিন মুগিরা ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েও তা গ্রহণ না করার ঘটনাটি সূরা আল-মুদ্দাস্‌সিরে বর্ণিত হয়েছে। অবতীর্ণের ধারাবাহিকতায় এ সূরার অবস্থান তৃতীয়। সূরা আলাক এবং সূরা আল-মুজ্জাম্মিল এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব এ সূরাগুলো কিভাবে ওয়ালীদ বিন মুগরাকে প্রভাবিত করেছিল, এতে এমন কী যাদু ছিল যা তাকে পেরোশান করে তুলেছিল?

মক্কায় অবতীর্ণ ছোট ছোট এ সূরাগুলো যখন আমরা অধ্যয়ন করি তখন সেখানে শরয়ী কোন আইন কিংবা পার্থিব কোন ব্যাপারে সামান্যতম ইঙ্গিতও পাই না। অবশ্য সূরা 'আলাকে মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে সামান্য আলোচনা এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, মানুষকে জমাট বাধা রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তী বছরসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। যেমন সূরা রূমে (পারস্য বিজয়ের ব্যাপারে) ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ওয়ালীদ যেটিকে যাদু বললো, আল-কুরআনে তার শেষ কোথায়?

এর উত্তর হচ্ছে— ওয়ালীদ আল-কুরআনের যে অংশকে যাদু বলে আখ্যায়িত করেছে অবশ্যই তা শরয়ী আহকাম ও পার্থিব কোন জ্ঞানের বহির্ভূত বস্তু ছিল। আলোচনার এমন কোন বিষয় সেখানে ছিল না যে ব্যাপারে সে কোন কথা বলতে পারতো। অবশ্য একথাও ঠিক, ইসলামী আকীদা ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনের প্রচেষ্টা ছাড়াই সে তার সূক্ষ্ম রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিল।

এবার আসুন, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা আল-'আলাক সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখি। প্রথম ১৫টি আয়াতের দিকে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এর শব্দগুলো জাহিলি যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত শব্দের অনুরূপ, যার সাথে গোটা আরব পরিচিত ছিল কিন্তু তাদের লেখায় অনেক সামঞ্জস্যহীন শব্দ ও বাক্যের সমাবেশ ঘটতো। অনেক সময় তাদের সে রচনার মধ্যে কোন অন্তমিল ও প্রসঙ্গ পাওয়া যেত না। কিন্তু সূরা আলাকের ব্যাপারটি কি তেমন?

অবশ্যই নয়। বরং সেখানে সামঞ্জস্য ও দ্যোতনার এক অপূর্ব সমাহার। প্রতিটি বক্তব্য উন্নত সাহিত্যের মূর্ত প্রতীক। অথচ তা একেবারেই প্রথম দিকে

অবতীর্ণ আয়াত। সেখানে বলা হয়েছে 'পড়ো'। তবে তা আল্লাহ্‌র পবিত্র ও সম্মানিত নামের সাথে হতে হবে। ইক্‌রা বা পড়ো শব্দ দিয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে—আল-কুরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়ন। এজন্যই আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার প্রয়োজন যে, তিনি নিজের নামের সাথেই দাওয়াত দেন। আল্লাহ্‌র এক সিফাতি নাম 'রব্ব'। অর্থ প্রতিপালক। তাই তিনি প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথাগুলো আল্লাহ্‌র ভাষায় ঃ

اِقْـرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

পড়ো তোমার ঐ প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

তখন ছিল ইসলামী দাওয়াতের সূচনাকাল। এজন্য রব্ব-এর বিশ্লেষণ হিসেবে এমন একটি শব্দকে বেছে নেয়া হয়েছে যা জীবন শুরুর সাথে জড়িত। অর্থাৎ তিনি এমন 'রব্ব' اَلَّذِىْ خَلَقَ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন।'

خَلَقَ الْاِنْسَـانَ مِنْ عَلَقٍ —তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে। অন্য কথায় তিনি মানুষের জীবন শুরু করেছেন জমাট বাধা রক্তপিণ্ড থেকে। কতো ছোট ও সাধারণ অবস্থা দিয়ে সূচনা।

কিন্তু আল্লাহ্ যেহেতু রব্ব বা প্রতিপালক হওয়ার সাথে সাথে তিনি খালিক (সৃষ্টিকর্তা) ও উঁচু স্তরের মেহেরবান। তাই ছোট্ট একটি মাংসপিণ্ডকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ এক মানুষে রূপায়িত করেন। আর তার প্রকৃতি এমন, তাকে কোন কিছু শিখালে শেখার যোগ্যতা আছে। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ

اِقْرَاْ وَرَبُّـكَ الْاَكْرَمُ -اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمْ-عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

তুমি কুরআন পাঠ করো, তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। তিনি হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে (তা-ই) শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।
(সূরা আল আ'লাক ঃ ৩-৫)

দেখুন একটি আয়াতে কতো সুন্দরভাবে মানুষের শুরু থেকে পূর্ণতার দিকে নেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়ের কথা একের পর এক বলা হয়েছে। যেন মানুষের চিন্তা ও সহজাত প্রবৃত্তি সেই দাওয়াতের প্রতি সাড়া দেয়।

বুদ্ধি-বিবেকের দাবি-ই ছিল এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা, কী সে ছিল এবং বর্তমানে কোথায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এমনটি হয় না।

كَلَّا اِنَّ لْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى - اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى -

সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে (অর্থাৎ তার শুরু ও শেষের কথা ভুলে গেছে)। (আলাক ঃ ৬-৭)

সে অহংকার ও দাম্ভিকতার বশে ভুলে গেছে বিধায় তাকে সতর্কতা ও ভর্ৎসনা মিশ্রিত বাক্যে সতর্ক করা হচ্ছে ঃ

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى -

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে তোমার প্রভুর দিকেই ফিরিয়ে আনা হবে। (সূরা আল-আলাক ঃ ৮)

মানুষের বিদ্রোহ ও দাম্ভিকতার প্রসঙ্গ যখন চলছে তখন তাকে পরিপূর্ণ রূপদানের জন্য বলা হয়েছে। তারা শুধুমাত্র নিজেরাই বিদ্রোহী হয় না বরং অন্যদেরকেও বিদ্রোহী বানাবার প্রচেষ্টা করে।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى - عَبْدًا اِذَا صَلّٰى -

তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে নিষেধ করে আল্লাহ্‌র এক বান্দাকে যখন সে নামাযে দাঁড়ায়। (সূরা-আল আলাক ঃ ৯-১০)

কোন ব্যক্তিকে নামায পড়তে বাধা দেয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ গর্হিত কাজটি তখনই বেশি বেড়ে যায় যখন নামাযী হেদায়েতের পথে অবিচল থাকেন এবং অন্যকে আল্লাহ্‌ভীতি জাগ্রত করার চেষ্টা করেন।

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى - اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى - (العلق : ١٣)

তুমি কি দেখেছ যদি সে সৎপথে থাকে অথবা আল্লাহ্‌ভীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। (সূরা আল-আলাক ঃ ১৩)

চিন্তা করে দেখুন, মানুষ সবকিছু থেকেই অসতর্ক। এমনকি কিভাবে তার জন্ম এবং কোথায় তার শেষ সে খবরটুকু তার নেই।

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى - اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى -

তুমি কি দেখেছ, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে কি জানে, আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন ? (সূরা আল-আলাক ঃ ১৩-১৪)

অতপর তাদেরকে শাসানো হয়েছে ঃ

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا ۢ بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

কক্ষণ নয়। যদি সে বিরত না হয় তবে আমি তাকে মাথার চুলের গুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবোই— মিথ্যাচারী, পাপীর কেশ গুচ্ছ। (আল-আলাক ঃ ১৫-১৬)

এখানে এমনভাবে শব্দ চয়ন করা হয়েছে যে, শব্দ নিজেই তার কাঠিন্যকে প্রকাশ করে দিয়েছে। যদি لَنَسْفَعًا-এর স্থলে সমার্থবোধক শব্দ لَنَاخُذَنَّ নেয়া হতো তবে অর্থের দিকে এতো বেশি কাঠিন্য বুঝাতো না, যা لَنَسْفَعًا শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ শব্দ থেকে ধারণা হয়— এক ব্যক্তি কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে শক্তভাবে কারো চুলের মুঠি ধরে রেখেছে আর সে দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ এ শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে, কোন বিদ্রোহী কিংবা অহংকারীকে উঁচু স্থান থেকে তার কপালের চুল ধরে হেচকা টানে ভূলুণ্ঠিত করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া। টেনে হেঁচড়ে নেয়ার সময় অবশ্য সে নিজের সঙ্গী-সাথীদের নিকট চীৎকার করে সাহায্য চাইতে থাকে। যেমন আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ —অতএব সে তার সঙ্গী-সাথীকে আহ্বান করুক। আর سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ —আমি ডাকবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।

একথা শুনে শ্রোতাদের ধারণা হয়, সম্ভবত জাহান্নামের পাইক-পেয়াদা এবং ঐ ব্যক্তির সাথীদের মধ্যে সেদিন সংঘর্ষ বেধে যাবে। এটি একটি কাল্পনিক চিত্র, যা কল্পনার জগতকে ছেয়ে ফেলে। রাসূল তাঁর নিজের অবস্থানে অটল থেকে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কেউ যদি তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেজন্য তিনি কোন পরওয়া করেন না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَلَّا ۭ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ - (العلق : ١٩)

কখনো তুমি তার কথায় প্রভাবিত হয়ো না, তুমি সিজদা করো ও আমার নৈকট্য অর্জন করো। (সূরা আল-আলাক ঃ ১৯)

ইসলামী দাওয়াতের এ ছিল বলিষ্ঠ সূচনা। এ সূরার বাক্যগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিওবা অবিন্যাসিত মনে হতে পারে কিন্তু এগুলো বিন্যাসিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এ হচ্ছে আল-কুরআনের প্রথম সূরা যার বর্ণনা স্টাইলেই তাঁর অন্তরমিলের দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার অবতীর্ণের দিক থেকে দ্বিতীয় সূরাটির দিকে লক্ষ্য করুন যা সূরা আল-মুজ্জাম্মিল নামে পরিচিত। অবশ্য 'সূরা কলমের' পথম দিকের আয়াতগুলোও এর পূর্বে অবতীর্ণ হতে পারে। যাহোক

ওয়ালীদ সূরা আল-মুজ্জাম্মিলের নিম্নোক্ত আয়াত ক'টি শুনেই নআল-কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করেছিল।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا - اِنَّا اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ؕ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا - فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۚ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا -

যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকা স্তুপ। আমি তোমাদের কাছে একজন রাসূলকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে পাঠিয়েছি যেমন পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের কাছে একজন রাসূল। ফিরাউন সেই রাসূলকে অস্বীকার করলো, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিলাম। অতএব, তোমরা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে যদি সেদিনকে তোমরা অস্বীকার করো, যেদিন বালককে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

(সূরা আল-মুজ্জাম্মিল ঃ ১৪-১৮)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে কিয়ামতের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তা এমন এক ভয়ানক চিত্র যেখানে মানুষ কোন্ ছার গোটা সৃষ্টিলোকই তার আওতায় পড়ে যাবে। সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও ভারী সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবী ও পর্বতমালা। সেদিন সেগুলো কেঁপে উঠবে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা হবে না। শুধু তাদেরকেই গ্রেফতার করা হবে, যাদের নিকট রাসূল এসেছিলেন এবং তাঁর দাওয়াত পৌছেছে। সেই সাথে যাবতীয় দলিল-প্রমাণও পূর্ণ হয়ে গেছে।

মক্কার কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য যে রাসূল পাঠানো হয়েছে তিনি রাসূল হিসেবে নতুন ও প্রথম নন, তিনি তাদের মতোই একজন রাসূল, যাঁরা ফিরাউন ও তার মতো অন্যান্যদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তোমাদের শান-শওকত ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার নিশ্চয়ই ফিরাউনের চেয়ে বেশি নয়। সেই ফিরাউনকে পর্যন্ত কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। কাজেই তোমরাও কি চাও সেই রকম শাস্তিতে নিমজ্জিত হতে ? যখন পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা যারা কুফুরীতে লিপ্ত আছ, তারা আল্লাহ্র

পাকড়াও থেকে কিভাবে বাঁচবে ? অথচ সেদিনের ভয়াবহতা দেখে দুশ্চিন্তায় শিশুরা পর্যন্ত বুড়ো হয়ে যাবে। আসমান ফেটে যাবে, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত কেঁপে উঠবে। এ ভয়ঙ্কর চিত্রের ভয়াবহতা থেকে কোন সৃষ্টিই নিরাপদ থাকবে না। যখন কল্পনায় সেই বিভিষিকার চিত্র প্রতিফলিত হয় তখন কেউ প্রভাবিত না হয়েই পারে না। আর মানুষের অন্তরই এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা পুরো হবার মতোই একটি ওয়াদা। যা কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং তা থেকে পালানো বা আশ্রয় নেয়ার মতো কোন জায়গাও নেই। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে সময় থাকতেই আল্লাহ্‌র পথে চলে আসা। সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের রাস্তায় চলার চেয়ে আল্লাহ্‌র পথে চলা অধিকতর সহজ।

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে তিনি সূরা ত্ব-হা'র প্রথম দিকের কিছু আয়াত পড়ে বা শুনে ইসলামের দিকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সূরা ত্বা-হা ছিল অবতীর্ণের ক্রমানুসারে ৪৫ নং সূরা। এর পূর্বে যে সমস্ত সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল তা নিচে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) সূরা আল-আলাক	(১৯) সূরা আল-ফীল
(২) সূরা আল-মুজ্জাম্মিল	(২০) সূরা আল-ফালাক
(৩) সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির	(২১) সূরা আন্‌-নাস
(৪) সূরা আল-কলম	(২২) সূরা আল-ইখলাস
(৫) সূরা আল-ফাতিহা	(২৩) সূরা আন-নাজম
(৬) সূরা আল-লাহাব	(২৪) সূরা-আবাসা
(৭) সূরা আত্‌-তাকভীর	(২৫) সূরা আল -কাদর
(৮) সূরা আল-আ'লা	(২৬) সূরা আশ্‌ -শামস
(৯) সূরা আল-লাইল	(২৭) সূরা আল-বরুজ
(১০) সূরা আল-ফজর	(২৮) সূরা আত্‌-তীন
(১১) সূরা আদ্‌-দোহা	(২৯) সূরা আল-কুরাইশ
(১২) সূরা আল-ইনশিরাহ	(৩০) সূরা আল-ক্বারিয়াহ
(১৩) সূরা আল-আসর	(৩১) সূরা আল-ক্বিয়ামাহ
(১৪) সূরা আল-আদিয়াত	(৩২) সূরা আল-হুমাযা
(১৫) সূরা আল-কাওসার	(৩৩) সূরা আল-মুরসালাত
(১৬) সূরা আত্‌-তাকাসুর	(৩৪) সূরা-ক্বাফ
(১৭) সূরা আল-মাউন	(৩৫) সূরা আল-বালাদ
(১৮) সূরা আল-কাফিরূন	(৩৬) সূরা আত্‌-তারিক

(৩৭) সূরা আল-ক্বামার (৪২) সূরা আল-ফুরকান
(৩৯) সূরা আল-আ'রাফ (৪৩) সূরা আল-ফাতির
(৪০) সূরা আল-জ্বিন (৪৪) সূরা মারইয়াম
(৪১) সূরা-ইয়াসীন (৪৫) সূরা ত্বা-হা*

উপরোল্লেখিত সমস্ত সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। অবশ্য এ সূরাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আসুন এবার আমরা উল্লেখিত সূরাসমূহের ওপর সাধারণভাবে একটু নজর বুলিয়ে নেই; যেভাবে আমরা ওয়ালীদের ঘটনাটি পর্যালোচনা করেছি, সেভাবে এ সূরাগুলো পর্যালোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়। আমরা শুধু এটুকু আলোচনা করতে চাই, সূরাগুলোর মধ্যে এমন কি যাদু নিহিত আছে যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পূর্ববর্তীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখনতো উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য ইসলামের শক্তি বেড়ে যায়নি কিংবা ইসলাম বিজয়ী অবস্থায়ও ছিল না।

এ সূরাগুলোকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশেষজ্ঞগণ কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বুঝাতে যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচ্য সূরাগুলোতে অনুপস্থিত। যদি ধরে নেয়া হয়, সূরা আল-ফাতিরে মানুষের সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সূরা আত্ তারিকেও অনুরূপ আলোচনা এসেছে। তবু একথা মেনে নিতে হবে, পার্থিব বিষয়ের আলোচনা সেখানে আসেনি এবং সেখানে শরয়ী কোন বিধানের নাম-গন্ধও নেই। কিন্তু এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, আলোচ্য সূরাগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সূরাসমূহে এসব বিষয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় আলোচনা এসেছে। চাই তা মক্কী সূরা হোক কিংবা মাদানী।

আমরা চাই কিছু সময়ের জন্য হলেও (কুরআনে কারীমের দ্বীনের পবিত্রতা, ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে) স্থান-কাল ও পাত্রের ঊর্ধে ওঠে কুরআনে কারীমের সেই শৈল্পিক সৌন্দর্য ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করতে যা মৌলিক নীতির মর্যাদা রাখে। যা কুরআনের মতোই শাশ্বত ও চিরন্তনী। শৈল্পিক এ সৌন্দর্য আল কুরআনকে অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। ফলে দ্বীনি গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে ধাবিত হয় মনজিলে মাকসুদের দিকে।

এবার দেখা যাক আজ পর্যন্ত মানুষ কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্যকে দেখে আসছে।

---

*. বাকী সূরাগুলো অবতীর্ণ ক্রমের তালিকা পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য। -অনুবাদক

আল-কুরআনের গবেষণা ও তাফসীর

আল-কুরআন অবতীর্ণের সময়ে আরবে যেসব কাফির ও মুশরিক ছিল, তারা এ শৈল্পিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কখনো এই কুরআনকে কাব্য আবার কখনো একে যাদু বলে আখ্যায়িত করতো। কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমরা একথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি না যে, তাদের নিকট শৈল্পিক সৌন্দর্যের মাপকাঠি কী ছিল। অবশ্য একথা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি, কুরআন থেকে তারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন অবতীর্ণের সময় মুমিন এবং কাফির উভয় গোষ্ঠীর ওপরই এটি যাদুর মতো কাজ করেছে। কেউ এ যাদুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। আবার কেউ কেউ এর মায়াজালে আবদ্ধ হয়েও এর থেকে পালিয়ে বেরিয়েছে। তারপর উভয় গোষ্ঠী নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কিন্তু কেউই সুস্পষ্টভাবে বলতে পারেনি, কুরআনের কোন্ অংশটি তাদেরকে মায়াবী প্রভাবে ফেললো। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত এক রিওয়ায়েতে আছে ঃ "যখন আমি কুরআন শুনলাম তখন আমার মধ্যে ভাবান্তর হলো, যার কারণে আমি কাঁদতে লাগলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম।" হযরত উমর (রা)-এর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ "আমি বললাম, এ কথাগুলো কতো গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাহাত্ম্য কতো বেশি।"

ওয়ালীদ বিন মুগিরা কুরআন ও রাসূল (স) উভয়কে অস্বীকার করেছে। শুধু তাই নয়, রাসূল (স)-এর সাথে মারাত্মক শত্রুতাও সে পোষণ করতো। তার মুখ থেকেও বের হয়েছে ঃ

> আল্লাহ্র শপথ! কুরআনের মধ্যে মাধুর্যতা পাওয়া যায়। মনে হয় এটি শাশ্বত এক বাণী। সবকিছুকে জয় করে নেয়। সবচেয়ে উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন কোন কিছুও এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না।

ওয়ালীদ বিন মুগিরা আরো বলেছে ঃ

> কুরআনের মধ্যে যাদুকরী প্রভাব আছে, তোমরা দেখ না এটি কিভাবে একজন মানুষকে তার আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথীদের থেকে পৃথক করে দেয়?

ঈমানদারগণ এ কালাম তিলাওয়াত করার পর যে প্রতিক্রিয়া তাদের ভেতর সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে খোদ কুরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط

এতে (অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াতে) তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার ওপর, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের শরীর ও মন আল্লাহ্‌র স্মরণে একাকার হয়ে যায়। (সূরা আয-যুমার ঃ ২৩)

যারা আহলে কিতাব এবং ঈমানদার তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا لا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا - وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا -

যারা পূর্ব থেকে ইল্‌ম প্রাপ্ত, তাদের নিকট যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতশিরে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের পালনকর্তা পবিত্র-মহান। আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় ভাব আরো বৃদ্ধি পায়। (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ১০৭-১০৯)

অপরদিকে কুরাইশ কাফিররা কুফরী ও হঠকারিতায় অটল থেকে বলেছিল ঃ

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا -

এবং তারা বলে ঃ এতো পুরাকালের কিচ্ছা-কাহিনী যা সকাল-সন্ধ্যা তাকে পড়ে শুনানো হয়। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৫)

নাদর বিন হারিস নামে মক্কায় এক কুলাঙ্গার ছিল। রাসূল (স) যখন মসজিদের মধ্যে লোকদেরকে কুরআন শুনাচ্ছিলেন তখন সে পারস্যের রূপকথা ও কিচ্ছা-কাহিনী আরবীতে বলা শুরু করলো। তার উদ্দেশ্য ছিল লোকদেরকে কুরআন শুনতে বাধা দেয়া। কিন্তু তার এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবু কাফির কুরাইশরা এ কাজ থেকে বিরত থাকেনি; বরং তারা বলেছে ঃ

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ – (حم السجده : ٢٦)

তোমরা এ কুরআন শুনবে না, যখন এটি তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা হট্টগোল করবে, এতে সম্ভবত তোমরা বিজয়ী হতে পারবে।

কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের কথা ও কাজ তারা সর্বদাই বলতো এবং করতো। কিন্তু একটি প্রশ্ন আজও রয়ে গেছে, কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য কিভাবে প্রকাশিত হয়? কাফিররা যতোটুকু কুরআন শোনার সুযোগ পেয়েছে আরবী ভাষী হওয়ার কারণে সবটুকুই তাদের মন-মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। এরপর তারা 'লাব্বাইক' বলে ইসলাম কবুল করেছে, না হয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলিয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, শিল্পকলার ব্যাপারে এরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীদের যুগে তাফসীর

আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী যুগের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাই, সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মাধ্যমে আল-কুরআনের অনেক জায়গার তাফসীর করেছেন, যা আল-কুরআনের বিষয় ও ভাষ্য সংক্রান্ত সরাসরি রাসূল (সা) কর্তৃক বর্ণিত। সাহাবাদের মধ্যে অনেকে খুব ভয়ে ভয়ে কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অনেকে কুরআনের ব্যাখ্যাকে গুনাহ্‌র কাজ মনে করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে দূরে থেকেছেন। এমনকি সাইয়েদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহ)-এর ব্যাপারে কথিত আছে, তাঁর নিকট কুরআনের কোন অংশের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলতেন ঃ 'আমি কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না।'

মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রহ) বলেন ঃ 'আমি হযরত উবাইদাহ (রা)-কে কুরআন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সোজা পথে চলো, তারাই নাযাত পাবে, যারা জানতে চেষ্টা করে কুরআন কী উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে।'

হিশাম বিন উরওয়া বিন যুবাইর (রা) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে কখনো কুরআনের ব্যাখ্যা করতে শুনিনি।[১]

ওপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সাহাবা কিরামদের অধিকাংশই কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। এজন্য তাদের সময়ে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কাংখিত মানে পৌঁছুতে পারেনি।

---

১. ফজরুল ইসলাম — ড. আহমদ আমীন।

যখন সাহাবাদের যুগের পর তাবিয়ীদের যুগ এলো, তখন আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আগের চেয়ে কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করলো। তবে তার ধরন ছিল, কোন আয়াতের তাফসীর অনুরূপ কোন বাক্য বা শব্দ দিয়েই তারা সম্পাদন করতেন। যাতে মোটামুটি ভাবটা বুঝা যায়। যেমন ঃ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ —এ আয়াতের তাফসীর এভাবে করতেন غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِمَعْصِيَةٍ ঃ অর্থাৎ গুনাহ্ করার ইচ্ছে পোষণকারী হয়ো না। তেমনিভাবে তাঁরা وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ -এর তাফসীর করেছেন ঃ জাহিলী যুগে যখন কোন ব্যক্তি সফরে যাবার ইচ্ছে পোষণ করতো তখন দুটো তীর দিয়ে লটারী করতো। তার মধ্যে একটি তীরে লেখা থাকতো اِفْعَلْ —একাজ করো এবং অপরটিতে লেখা থাকতো لَاتَفْعَلْ —একাজ করো না। তাঁরা চোখ বুজে তীর তুলতো এবং তীরের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতো। এ আয়াতে আল্লাহ্ একাজ করার জন্য নিষেধ করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ এর শানেনযুল বা পটভূমিও বর্ণনা করেছেন। এমনকি তাফসীর করতে গিয়ে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের কিছু কাহিনী বর্ণনা করাও৮তাদের রেওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে তাফসীর শাস্ত্রের বিস্তৃশি ঘটে। কিন্তু কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্যকে বর্ণননর বিষয়বস্তু করার পরিবর্তে সেখানে ইতিহাস, বক্ষাকরণ, দর্শণ ও তর্কশাস্ত্রের বিষয়বস্তু প্রাধান্য লাভ করে। এভাবে আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্যকে চিহ্নিত করার যে সুযোগ তাদের আসে তারা তা হাতছাড়া করে বসেন।

মুতাআখ্খিরীনদের মধ্যে আল্লামা জামাখশারী আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্যের দিকটি কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। তাই তিনি এ ব্যাপারে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। যেমন তিনি وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ —যখন মূসা (আ)-এর রাগ প্রশমিত হলো। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ "সম্ভবত মূসা (আ) ঐ সমস্ত কাজের ওপর রেগে গিয়েছিল যা তারা তাঁর অনুপস্থিতিতে করেছিল। তিনি নিজের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ একি করছো ? একথা বলে লিখিত তওরাতের ফলকগুলো নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁর ভাইয়ের দাড়ি ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন।"

তবু বলা যায় জামাখশারী এ কাজে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারেননি। কারণ তার বর্ণনা ও উপস্থাপনার গভীরতা কমই পরিলক্ষিত হয়।

এ আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা করতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। ধরা যেতে পারে غَضَبٌ (রাগ) একজন মানুষ। যে কথা বলে আবার চুপ করে

থাকে। যে মূসা (আ)-কে উদ্বুদ্ধ করে ঠিকই কিন্তু নিজে নেপথ্যে থাকে। মনে হয় প্রকৃত সৌন্দর্য হয় غَضَبُ (রাগ)কে মানবরূপে কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জামাখশারীর অবশ্য সে অনুভূতি ছিল কিন্তু তা তিনি প্রকাশ করতে পারেননি। যা কিছু বলেছেন তা সমসাময়িককালের গণ্ডিতে আবদ্ধ।

জামাখশারী সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর করেছেন এভাবে ঃ 'বান্দা যখন তার স্রষ্টা ও অভিভাবকের প্রশংসা করতে গিয়ে বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। তখন বুঝা যায় সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর। অতপর ঐ সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে বলে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজাহানের প্রতিপালক-মালিক। কোন বস্তুই তার মালিকানা ও প্রতিপালনের আওতার বাইরে নয়। তারপর বলে ঃ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ —ছোট-বড় এবং সমস্ত জাতি ও প্রজাতির ওপর অনুগ্রহ প্রদানকারী। এভাবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের অনুপ্রেরণা অর্জন করে।

য়খন বলে উঠে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ —তিনিচ তো বিচার দিনের মালিক। এ পর্যন্ত পৌছে সে আবেগাপ্লুত হয়ে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঐ সত্তার পর সোপর্দ করে দেয় এবং একমাত্র তাঁরই সাহায্যক্ষ ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে বলে উঠে ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। —আমি শুধু তোমার ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য চাই।

সূরা ফাতিহা অধ্যয়নে যে অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে শৈল্পিক বিন্যাসকে মূর্তমান করে তুলে ধরার এক উত্তম প্রচেষ্টা। কুরআনে কারীমের মধ্যে ছন্দ ও বিষয় বিন্যাসের ধারাবাহিকতা সৃষ্টিতে প্রথম দিকের সূরাগুলোর মধ্যে যে স্টাইল অবলম্বন করা হতো এ সূরাটি তার অন্যতম।

কুরআন শরীফের যে সমস্ত জায়গায় এ ধরনের ছন্দ ও বিন্যাস পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করতে অনেক তাফসীরকারই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা আদৌ সফলতা লাভ করতে পারেননি। বরং কাজের কাজ এতোটুকু হয়েছে যে, যেখানে একই রকম বিন্যাস ও সাদৃশ্য পাওয়া গেছে তাকে চিহ্নিত করেছেন মাত্র। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা কোন নীতিমালা বর্ণনা করতে পারেননি। অবশ্য এতোটুকু করতেই তাদেরকে গলদঘর্ম হতে হয়েছে।

রইলো বালাগাত ও কুরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে বিতর্ককারী ওলামাগণ। আশা করা হয়েছিল হয়তো তারা এদিকে তাফসীরকারদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস ও তার সৌন্দর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানের সামর্থ রাখেন কিন্তু তারা শুধু নিজেদেরকে অনর্থক তর্ক-বিতর্কেই নিয়োজিত রেখেছেন।

যেমন ঃ বালাগাত (আলংকারীক বিন্যাস) কি শব্দের মধ্যে না অর্থের মধ্যে পাওয়া যাবে, এ নিয়ে বিতর্ক। তাদের মধ্যে কতিপয় আলিম এমনও ছিল অলংকার শাস্ত্রের মূল নিয়ম-নীতি যাদের নখদর্পণে ছিল। তার ওপর ভিত্তি করেই তারা কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্যকে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো এর মাত্রা ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

এবার আল-কুরআনের সামান্য একটি অংশের সৌন্দর্য সম্পর্কিত বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط

যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে নতশির হয়ে দাঁড়ানো। (সূরা আস্-সিজদাহ ঃ ১২)

ইসলাম অস্বীকারকারীরা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় উঠবে, এ আয়াতটি তার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এ আয়াতটি তিলাওয়াত করা মাত্র চোখের সামনে ভেসে উঠে এমন এক অপরাধীর চিত্র, যে অত্যন্ত হীন ও নীচ অবস্থায় মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কার সামনে দাঁড়িয়ে ? স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে। এতো শুধু কল্পনাই নয়, যেন বাস্তব ও চাক্ষুষ। এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, এ ধরনের যতো আয়াত আছে সে সম্পর্কে বালাগাতের বক্তব্য শুধু একটি। তা হচ্ছে, 'এ আয়াতে تَرَى (তুমি দেখবে) শব্দটি সম্বোধন পদ। সম্বোধন মূলত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময় অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকেও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। যেমন বলা যায়, অমুক ব্যক্তি খুব খারাপ। যদি তুমি তাকে সম্মান করো তবে সে তোমাকে অপদস্থ করবে। আর যদি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো তবে সে তোমার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করবে।'

এ ধরনের কথোপকথনের জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, যদি তুমি এরূপ করো তবে সেও এরূপ করবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে— তার সাথে এ ধরনের ব্যবহার করা হলে বিনিময়ে এরূপই পাওয়া যাবে। শব্দটি সম্বোধন পদে এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাতে সাধারণত্ব প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হবে সে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়। এ ধরনের উদাহরণ আল-কুরআনে ভুরি ভুরি আছে। এ আয়াতেও [وَلَوْ تَرَىٰٓ اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ] সাধারণত্ব প্রকাশ করার জন্যই সম্বোধন আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, অপরাধীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। এতো সুস্পষ্ট কথা যেখানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ জন্য সেই ভীতিকর

অবস্থা দর্শনের সাথে কাউকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং যার মধ্যে দর্শনের উপযোগিতা পাওয়া যাবে সেই সম্বোধনের মধ্যে শামিল।

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বিষয়বস্তুর যে জীবন্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অলংকার শাস্ত্রের (বালাগাতের) সুপণ্ডিতগণ তাকে জটিল করে রেখেছেন। যেরূপ তারা উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। পরিশেষে বালাগাত বিশেষজ্ঞগণ একথা বলে বক্তব্য শেষ করে দেন যে, এ আয়াতে অপরাধীদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলা হয়েছে। যা সর্বোচ্চ প্রকাশভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া কুরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রাখা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ— যে সমস্ত আয়াতে কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র অংকন করা হয়েছে সে সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ
شَآءَ اللّٰهُ ط ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ -

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন সে ব্যতীত। অতপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তক্ষণি তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً لا وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ
مِنْهُمْ اَحَدًا ج

যেদিন আমি পর্বতসমূহকে চলমান করবো সেদিন তুমি পৃথিবীকে দেখবে এক উন্মুক্ত প্রান্তর। তারপর আমি সকলকে একত্রিত করবো। (আগের কিংবা পরের) কেউ বাদ পড়বে না। (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৪৭)

وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاۤءِ
اَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ط قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ -

জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদেরকে তা থেকে কিছু খাদ্য বা পানীয় দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন। জান্নাতীগণ বলবে ঃ আল্লাহ্ এ উভয় বস্তু কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

(সূরা আল-আরাফ ঃ ৫)

ওপরের আয়াত ক'টিতে পরিপূর্ণ কিছু ছবি ভেসে উঠেছে। যে ছবিগুলো অত্যন্ত পেরেশানীর ও মর্মান্তিক। চোখ তা দেখে, কান তা শোনে এবং মনের গভীরে তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে— বালাগাতের পণ্ডিতগণ শুধু এ কথাই বলবে যে, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়সমূহকে অতীতকালের শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। যেন বুঝা যায়, এতো ঘটেই আছে।

বালাগাত ও কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রবক্তা ওলামাদের মধ্যে একজন আল্লামা জামাখশারীর পূর্বসূরী ছিল। যিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতা প্রদর্শন করেছেন এ সমস্ত ব্যাপারে। তাকে এ ব্যাপারে মুহাক্কিক বলা যেতে পারে। তিনি হচ্ছেন আবদুল কাহের জুরযানী। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই, তাঁর রচিত 'দালাইলুল ইজায' এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখজনক কথা হলো, গোটা পুস্তকটিই আল-কুরআনের শব্দ ও অর্থ সংক্রান্ত বক্তব্যে পরিপূর্ণ। যা থেকে সাধারণের শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। তবু বলা যায়, সেটি ঐ সমস্ত ওলামাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম, যারা এ ব্যাপারে লিখনী চালিয়েছেন। এমনকি বর্তমান সময়েও এ বিষয়ে কেউ তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।

আবদুল কাহির জুরযানী আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি যতোটুকু অগ্রসর হয়েছেন আমরা তার উদাহরণ তুলে ধরছি, যদিও তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য পাঠকের অত্যন্ত ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কারণ সাহিত্যে যখন মানতিক (Logic) ও কালাম শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হতো তখন তার ব্যাখ্যা ও বর্ণনার এ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হতো। আবদুল কাহির জুরযানী লিখেছেন ঃ

"উদ্ধৃতাংশের সুন্দর ও অসুন্দরের বর্ণনা তখনই সম্ভব যখন কোন ব্যক্তি বাক্যের বিন্যাস ও ছন্দ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা রাখে। আপনারা জানেন, যখন লোক এ আয়াত ঃ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا —মাথায় বার্ধক্যের ছাপ লেগেছে (সূরা মারইয়াম ঃ ৪) তিলাওয়াত করে, তখন ঐ অংশের রূপ সৌন্দর্য নির্ভর করে শুধুমাত্র উদ্ধৃতির ওপর। এছাড়া আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। প্রকৃত অবস্থা তা নয়। এ আয়াত শোনামাত্র শ্রবণকারীর ভেতর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা শুধুমাত্র উদ্ধৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়। এর আসল কারণ হচ্ছে, কোন বাক্যে যদি বিশেষ্যকে কর্তা বানানো হয় তবে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তাকে পেশ দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি কর্তা (فاعل) নয়। যদি ঐ বিশেষ্যের পর সম্পর্কযুক্ত আরেকটি বিশেষ্য (اسم منصوب) নেয়া হয় তখন তাই হবে ঐ

ক্রিয়ার (فعل) আসল কর্তা (فاعل)। অর্থাৎ ক্রিয়াকে দ্বিতীয় বিশেষ্যের কারণে প্রথম বিশেষ্যের দিকে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় বিধায় দুটো বিশেষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যপাওয়া যায়। যেমন ঃ

طَابَ زَيْدُ نَفْسًا - قَرَّ عَمْرُوْ عَيْنًا - تَصَبَّبَ عَرَقًا - كَرُمَ اَصْلاً - حَسُنَ وَجْهًا -

এ রকম আরো অনেক বাক্য আছে যার ক্রিয়াকে প্রকৃত কর্তার সাথে সম্পর্কিত না করে তার কারণের দিকে সম্পর্কিত করা হয়। কেননা আমরা একথা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত যে, اشْتَعَلَ ক্রিয়ার আসল কর্তা হচ্ছে شَيْبَ ; যদিও বাহ্যিকভাবে اَلرَّأْسُ কে কর্তা মনে হয়। তদ্রূপ অন্য উদাহরণে طَابَ এর প্রকৃত কর্তা نفس এবং قَر ক্রিয়ার প্রকৃত কর্তা عَيْنَ আর تَصَبُّ এর প্রকৃত কর্তা عَرَقًا। এ সমস্ত বাক্যে ক্রিয়াকে এমন বিশেষ্যের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ঐ ক্রিয়ার কর্তা নয়। উদ্ধৃতাংশের উদাহরণগুলোতে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে তা ক্রিয়াকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কর্তা নয় এমন বিশেষ্যের সাথে সম্পর্কিত করার কারণেই সম্ভব হয়েছে। যদি এরূপ না করে প্রকৃত কর্তার সাথে সম্পর্কিত করে বলা হতো ঃ اشْتَعَلَ الشَّيْبُ فِىْ الرَّأْسِ তাহলে প্রকৃত সৌন্দর্য বিলোপ হয়ে যেত। যদি প্রশ্ন করা হয়, সৌন্দর্য বিলোপের কারণ কি? তার উত্তর হচ্ছে وَاسْتَعَلَ الرَّسُ شَيْبًا বাক্যের মধ্যে যে সাধারণ সৌন্দর্য বিদ্যমান তা اشْتَعَلَ الشَّيْبُ বাক্যে নিহিত নেই। প্রথম বাক্যের তাৎপর্য হচ্ছে পুরো মাথাই সাদা হয়ে গেছে, কোন অংশই সাদা থেকে বাকী নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে এ অর্থ বুঝা যায় না, তা থেকে বুঝা যায় তার মাথার কিছু অংশ সাদা হয়ে গেছে, পুরো মাথা নয়। তেমনিভাবে যদি বলা হয় ঃ اشْتَعَلَ الْبَيْتُ انَارًا তবে বুঝা যায় পুরো ঘরই আগুনে জ্বলেছে। ঘরের কোন অংশই আগুনের আওতার বাইরে ছিল না। কিন্তু যদি বলা হয় اشْتَعَلَتْ النَّارُ فِى الْبَيْتِ তাহলে বুঝা যায়, ঘরের কোন অংশ জ্বলে গেছে। পুরো ঘরে আগুন লাগা এবং পুরো ঘর পুড়ে ছারখার হওয়ার কথা এ বাক্যে বুঝা যায় না। কুরআনে কারীমের আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ আয়াতে কারীমাটি ঃ

وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا -

আমরা জমিন বিদীর্ণ করে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি।

এ আয়াতে عُيُونًا প্রকৃতপক্ষে فَجَّرْنَا শব্দের কর্মকারক (مفعول) কিন্তু দৃশ্যত الارض শব্দকে কর্মকারক (مفعول) বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে পূর্বোক্ত আয়াতে اَلرَّأْسُ কে اِشْتَعَلَ-এর কর্তা হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তনের কারণে সাধারণভাবে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা হয়, তদ্রূপ এ বাক্যেও অনুরূপ ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছে। বুঝা যাচ্ছে গোটা জমিন বিদীর্ণ করে সকল স্থানে ঝর্ণা সৃষ্টি করা হয়েছে। বাক্যটিকে এভাবে বলা যায় وَفَجَّرْنَا عُيُوْنَ الْاَرْضِ অথবা এভাবেও বলা যায় وَفَجَّرْنَا الْعُيُوْنَ فِىْ الْاَرْضِ তবে এতে উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয় না। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে— জমিনের বিভিন্ন জায়গায় ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে একথা বুঝানো। (দালাইলুল ই'জায, জুরযানী)

আল্লাহ্ তা'আলা আবদুল কাহের জুরযানীর ওপর রহম করুন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কিন্তু সবকিছুকে ভাষায় রূপ দিতে পারেননি। اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا এবং وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا বাক্যদ্বয়ের মধ্যে যে শৈল্পিক সৌন্দর্য নিহিত তা কালাম শাস্ত্রের দৃষ্টিতে তাই, যা তিনি লিখেছেন। কিন্তু তা ছাড়াও শৈল্পিক সৌন্দর্যের আরেকটি দিক আছে। তা হচ্ছে চিন্তার জগতকে দ্রুত আলোড়িত করা, যাকে اشتال শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। দৃশ্যত সাদা চুলের সম্পর্ক মাথার সাথে করা হয়েছে। যা পুরো মাথায় বিস্তৃতি লাভ করবে। তদ্রূপ تفجير বা বিদীর্ণ করার ক্ষেত্রে দ্রুততা পাওয়া যায়। যা মানুষের চিন্তা-চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং প্রভাবিত করে ফেলে।

এতো দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টির জন্য وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا বাক্যটি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী। এজন্য যে, সাদা চুলের সম্পর্ক যৌবনের সাথে করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যৌবন তার মধ্যে পাওয়া যায় না। সৌন্দর্যের মূল উৎস এখানেই নিহিত। যেমন এর প্রমাণ اشْتَعَلَ الْبَيْتُ نَارًا বাক্যটি। এর মধ্যে যে সৌন্দর্য নিহিত আছে তা কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াতটির মতোই। সত্যি কথা বলতে কি, উক্ত আয়াতে দু' ধরনের সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, যৌবনকে পাকা চুলের সাথে সম্পর্কিত করলে পাওয়া যায়।
দ্বিতীয়ত, পাকা চুলকে মাথার সাথে সংশ্লিষ্ট করলে পাওয়া যায়।

এ দু' ধরনের সৌন্দর্য একটি আরেকটির পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে কখনো আয়াতের সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে না।

আবদুল কাহের জুরযানী (র) এখানে এসেই থেমে গেছেন। আগে বাড়তে পারেননি। দৃশ্যত মনে হয় তার লক্ষ্য এতোটুকুই ছিল। কারণ তার বর্ণনায় এর চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায় না। প্রত্যেক যুগেই ভাষা ও সাহিত্যের একটি স্টাইল থাকে। আমরা আশা করতে পারি না তিনি তার যুগের সেই স্টাইলকে অতিক্রম করে যাবেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এ পর্যন্ত কুরআনের তাফসীর ও অলৌকিকত্ব সম্পর্কে ওলামাগণ যে সমস্ত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা নির্দিষ্ট এক সীমায় এসে থেমে গেছে। আগে বাড়তে পারেনি। প্রাচীন আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের কিছু দিক ছিল। যে কোন রচনা সেই আলোকে যাচই করা হতো। তার থেকে আগে বেড়ে এমন হয়নি যে, সার্বিক কাজের পর্যালোচনা করে তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা হবে। কুরআনী বালাগাতের ব্যাপারটিও ছিল তেমন। আজ পর্যন্ত এমন চেষ্টা কেউ করেননি যে, কুরআনের আয়াতকে পৃথক পৃথক আলোচনার বিষয় না বানিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনার বিষয় বানাবেন। তাই বালাগাতপন্থী ওলামাগণ করার মধ্যে এই করেছেন যে, তারা কুরআনের সমস্ত শব্দ, ছন্দ ও বিন্যাসের পদ্ধতিকে বালাগাতের বিষয়বস্তু বানিয়ে নিয়েছেন। তারপর এ কথা প্রমাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন যে, গোটা কুরআনই বালাগাত ও ফাসাহাতে পরিপূর্ণ।

আল-কুরআনের বালাগাত নিয়ে যে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম আলোচনায় লিপ্ত হতেন তারা কুরআনের একক বৈশিষ্ট্যকে আলোচনার বিষয়বস্তু বানিয়ে ছিল কিন্তু তারা কুরআনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারেননি। অবশ্য যদিও বিচ্ছিন্নভাবে কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য নির্ণয়ের চেষ্টা তারা করেছেন। কিন্তু তা কোন কাজেই আসেনি। যে সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, বালাগাতপন্থী সেসব ওলামাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং অপূর্ণাঙ্গ ছিল।

এ বিষয়ে সর্বশেষ কথা হচ্ছে— কোন বক্তব্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাওয়া পরিতাপের বিষয় হচ্ছে— বালাগাতের আলিমগণ আরবী সাহিত্য কিংবা কুরআনে কারীমের সেই সীমা তারা স্পর্শ করতে পারেননি। কারণ কুরআনে কারীমের গুরত্বপূর্ণ শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত ও বর্ণনা করার বিষয়টি আজও রহস্যাবৃত হয়েই আছে। এ অলৌকিক গ্রন্থটির দারস ও অধ্যয়নের জন্য এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং তার শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করানোর জন্য সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে আলোচনা করাকে অপরিহার্য মনে করা হয়েছে এবং অলৌকিক বিষয়সমূহের এমন ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা কুরআনে কারীমের একক সেই বিষয়সমূহ থেকেই নেয়া।

একটি কথা স্মর্তব্য, এ মহাগ্রন্থ যে বৈশিষ্ট্যের ধারক তা কোন নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং গোটা গ্রন্থেই তা সমভাবে বিস্তৃত। সমস্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ধারা বর্ণনা পর্যন্ত এক ও অভিন্ন। যদিও উদ্দেশ্য হচ্ছে— সুসংবাদ দেয়া, আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে ভয় দেখানো, অতীতে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার বর্ণনা, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোন বিষয়ের বর্ণনা কাউকে আশ্বস্ত করার অভয় বাণী, ঈমান গ্রহণের আহ্বান, দুনিয়াতে জীবন যাপন সম্পর্কে পথ-নির্দেশ দান, কিংবা কোন বিষয়কে বোধগম্য করার জন্য তার চিত্রায়ণ, কিংবা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বর্ণনা অথবা মনোজগতের মূর্তমান দৃষ্টান্ত, কিংবা অতীন্দ্রিয় কোন বস্তুর বর্ণনা, যাই হোক না কেন, বর্ণনা ও বাচনভঙ্গির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

কুরআন মজীদের সমস্ত বর্ণনার মধ্যেই একটি সূত্র বিদ্যমান। যা প্রমাণের জন্যই আমরা এ পুস্তকটি লিখেছি। এ সূত্রটিকে আমি 'শৈল্পিক চিত্র' নামে অভিহিত করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

শৈল্পিক চিত্র

চিত্র কুরআন মজীদের বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য। আল-কুরআনের উদ্দেশ্যকে হৃদয়পটে অংকিত করার এটি একটি উপকরণ। চিত্রের দ্বারা অব্যক্ত ও দুর্বোধ্য বিষয়ের কল্পিত ছবি মনের মুকুরে প্রতিবিম্বিত করা হয়। বিজ্ঞচিত ভাবে চিত্রিত এ চিত্রগুলো জীবন ও কর্মের ওপর প্রভাব ফেলে। কারণ কল্পিত বিষয় তখন স্বরূপে মূর্তমান হয়ে চোখের সামনে উপস্থিত হয়। মৃত মানুষ জীবিত মানুষে রূপান্তর হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ছবিতে বর্ণনা, সাক্ষ্য ও ঘটনাবলী দৃশ্যাকারে চোখের সামনে ভেসে উঠে এবং তাতে জীবন ও কর্ম চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয়। যদি তার মধ্যে সংলাপ ও ভাষা সংযোজন করা যায়, তাহলে তা জীবন্ত অভিনেতা হিসেবে প্রকাশ পায়। এসব কিছুই সেই স্ক্রীন বা পর্দার ওপর প্রতিফলিত হয় যা স্টেইজের ওপর থাকে। শ্রোতা কিংবা পাঠক এতো তন্ময় হয়ে যায় যে, সে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে যায়, এতো আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে, যেখানে এ ধরনের উদাহরণ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। বরং সে তখন দিব্য দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে। একের পর এক দৃশ্যাবলী পরিবর্তন হতে থাকে। তার মনে হতে থাকে এতো শুধু ছবি নয় এ যেন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

যখন মস্তিষ্কের গোপনীয় কথা, মনোজাগতিক অবস্থা, মানুষের গতি-প্রকৃতির চিত্রায়ণ করা হয় তা শুধুমাত্র প্রাণহীন কিছু বাক্যের মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে কোন রঙের প্রলেপ থাকে না, কিংবা তার মুখ থেকে কোন শব্দ বা বাক্যও নির্গত হয় না। তবু আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না, আল-কুরআনের অলৌকিকতার এ চমক। এমনি ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের সার্থক চিত্রায়ণ ও উপমা উৎক্ষেপনে আল-কুরআন পরিপূর্ণ। যে উদ্দেশ্যের কথা আমরা একটু আগে বলেছি যেখানে সেই রকম কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে সেখানে কুরআন এ ঢংয়েই তার বর্ণনা পেশ করেছে। —যেমন পুরোনো বিষয় নতুন উপস্থাপনা অথবা মনোজাগতিক অবস্থা এবং তার প্রকৃতি বুঝানো কিংবা মানবিক দৃষ্টান্ত অথবা সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের পুনরালোচনা, বা কিয়ামতের দৃশ্য চিত্রায়ণ কিংবা

জান্নাতের শান্তি ও জাহান্নামের শাস্তির চাক্ষুষ বিবরণ অথবা বিতর্কের বর্ণনা ইত্যাদি। শুধুমাত্র কুরআনের বাচনভঙ্গিকে আকর্ষণীয় করার জন্য এ কাজ করা হয়নি। এটি কুরআনের নির্দিষ্ট ও বিশেষ এক পদ্ধতি। যাকে আমরা চিত্রায়ণের পদ্ধতি বলে অভিহিত করতে পারি।

আমরা ছবির তাৎপর্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করবো, যাতে বুঝা যায়, আল-কুরআনে শৈল্পিক চিত্রের সীমা-পরিসীমা কী। ছবি তো রঙতুলির সাহায্যে আঁকা যায়, আবার চিন্তা ও ধ্যানের সাহায্যেও আঁকা যায়। আবার সঙ্গীতের রাগিনীর মাধ্যমেও কোন চিত্রের সার্থক পরিস্ফুটন ঘটানো যায়। কখনো এমনও হয় যে, চিত্রের উপকরণ হিসেবে বাক্য, শব্দ, পাঠের ঢং ও আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহও ব্যবহৃত হয়। যখন এ ধরনের চিত্র আমাদের সামনে আসে তখন চোখ-কান, চিন্তা-চেতনা, মন-মস্তিষ্ক সবকিছু মিলেই তা উপভোগ করা হয়।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক, কুরআনী ছবিগুলো স্কেচ ও রঙের সাহায্যে অংকিত হয়নি বরং তা হয়েছে মানুষের জীবন ও জগতের সাহায্যে। এগুলো এমন ছবি যা চেতনা ও অনুভূতি থেকে নিঃসৃত হয়। অর্থগুলো ছবির রঙ হয়ে মানুষের মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়।

এখন আমরা এর কিছু উদাহরণ পেশ করবো।

ভাবকে বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ

১. একথা বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে কাফিরদের কোন অভিযোগ কিংবা অনুরোধ গৃহিত হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও জান্নাতে প্রবেশ করাটা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা বুঝানোর জন্য কত সুন্দর এক চিত্র অংকন করা হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۤءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ

যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা ততোক্ষণ জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না যতোক্ষণ না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করতে পারবে। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৪০)

এ আয়াত পড়া কিংবা শোনামাত্র পাঠকের সামনে দুটো ছবি ভেসে উঠে। একটি আসমানের দরজা খোলার ছবি এবং অপরটি সুইয়ের ছিদ্রপথে প্রবেশ করার জন্য হৃষ্টপুষ্ট এক উটের প্রচেষ্টারত ছবি। অবোধগম্য এক জটিল বিষয়কে বোধগম্য করার জন্য পরিচিত এক চিত্রে পেশ করা হয়েছে। মানুষের মনে এটি শুধু ভাবের সৃষ্টি করে না বরং বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ছবিরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠে।

২. আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাতে চান, কিয়ামতের দিন কাফিরদের ভালো কাজসমূহকে এমনভাবে নষ্ট করে দেবেন, মনে হবে তার কোন অস্তিত্বই কখনো ছিল না। নিচের বাক্যে একথাটির সুন্দর এক চিত্র অংকিত হয়েছে ঃ

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا –

আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবো, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ২৩)

এ আয়াত পড়ে পাঠক যখন বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার কথা চিন্তা করে তখন তাদের এ আমলের অসারতার চিত্র তার মানসপটে ভেসে উঠে।

৩. নিচের আয়াতটিতেও এ রকম আরেকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ط لَايَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ط

যারা তাদের পালনকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাদের আমলের উদাহরণ হচ্ছে— সেই ছাই-ভস্মের মতো যার ওপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোন অংশই তাদের হস্তগত হবে না। (সূরা ইবরাহিম ঃ ১৮)

ধূলিঝড়ের দিনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এমন একটি করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি মানুষই কল্পনার চোখে দেখতে থাকে, প্রবল ঝটিকা সব কিছুকে তছনছ করে দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে উড়িয়ে নিয়ে গেল, যা আর শত চেষ্টাতেও একত্রিত করা সম্ভব হলো না। তেমিনভাবেই কাফিরদের আমল নিষ্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে।

৪. আল্লাহ্ তা'আলা বলতে চান, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করলো কিছু পরে তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হেয় করার চেষ্টা করলো, তাহলে তার এ দান বিফলে গেল। এরই এক চাক্ষুষ ও জীবন্ত ছবি এ আয়াতটিতে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ –

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাতকে বরবাদ করে দিয়ো না সেই ব্যক্তির মতো, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো যার ওপর কিছু মাটি পড়েছিল, কিন্তু এক প্রবল বৃষ্টি তা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলো। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পাবে না যা তারা উপার্জন করেছে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৪)

এ আয়াতে এক দ্বিমুখী চিত্র অংকন করা হয়েছে। প্রথম চিত্রটি হচ্ছে একটি নগ্ন পাথর যার ওপর মাটির হাল্কা প্রলেপ পড়েছে মাত্র কিন্তু বৃষ্টি এলে তা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়, ফলে পাথর পাথরের চেহারা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। এ উদাহরণ হচ্ছে যারা দান করে বলে বেড়ায় তাদের জন্য। পরে বলা হয়েছে যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দান করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— বাগানের মতো। যেখানে কম হোক কিংবা বেশি কোন বৃষ্টিই বৃথা যায় না। তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। এমনকি যদি কোন বৃষ্টি নাও হয় তবু তা ফল উৎপন্ন করবে।

আমি এখানে একথা বলতে চাই না যে, উপরোক্ত ছবি দুটোতে স্থান ও কালের সামঞ্জস্য কতটুকু। সেগুলোর সাদৃশ্য বিধানে কি ধরনের সৌন্দর্যের পোশাক পরানো হয়েছে। তাছাড়া একথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয় যে, পাথরের ওপর হাল্কা মাটির আস্তরণ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে, যে দান-খয়রাত করে আবার দান গ্রহিতাকে কষ্ট দেয় অর্থাৎ সেই দান সাময়িকভাবে তাদের কুৎসিত চেহারাকে ঢেকে রাখে কিন্তু অল্প পরেই তাদের সে চেহারা নগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

আমি বলতে চাই ছবির উপকরণ সম্পর্কে। অবশ্য এ পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ই রাখা হয়েছে।

৫. এ বিষয়ের আরেকটি চিত্র হচ্ছে ঃ

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ط

তারা এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করে তার উপমা ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সেই জাতির শস্য ক্ষেতে গিয়ে লেগেছে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। অতপর সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১৭)

এ আয়াতে এমন এক ক্ষেতের দৃশ্য অংকিত হয়েছে, যে ক্ষেতের ওপর দিয়ে তুষার ঝড় প্রবাহিত হয়েছে, ফলে তার সমস্ত ফল-ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্ষেতের মালিকের সমস্ত শ্রম ও মেহনত ব্যর্থ হয়েছে। এতো পরিশ্রমের পরও শস্য ঘরে তুলতে পারলো না। হুবহু এ ধরনের কাজই হচ্ছে, যারা কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র পথে দান করে বিনিময় পাবার আশা রাখে, কিন্তু কুফরী তাদের সে নেক আমলকে ভূমিসাৎ করে দেয়।

এ দৃশ্যে صر (সির্‌রুন) শব্দটি কতো পরিকল্পিতভাবে চয়ন করা হয়েছে এবং এ শব্দটি দিয়ে দৃশ্যটিকে সৌন্দর্যের শেষ সীমায় পৌছে দেয়া হয়েছে। মনে হয় ঠাণ্ডার ছোট ছোট গোলা দিয়ে শষ্য ক্ষেতকে ধ্বংস করা হচ্ছে। শব্দটি গোটা চিত্রকে প্রাণবন্ত করে দিয়েছে। এ ধরনের শব্দ চয়ন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমরা স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রেখেছি।

৬. আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাতে চান, যদি কেউ তাঁকে ডাকে তবে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন এবং তার মনোবাসনা পুরো করে দেন। তাঁকে ছাড়া যদি আর কাউকে ডাকা হয় তবে সে তার ডাক শুনতেও পায় না এবং তার কোন মনোবাসনা পূর্ণও করতে পারে না। কারণ সে তো আর সবকিছুর মালিক নয়। এ বিষয়ে নিচের আয়াতে কতো সুন্দর এক চিত্র অংকন করা হয়েছে।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ط وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ - (الرعد : ١٤)

সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই এবং তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না। ওদের দৃষ্টান্ত এমন কেউ দু'হাত পানির দিকে

প্রসারিত করলো, যেন পানি তার মুখে পৌছে যায়, অথচ পানি কখনোই তার মুখে পৌছুবে না। কাফিরদের যতো আহ্বান তা সবই বিফল।
(সূরা আর-রা'দ ঃ ১৪)

এটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এক ছবি। যা মানুষকে সে দিকে আকর্ষণ করে। কথার দ্বারা এর চেয়ে আকর্ষণীয় কোন চিত্র অংকন করা সম্ভব নয়। দেখুন ছবিটি কতো স্বচ্ছ— এক ব্যক্তি পানির পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে পানিকে আহ্বান করছে তার মুখে প্রবেশ করার জন্য, কিন্তু সে পানি কখনো তার মুখে প্রবেশ করবে না?

৭. উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য যাদের পূজা-অর্চনা করা হয়, সেগুলো না কিছু শুনতে পায়, না কিছু দেখতে পায়, জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি থেকে মাহরূম। কাজেই যারা তাদের বন্দেগী করে সে বন্দেগী বিফল হতে বাধ্য। এটি প্রকাশের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা এমন মর্মস্পর্শী যে, অন্য কোন উপায়ে তা আঁকা সম্ভব নয়।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ -

কাফিরদের উপমা এরূপ, কোন ব্যক্তি এমন কিছু (পশু)-কে আহ্বান করে যারা শুধুমাত্র চীৎকার ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। তারা বোবা, বধির ও অন্ধ, কিছুই বুঝে না। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭১)

কাফিররা যেসব মাবুদদেরকে আহ্বান করে তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তারা না পারে আহ্বানের মূল্যায়ণ করতে আর না পারে তাদের আহ্বানের উদ্দে অনুধাবন করতে। এটি একটি উপমা। এ আয়াতে এমন এক সম্প্রদায়ের চিত্র অংকিত হয়েছে যারা তাদের মাবুদদেরকে আহ্বান করে ঠিকই কিন্তু এর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাটির পুতুল তো কিছুই বুঝে না। তারা এতো উদাসীন যে, তাদের আহ্বান যথাযথ জায়গায় পৌছুল কিনা কিংবা সে আহ্বানের কোন সাড়া মিললো কিনা এ সম্পর্কে কোন খবরই তারা রাখে না।

৮. এখানে বুঝানো উদ্দেশ্য, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকা হয় এবং যাদের উপাসনা করা হয়, তারা অত্যন্ত দুর্বল। কাজেই যারা নিজেরাই এতো দুর্বল তারা কি করে অপরকে রক্ষা করতে পারে? তারই সুন্দর চিত্র অংকিত হয়েছে এ আয়াতটিতে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ -

যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অপরকে অভিভাবক বানায় তাদের উদাহরণ মাকড়সার মতো। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে একমাত্র মাকড়সার ঘরই অত্যন্তর দুর্বল। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৪১)

আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যকে প্রতিপালক মনে করে, তারা তো মাকড়সার ঘরের মতো এক দুর্বল ঘরে আশ্রয় নেয়। যা সামান্য আঘাতেই নষ্ট হয়ে যায়। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, এতো স্থূল দৃষ্টান্তের পরও তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না, তারা মূর্খতা ও অহংকারেই নিমজ্জিত।

৯. এখানে যে কথাটি বুঝানো উদ্দেশ্য তা হচ্ছে— মুশরিকরা এমন এক কাজে জড়িয়ে গেছে যা অসার, যার কোন স্থায়ীত্ব নেই। এমন একটি বস্তুর সাথে তার তুলনা করা হয়েছে যা ভাসমান কিন্তু তা ভেসে থাকাটাও কষ্টকর।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْتَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করলো, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে ছিল। অতপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৩১)

এ আয়াতে মুশরিকদের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিজেদের অজান্তেই যেন তারা মুহূর্তের মধ্যে আসমান থেকে ছিটকে পড়ে কিন্তু মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই মাংসাসী কোন পাখী তাকে থাবা মেরে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিরুদ্দেশ্য করে নিয়ে যায় যেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন করা কখনো সম্ভবপর নয়।

১০. ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহ্ আসমানী কিতাব দিয়েছিল। তারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার ঘোষণা এবং শপথও করেছিল। কিন্তু সামান্য পার্থিব স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি তারা। ফলে তাদের প্রতিশ্রুতিকে নিজেরা নষ্ট করে ফেলেছিল। তাই কিয়ামতের দিন তারা কতোটা

দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ আয়াতে কারীমের মাধ্যমে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَايَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

যারা আল্লাহ্‌র নামে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দেয়, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কোন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না, এমনকি তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৭)

এখানে আহলে কিতাবদের বদ নসীবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিঞ্চত বস্তুর উল্লেখ না করে এমন কিছু আলামতের কথা বলা হয়েছে, যেমন স্বতঃই বুঝা যায় যে, বঞ্চিত বস্তুটি কী। যেমন বলা হয়েছে, আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না বা তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। একথাগুলো বলে আল্লাহ্ বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং চিরসুখের জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে।

মনোজাগতিক চিত্র

১. যে ব্যক্তি তওহীদের ওপর শির্কের জীবনকে বেছে নেয় সে কতটুকু পেরেশানীতে নিমজ্জিত হয় তা বুঝানোর জন্য নিচের আয়াতটি পেশ করা হয়েছে। অনেক ইলাহ্র মধ্যে কিভাবে তার মনকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয় এবং তার মনোজাগতিক অবস্থা কেমন হয়, কিভাবে হেদায়েত ও ভ্রষ্টতার মধ্যে তার মন দোদুল্যমান থাকে তার বাস্তব চিত্র এ আয়াতটি ঃ

قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِيْ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهُ أَصْحٰبٌ يَدْعُوْنَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا –

তুমি বলে দাও, আমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন বস্তুকে আহ্বান করবো, যে আমাদের কোন উপকার কিংবা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। আমরা কি পেছনের দিকে ফিরে যাব আল্লাহ্র হেদায়েতের পর, ঐ ব্যক্তির মতো যাকে শয়তান বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে, ফলে সে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ? আর তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে। এসো, আমাদের কাছে। (সূরা আল-আনআ'ম ঃ ৭১)

এ আয়াতে ঐ ব্যক্তির ছবি আঁকা হয়েছে, যাকে শয়তান বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। তার সাথীরা তাকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করছে কিন্তু সে ভ্রান্তির বেড়াজালে পড়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। দিকভ্রান্তের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, সাথী এবং শয়তান এ দু'দিকের কোন্ দিকে সে সাড়া দেবে, পা বাড়াবে।

২. আল্লাহ্ তা'আলা ঐ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যাদেরকে আল্লাহ্র রাস্তার পথ-নির্দেশ দেয়ার পর সে বহুদূরে পালিয়ে যাবার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এ যেন পতনের স্রোতে ভাসিয়ে দেবারই প্রচেষ্টা। এদিকে মানবিক চাহিদা ও লোভ-লালসা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। জ্ঞান এবং মূর্খতা উভয়ই তার জন্য লাঞ্ছনার কারণ। সে মূর্খতার কারণেও শান্তি পাচ্ছে না, আবার জ্ঞানও তাকে কোন কল্যাণ দিতে পারছে না। এ ছবিটি নিচের ক'টি বাক্যে কতো সুন্দরভাবেই না ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ - وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ -

তুমি তাদেরকে শুনিয়ে দাও, সেই লোকের অবস্থা, যাকে আমি আমার নিদর্শন (হেদায়েত) দান করেছিলাম অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। তার পেছনে শয়তান লেগেছে, ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছে করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতে পারতাম সেসব নিদর্শনের বদৌলতে। কিন্তু সে অধপতিত ও রিপুর বশীভূত হয়ে রইলো। তার উপমা হচ্ছে সেই কুকুরের মতো, যদি তাকে তাড়া করো তবু হাঁপাবে আর যদি ছোড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৮৭৫-১৭৬)

এ ছবিটি হচ্ছে লাঞ্ছনা ও জিল্লতীর বাস্তব রূপায়ণ। এটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এক চিত্র। চির ভাস্বর। এটি এমন এক ছবি যা নিজেই প্রকাশ করে দেয় তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এখানে দ্বীনি গুরুত্বের সাথে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব মিলে একাকার হয়ে গেছে। কুরআনে আঁকা সবগুলো ছবির মধ্যেই এরূপ মিল পাওয়া যায়।

৩. এবার আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাতে চাচ্ছেন, এমন এক ব্যক্তির কথা যার বিশ্বাস ঠুনকো, হৃদয়ের গভীরে যা প্রোথিত নয়। দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব। ঈমানের অধিকারী হওয়ার পরও সে ঈমানের পথে জুলুম-নির্যাতন বরদাশত করতে রাজী নয়। নির্ঝঞ্ঝাটে থেকে ঈমান বহাল রাখতে চায়। তার বিশ্বাসে এমন দৃঢ়তা আসেনি যে, সে যে কোন রকম ঝুঁকির মুকাবেলায় অবিচল থাকবে। এমনি ধরনের লাভ-লোকসানের দোলায় দোদুল্যমান এক চিত্র ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَانَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ج خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে, আর যদি কোন

পরীক্ষায় নিমজ্জিত হয় তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো দুনিয়ায় এবং আখিরাতে। এতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হাজ্জ ঃ ১১)

হারফিন (حَرْفٍ) বা প্রান্তিক সীমা কথাটি বলেই ছবিটিকে চোখের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি এমনভাবে ইবাদত করে, সে ইবাদতের মধ্যেই প্রমাণ করে দেয় যে, সঠিক পথে স্থির অবিচল থেকে ইবাদত করার যোগ্য সে নয়। এ ছবিটি মানুষের মনে এমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আমি সখন প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম তখন কুরআন তিলছওয়াত করতে করতে এই স্থানে পৌঁছুলেই আমার মনের মুকুরে ভেসে উঠতো একটি জীবন্ত ছব্বিযার কথা আমি আজও ভুলিনি।

সেদিনের সেই ছবি আর আজকের অনুভূতির ছবির মধ্যে খুব একটি ব্যবধান নেই। সেদিন একে শুধুই একটি ছবি মনে করতাম আর আজ মনে হয় এটি একটি উপমামাত্র। সত্যিকারের ছবি নয়।

আমি মনে করি, আল-কুরআন এমন অলৌকিকভাবে তার বক্তব্য পেশ করেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রতিটি পাঠক তা বুঝতে সক্ষম এবং প্রতিটি পাঠাকের কাছেই তা জীবন্ত ছবি হয়ে ভেসে উঠে।

৪. যেসব মুসলমান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহান্নামের গর্তের কিনারায় অবস্থান করছিল, তাদের চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا -

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতপর আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে সম্প্রিতি স্থাপন করে দিয়েছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই। তোমরা এক আগুনের গর্তের কিনারে অবস্থান করছিলে, তা থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩)

চিত্রে বুঝানো হয়েছে, তোমরা আগুনের এক গর্তের কিনারে অবস্থান

করছিলে। যেখানে সামান্য একটু পা ফসকে গেলেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতো। অর্থাৎ যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ না করতে তবে জাহান্নাম ছিল তোমাদের জন্য অবধারিত।

এখানে উপমার গ্রহণযোগ্যতা এবং সত্যতা নিয়ে কথা নেই। এখানে যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে অন্তর্লোকে মুসলমানদের যে ছবিটি প্রতিভাত হয়ে উঠে, মনে হয় তারা ইতোপূর্বে আগুনের গুহায় নিশ্চিত পড়ে যাচ্ছিল। কোন শিল্পী কি তার রঙ-তুলির সাহায্যে মনোজাগতিক এমন নিখুঁত স্থির ছবি আঁকতে পারতো ? অথচ কুরআন রঙ, তুলি এবং ক্যানভাস (চিত্রপট) ছাড়াই কয়েকটি শব্দ দিয়ে কতো সুন্দর এক নিখুঁত ছবি এঁকে দিয়েছে।

আমরা এ ছবিতে দেখতে পাই, আগুনের একটি গর্ত, তার পাশে বসা কতিপয় লোক, মাঝের ফাঁকটুকু হচ্ছে দুনিয়ার জীবন, মুসলমান হওয়ার পর তাদের ও গর্তের মাঝে এক বিশাল দেয়াল সৃষ্টি হলো, যা অতিক্রম করে আর ঐ গর্তে পড়ার কোন সম্ভাবনাই রইলো না।

৫. আমরা এ রকম আরেকটি চিত্র দেখতে পাই, যে ব্যক্তি তার যাবতীয় কাজের ভিত্তি তাকওয়ার ওপর না রেখে অন্য কিছুর ওপর রেখেছে ঃ

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ

أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ط

যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহ্‌র ভয় ও সন্তুষ্টির ওপর, সে তার চেয়ে ভালো কাজ করেছে— যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গর্তের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম এবং তাকে নিয়ে তা জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়। (সূরা আত্-তাওবা ঃ ১০৯)

জাহান্নামে পতিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তের চিত্রটি এ আয়াতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ অর্থাৎ ঐ দালান তাকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হচ্ছে। এখানে দুনিয়ার জীবনকালকে এতো তুচ্ছ মনে করা হয়েছে যে, তার ইঙ্গিত পর্যন্ত করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। এখানে فَانْهَار শব্দে ف এর জায়গায় নেয়া যেতো, কিন্তু তা নেয়া হয়নি। কারণ যা ঘটতে সামান্য বিলম্ব আছে এমন কিছু বুঝানোর সময় ثُمَّ ব্যবহৃত হয় কিন্তু ف দিয়ে বুঝানো হচ্ছে, সে দালান পড়ন্ত অবস্থায় আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তা জাহান্নামের মধ্যে হারিয়ে যাবে। জাহান্নাম এবং পড়ন্ত দালানের মধ্যবর্তী দূরত্বটুকুই হচ্ছে দুনিয়ার জীবন যা ক্রমশ জাহান্নামের নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে।

মানবিক চিত্র

আল-কুরআন মানুষের মনোজাগতিক ছবি আঁকার সাথে সাথে মানবিক অবস্থার ছবিও তুলে ধরেছে। আমরা ইতোপূর্বে مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ প্রসঙ্গে (যারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে ...।) আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে নিচে আরো কিছু উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১. অনর্থক বিতর্ক ও অসার যুক্তি-প্রমাণকে খণ্ডন করে সঠিক দলিল-প্রমাণ তুলে ধরলেও যে কোন ফায়দা নেই তারই এক মনোজ্ঞ চিত্র অংকন করা হয়েছে নিচের আয়াত ক'টিতে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۙ لَقَالُوْآ اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ -

যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজা খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ করতে থাকে, তবু ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টি বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে, না হয় আমরা জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ - (الانعام : ٧)

যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের কাছে অবতীর্ণ করতাম, আর সেগুলো তারা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতো, তবু তারা বলতো ঃ এটি প্রকাশ্য জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আল-আনআ'ম ঃ৭)

২. এখানে যে বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা হচ্ছে— মানুষ তখনই তার প্রতিপালককে চেনে যখন সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়। যখন সুদিন আসে তখন ত্রাণকর্তাকে সে ভুলে বসে। এ কথাগুলোকে সাদাসিদাভাবে বর্ণনা না করে এক মনোজ্ঞ চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের মত পরিবর্তনের সময় তার

মধ্যে এমন এক মানুষের ছবি ভেসে উঠে, যা মানব সমাজে অধিকাংশ পাওয়া যায়।

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ
وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشّٰكِرِيْنَ - فَلَمَّا اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط

> তিনিই তোমাদেরকে জলে ও স্থলে ভ্রমণ করান। যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ কর আর তা লোকজনকে নিয়ে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে চলে, তারা আনন্দিত হয়। (হঠাৎ) নৌকা তীব্র বাতাসের কবলে পড়ে, আর চতুর্দিক থেকে আসতে থাকে ঢেউয়ের পর ঢেউ। তারা বুঝতে পারে, অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তখন আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে তার ইবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে। 'যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দাও তবে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।' অতপর যখন আল্লাহ্ তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অনাচারে লিপ্ত হয়। (সূরা ইউনুস ঃ ২২-২৩)

এভাবেই একে জীবন্ত ও চলমান এক ছবি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নৌকা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। একবার ওপরে আবার নীচে। মনে হচ্ছে নৌকা পানির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। আরোহীরা মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে এবং মৃত্যু ভয় তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। এমতাবস্থায় তারা প্রাণপণে আল্লাহ্কে স্মরণ করছে। আয়াতের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে মানুষ সম্মোহিত হয়ে পড়ে। পুরো ছবিটি জীবন্ত হয়ে তার সামনে নড়াচড়া করতে থাকে। আমরা বলতে পারি এ আয়াতটি পুরোপুরিভাবে তার বক্তব্য সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আমাদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছে।

৩. এমন এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যার বাহ্যিক দিক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মন ভুলানো। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক অত্যন্ত কুৎসিত ও বিপজ্জনক। দেখুন কতো সুন্দরভাবে সে চিত্র অংকিত হয়েছে।

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ج فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ لا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ط

যারা মুমিন তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং সেখানে জিহাদের উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, তুমি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত লোকদের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবে। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২০)

মৃত্যু মুহূর্তে মানুষের অবস্থা কেমন হয় তা কি কোন ছবির সাহায্যে বুঝানো সম্ভব? অথচ কতো সুন্দরভাবে উপরোক্ত আয়াতে এ চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। সেই সাথে তাদের লাঞ্ছিত মুখাবয়বের করুণ ছবিও ভেসে উঠেছে।

৪. অনেক সময় মানুষের এ মানবিক দিকটির চিত্র সাধারণ ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট ঘটনা অতিক্রম করে তা চিরন্তনী এক ছবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِیْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى م اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ط قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ط فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ -

মূসার পর তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি? যখন তারা তাদের নবীর কাছে বললো ঃ আমাদের জন্য একজন বাদশাহ মনোনীত করে দিন, যাতে (তাঁর নেতৃত্বে) আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, যুদ্ধের নির্দেশ এলে তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বললো, আমাদের এমন কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবো না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি

আমাদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্তুতি থেকে। অতপর যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন সামান্য ক'জন ছাড়া সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ্ জালিমদেরকে ভালো করেই চেনেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৬)

এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় বনী ইসরাঈল যখন বেশ আরাম-আয়েশে ছিল তখন তারা বাহাদুরীর মিথ্যা আস্ফালন প্রদর্শন করছিল। জিহাদের নির্দেশ আসা মাত্র তাদের বাহাদুরীর বেলুন চুপসে গেল এবং তাদের কাপুরুষতা প্রকাশ হয়ে ছিল। এটি এমন কোন ঘটনা যা একবারই ঘটে গেল। স্থান ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে এ ধরনের ঘটনার বার বার প্রদর্শনী হয়। এমন লোক মানব সমাজেই ছিল, আছে এবং থাকবে।

এতোক্ষণ আমি কেবল সেই উদাহরণগুলো বর্ণনা করলাম যেখানে মনোজাগতিক ও মানবিক অবস্থার ছবিই শুধু পেশ করা হয়নি বরং সেই ছবিগুলোকে জীবন্ত ও চলমান করে তুলে ধরা হয়েছে। এখন আমি এমন কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে চাই কুরআন যেখানে সংঘটিত ঘটনাবলী কিংবা প্রবাদ প্রবচন অথবা বিভিন্ন কিস্সা-কাহিনীর প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক ছবি এঁকেছে। উল্লেখ্য যে, সেগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা নেই বরং একটির সাথে আরেকটির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

সংঘটিত বিপর্যয়ের চিত্র

১. চিন্তা করে দেখুন, আহযাব যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের যে ছবি কুরআনে আঁকা হয়েছে, মনে হয় সমস্ত যুদ্ধের ময়দান চোখের সামনে। সেখানে যেসব তৎপরতা চলছিল তা জীবন্ত ও চলমান হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠে। অনুভব কল্পনার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এ ছবি দেখে ধারণা করা হয়, আমাদের সামনেই যেন সে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, তার কোন অংশই আমাদের দৃষ্টির বাইরে নেই। নিচের শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে আঁকা হয়েছে সেই ছবি।

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا - اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ
زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا
- هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا - وَاِذْ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا
غُرُوْرًا - وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ج
وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ط وَمَا هِيَ
بِعَوْرَةٍ ج اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا -

হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। যখন শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল, তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যা তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা করো আল্লাহ্ দেখেন। যখন তারা তোমাদের কাছাকাছি হচ্ছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে, (তা দেখে) তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল,

প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করা শুরু করেছিলে। সে সময় মুমিনগণ পরীক্ষিত হচ্ছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। তখন মুনাফিক ও যাদের মনে রোগ ছিল তারা বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একদল বললো, হে ইয়াসরিববাসী! এটি টিকবার মতো জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চলো। আরেকদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ আমাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত। মূলত তা অরক্ষিত ছিল না, পালানোই তাদের উদ্দেশ্য। (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৯-১৩)

চিন্তা করে দেখুন, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট এবং যুদ্ধের ময়দানের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ঘটনাবলীর কতো নিখুঁত এক চিত্র অংকিত হয়েছে। চোখের সামনে এ ছবি ভেসে বেড়ায়। শত্রুসৈন্য চতুর্দিকে ঘিরে ফেলেছে, মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে শুধু বিস্ফোরিত চাখে তাকিয়ে আছে। তাদের পা পর্যন্ত পিছলে পড়ার উপক্রম। এদিকে মুনাফিকরা বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াসে লিপ্ত। তারা বলতে লাগল, রাসূল তোমাদেরকে এতদিন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা মিথ্যের ফানুস মাত্র। তোমরা এদের মুকাবেলা করে ময়দানে টিকে থাকতে পারবে না। সময় থাকতে কেটে পড়ো। কেউ কেউ ঘরবাড়ি অরক্ষিত থাকার অভিযোগ উত্থাপন করে পালানোর সুযোগ খুঁজতে লাগল।

সত্যি কথা বলতে কি, যুদ্ধের ময়দানের এমন কোন দিক নেই যা এ চিত্রে তুলে ধরা হয়নি। পুরো ময়দানের দৃশ্য হুবহু চোখের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ছিল এক সত্যি ঘটনা, যা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তার কুরআনী চিত্র কাফিরদের পরাজয়ের সেই বিরল দৃশ্যে কমবেশি করতে পারে, তবু তা কালোত্তীর্ণ ও চিরন্তনী। যেখানেই দু' দলে সংঘর্ষ বাধে এবং এক পক্ষ পর্যুদস্ত হয় তখন সেই ছবি চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

২. উপরিউক্ত চিত্রের অনুরূপ আরেকটি চিত্র অংকিত হয়েছে নিচের ঘটনাটিতে। যা আগেরটির মতোই কালোত্তীর্ণ ও চিরন্তনী এবং একে পৃথক করে দেখার কোন সুযোগ রাখে না। চিন্তা করে দেখুন।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ

عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ج وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ج وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ - اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ
فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا ۢبِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَا
مَاۤ اَصَابَكُمْ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ - ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ لا وَطَآئِفَةٌ قَدْ
اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط
يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ط
يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ط يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ
الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ط

আর আল্লাহ্ সেই ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, সেখানে তোমাদের কার কাম্য ছিল দুনিয়া আর কার কাম্য ছিল আখিরাত। অতপর তোমাদেরকে তাদের ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। মূলত আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন, কেননা আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তোমরা ওপরে উঠে যাচ্ছিলে, পেছন দিকে কারো প্রতি ফিরেও তাকাওনি, অথচ রাসূল তোমাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিল। অতপর তোমাদের ওপর নেমে এলো শোকের ওপরে শোক, যেন তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না করো এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সে জন্য বিমর্ষ না হও। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কাজের ব্যাপারে পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। তারপর তোমাদের শোককে শান্তিতে পরিণত করে দিলেন যা ছিল তন্দ্রার মতো। সে তন্দ্রায় তোমাদের কেউ কেউ ঝিমুচ্ছিল আবার কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মতো। তারা বলছিল, আমাদের হাতে কি করার মতো কিছুই নেই ? তুমি

বল, সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে— তোমার কাছে প্রকাশ করে না— তাও। তারা বলে ঃ আমাদের হাতে যদি কিছু থাকতো তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫২-১৫৪)

এ আয়াতগুলো পড়ে আমার এ ধারণা হচ্ছে যে, সেই লোক এবং সময় সবকিছুই যেন আমি এখন চাক্ষুষ দর্শন করছি। যা যুদ্ধের ময়দানে ছিল। (এ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে উহুদ যুদ্ধের ময়দান থেকে— অনুবাদক)

রূপক ঘটনাবলীর চিত্র

১. বাগান মালিকদের কাহিনী

এখন আমি রূপক ঘটনাবলীর সেই ছবি নিয়ে উপস্থাপন করবো যা আল-কুরআনে আঁকা হয়েছে।

আমরা এখন বাগান মালিকদের সামনে দাঁড়িয়ে। সেই বাগান আখিরাতে নয় দুনিয়াতেই বিদ্যমান। বাগানের মালিকগণ রাতে কিছু চিন্তা-ভাবনা করছে। ফকীর-মিসকিনরা সেই বাগানের ফল খেত। কিন্তু বাগান মালিকগণ তাদেরকে বঞ্চিত করে শুধু নিজেরাই লাভবান হতে চাচ্ছে। এবার দেখা যাক পরিণতি কি হয়।

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ - وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ -

আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগান মালিকদের। যখন তারা শপথ করেছিল, বাগানের ফল সংগ্রহ করবে। কিন্তু 'ইনশাআল্লাহ' বললো না। (সূরা আল-কলম ঃ ১৭-১৮)

তারা রাতে সিদ্ধান্ত নিলো খুব ভোরে ফল সংগ্রহ করবে এবং সেখানে ফকীর-মিসকিনের কোন অংশ রাখবে না। এবার আমরা রাতের অন্ধকারে উঁকি দিয়ে দেখি সেখানে কী ঘটছে। শুধুই অন্ধকার। জীবন নাটক সেখানে স্তিমিত। রাতের আঁধারে হঠাৎ কিছু একটা নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তা আকার-আকৃতিহীন, কোন অশরীরী বস্তু।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ - فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ.

অতপর তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে বাগানে এক বিপর্যয় নেমে এলো, তখন তারা নিদ্রিত। সকাল পর্যন্ত তাদের সবকিছু ছিন্নভিন্ন খড়-কুটার মতো হয়ে গেলো। (সূরা আল কলম ঃ ১৯-২০)

এসব কিছুই তাদের অগোচরে ঘটলো। যখন সকাল হলো তখন একে-অপরকে ডেকে বললো ঃ চলো ফল সংগ্রহ করতে যাই। অথচ তারা জানতেও পারলো না, রাতের আঁধারে কি তাণ্ডব কাণ্ডই না ঘটে গেছে তাদের বাগানের ওপর দিয়ে।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ - اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ - فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ - اَنْ لَّايَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ -

সকালে তারা একে-অপরকে ডেকে বললো ঃ ফল সংগ্রহ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি বাগানে চলো। তারপর তারা ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগল। আজ যেন কোন মিসকিন বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (সূরা আল-কলম ঃ ২১-২৪)

এখন কিছু সময়ের জন্য দর্শকদের একটু চুপ থাকা উচিত। কেউ যেন না বলেন, কী ঘটে গেছে তাদের বাগানে। আবার কেউ কৌতুক অনুভব করে হা-হা করে হেসে ফেলাটাও ঠিক হবে না। দর্শকগণ একটু অপেক্ষা করে দেখুন তাদের জন্য কতো বড় ধোঁকা অপেক্ষা করছে। তারা ফিসফিস করে কথা বলছে, যেন কথা শুনে কোন মিসকিন খবর পেয়ে না যায়। দর্শকগণ! আর কতোক্ষণ আপনারা হাসি চেপে রাখবেন। এবার হাসুন। প্রাণ খুলে হাসুন। তাদের সাথে বড় কৌতুক হচ্ছে ঃ

وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ - القلم : ٢٥)

তারা (আনন্দের আতিশয্যে) লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল।

নিঃসন্দেহে তারা অপরকে বঞ্চিত করতে সক্ষম, কিন্তু নিজেদেরকে বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

হঠাৎ তারা বাগানের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলো। এ দৃশ্য দেখে দর্শকগণ ইচ্ছেমতো হাসতে পারেন।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ -

যখন তারা তাদের বাগান দেখল, তখন বলতে লাগল ঃ অবশ্যই আমরা আমাদের বাগানের রাস্তা ভুলে (অন্যত্র) চলে এসেছি।

বাগানের অবস্থা দেখে তারা বিশ্বাসই করতে পারল না, তারা বললো ঃ

এটাতো আমাদের সে বাগান নয়, যা ফলে ভরপুর ছিল। অবশ্যই আমরা রাস্তা ভুলে অন্যত্র চলে এসেছি।

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ –

না হয়, আমাদের কপাল পুড়েছে। (সূরা আল-কলম ঃ ২৭)

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ – قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ –

তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি বললো ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, এখনো তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন ? তারা বললো ঃ আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অবশ্যই আমরা জুলুম করেছিলাম। (সূরা আল-কলম ঃ ২৮-২৯)

কিন্তু সময় পার করে অনুশোচনা করায় কি লাভ ? এটি একটি রীতি, যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন নিজেরা পরস্পর বাগ-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় এবং একে-অপরকে দোষী করার প্রয়াস পায়। তেমনিভাবে তারাও শুরু করলো একাজ।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ – (القلم : ٣٠)

অতপর তারা একে-অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। (কলাম ঃ ৩০)

তার পর তারা সিদ্ধান্তে পৌছলো।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ – عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ –

তারা বললো ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের, আমরা ছিলাম সীমালংঘনকারী। সম্ভবত আমাদের পালনকর্তা এর পরিবর্তে (এর চেয়েও) উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রত্যাশা করি। (সূরা আল-কলম ঃ ২১-২২)

২. দু'টো বাগানের মালিকের কাহিনী

এবার আপনাদেরকে আরেকজন বাগান মালিকের কাহিনী শোনাব। তবে তার বাগান একটি নয়, দুটো। আর সেই বাগানও কোন অংশে কম ছিল না, যে

বাগানের কথা আপনারা শুনলেন। এ ঘটনার সাথে আরেক ব্যক্তি জড়িত। কিন্তু তার কোন বাগান নেই, আছে এমন একটি হৃদয় যা ঈমানের নূরে ঝলমলে। উভয়েই নিজেদের মনের কথা খুলে বলছিল। সেখানে দুটো বাগানের মালিককে ঐ ব্যক্তির প্রতীক বানানো হয়েছে, যে নিজের ধন-দৌলতের মোহে পড়ে অহংকারের বশবর্তী হয়ে ঐ শক্তিকেই ভুলে বসেছে যার হাতে তার জীবন, মৃত্যু এবং সমস্ত ধন-সম্পদ। এর কারণ হচ্ছে, বর্তমানে তার শান-শওকত ও ধন-দৌলত এবং শক্তি-সামর্থ প্রচুর। পক্ষান্তরে তার সাথী, যে সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাঁর কাছেই সাহায্য-সহযোগিতা চায়। এবং সর্বাবস্থায় কুফর ও বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকে।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ
وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ط كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ
اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ۷ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا –

তুমি তাদেরকে দু' ব্যক্তির কাহিনী শুনিয়ে দাও। আমি তাদের একজনকে দুটো আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং তা খেজুর গাছ দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। আর দু' বাগানের মাঝে ছিল শস্যক্ষেত। উভয় বাগানই ছিল ফলবান। তাতে কিছুমাত্র কমতি ছিল না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে ছিল প্রবাহিত নহর। (সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ৩২-৩৩)

এ আয়াত থেকে দুটো বাগানের দৃশ্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে, যা ছিল সুজলা-সুফলা ও সবুজ-শ্যামল। এটি প্রথম দৃশ্য। দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ

وَكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ج فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ
مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا –

সে ফল সংগ্রহ করলো। অতপর কথা প্রসঙ্গে (একদিন) সাথীকে বললো ঃ আমার মনে হয় না, এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করি না, কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি কখনো প্রতিপালকের নিকট আমাকে পৌছে দেয়া হয় তবে সেখানে এর চেয়ে আর উৎকৃষ্ট বস্তু পাব।
(সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ৩৪)

তাদের কথোপকথনে বুঝা যায়, তখন তারা উভয়েই সেই বাগানের দিকে যাচ্ছিল এবং গল্প করছিল। বাগানের কাছাকাছি পৌছে গেল। কারণ তার পরই বলা হয়েছে ঃ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ج قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا – وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً لا وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا –

নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো ঃ আমার মনে হয় না, এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করি না, কিয়ামত সংঘটিত হবে। যদি কখনো প্রতিপালকের নিকট আমাকে পৌছে দেয়া হয় তবে সেখানে এর চেয়ে আরো উৎকৃষ্ট বস্তু পাব।

(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৩৫-৩৬)

আমরা দেখতে পাই, ঐ ব্যক্তি অহংকার ও দাম্ভিকতার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। ভেবে দেখুন, গরীব সঙ্গীটির ওপর তার কথাবার্তার কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল ? তার কাছে তো বাগান ছিল না এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও ছিল না। এমনকি দু'জন লোক তার পক্ষে লাঠি ধরবে তাও ছিল না। একথা ঠিক, তার আর কিছু না থাকলেও ঈমানের মতো সম্পদ ছিল। যার কারণে সে নিজেকে ছোট মনে করতো না। প্রতিপালকের সম্মান ও মর্যাদার কথা কখন ভুলেনি। তাই বাগান মালিক সাথীটিকে সে স্মরণ করিয়ে দিলো, চিন্তা করে দেখ তুমি কতো নিকৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি। কাজেই গর্ব করা তোমার সাজে না।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلًا ط لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا – وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللّٰهُ لا لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ج اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا – فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا – اَوْيُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا –

তার সঙ্গী তাকে বললো ঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতপর বীর্য থেকে, তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে

মানবাকৃতিতে ? কিন্তু আমিতো একথাই বলি, আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা, তাঁর সাথে শরীক আর কাউকে আমি পালনকর্তা মানি না। যদি তুমি আমাকে ধনে ও জনে তোমার চেয়ে কম মনে করো, তবে বাগানে প্রবেশ করার সময় কেন বললে না ঃ মা-শা-আল্লাহ্, লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ্ যা চান তাই হয়, আল্লাহ্র শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই)। আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উত্তম বস্তু দান করবেন এবং তোমার বাগানের ওপর আসমান থেকে আগুন পাঠাবেন, ফলে সকালে তা পরিষ্কার মাঠ হয়ে যাবে। অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে, কিন্তু তুমি তার সন্ধান পাবে না। (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৩৮-৪১)

এখানে সাথীদ্বয়ের দৃশ্য শেষ। এক সাথী মোরগের মতো গর্দান উঁচু করে আস্ফালন করছে। বাগ-বাগিচার গর্বে তার পা যেন আর মাটিতেই পড়তে চায় না। অপর পক্ষে আরেক সাথী মু'মিন, ঈমানকেই সে বড় দৌলত মনে করে। সাথীকে নসীহত করে বললো ঃ এতো নিয়ামত ভোগ করে তার কী করা উচিত। মনে হয় তার সাথী সেই কথায় কোন কান দেয়নি। সাথীর অহমিকা দেখে অন্য সাথীর রেগে যাওয়া, এটিই স্বাভাবিক। এক পর্যায়ে মনের দুঃখে বদ দো'আও করে ফেলল এবং রাগের সাথেই একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেল। এবার দেখব তারপর কি হলো ? ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ
خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا -

অতপর তার সমস্ত ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আপেক্ষ করতে লাগল। বাগানটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল ঃ হায়! আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (সূরা আল-কাহাফ ঃ ৪২)

সত্যি কথা বলতে কি, ঐ মুমিন ব্যক্তির দো'আকে আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছিল। আমরা দেখলাম, ঐ মু'মিন ব্যক্তির সাথীটির দুরাবস্থা ও তার অনুতাপ। বাগান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আফসোস বা অনুতাপে কী আসে যায়? সে একথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলো, কেন অন্যকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করলো। আসুন দুঃখ ও ইস্তিগফারের এ দৃশ্য শেষ করি। যবনিকা পতন এবং দৃশ্যের সমাপন।

প্রকৃত ঘটনাবলীর চিত্র

এতোক্ষণ আমরা রূপক ঘটনাবলীর চিত্র উপস্থাপন করলাম। এবার আমরা কয়েকটি প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) ঃ আমরা এখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী চিত্র পেশ করবো। যখন তিনি পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে নিয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করছিল। মনে হয় এ ঘটনা শত শত বছর আগের নয়, এখনই আমরা বাপ-বেটার কা'বা ঘর নির্মাণ এবং তাদের দো'আ প্রত্যক্ষ করছি।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, (তখন তারা দো'আ করলো) ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ খেদমত কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করুন। আমাদেরকে হজ্জের রীতি-নীতি বলে দিন এবং আমাদেরকে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। হে প্রতিপালক! আমাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠান, যে তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে। তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।

দো'আ শেষ, দৃশ্যের যবনিকাপাত।

খবর থেকে দো'আর দিকে প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত আশ্চর্যজনক পরিবর্তন। প্রকৃতপক্ষে এ পরিবর্তনই গোটা দৃশ্যটিকে জীবন্ত করে তুলেছে এবং চোখের সামনে এনে হাজির করেছে। খবর হচ্ছে ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط

যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল আল্লাহ্‌র ঘরের ভিত্তিকে উঁচু করছিল।

এ খবরের পরিণতিতে পর্দা উঠে যায়। মঞ্চ অর্থাৎ খানায়ে কা'বা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠেন। পিতা-পুত্র দু'জনই দীর্ঘ দো'আয় মশগুল।

এখানে শৈল্পিক সৌন্দর্য এবং অলৌকিকত্বের যে দিক তা হচ্ছে ঘটনা বর্ণনা শুরু করেই দো'আয় পরিবর্তন করে দেয়া। এখানে এমন একটি শব্দও নেই যা থেকে বুঝা যায়, পিতা-পুত্র নির্মাণ কাজ ক্ষণিকের জন্য বাদ দিয়ে এ দো'আ করেছিল। যদি ধরে নেয়া হয়, ঘটনা এখনো চলমান। শেষ হয়নি। তাহলে এর অলৌকিকত্ব আরো বেড়ে যায়। যদি এভাবে শুরু করা হতো ঃ "যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের দেয়াল গাঁথছিল তখন এ দো'আ করছিল।" তাহলে এ ধরনের কথায় কোন চমক থাকত না। সেটি গতানুগতিক একটি ঘটনা হিসেবে দাঁড়াত। কিন্তু যে স্টাইলে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা শুধুমাত্র ঘটনা নয়। তা জীবন্ত ও চলমান একটি দৃশ্য, মনে হয় আজও মঞ্চে তা প্রদর্শিত হচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্যও মঞ্চ শূন্য নয়। পুরো দৃশ্যটি চলমান হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। ছবিতে যে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করা হয়েছে তা শুধুমাত্র একটি শব্দ ['তারা দো'আ করলো'- يَدْعُوْنَ] পরিকল্পিতভাবে বাদ দেয়ায় সম্ভব হয়েছে। আল-কুরআনের বিশেষত্বই এখানে।

২. হযরত নূহ (আ)-এর প্লাবন ঃ এখন আমরা হযরত নূহ (আ)-এর প্লাবনের চিত্র তুলে ধরবো। যেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ -

আর নৌকাখানি তাদেরকে বহন করে নিয়ে চললো পর্বতসম তরঙ্গমালার মাঝে। (সূরা হুদ ঃ ৪২)

এ বিপজ্জনক মুহূর্তে হযরত নূহ (আ)-এর পিতৃত্ব জেগে উঠায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত। কারণ পুত্র এখন সবকিছুকে অস্বীকার করছে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কাফিরদের সাথে পুত্রও সলীল সমাধি লাভ করবে। নূহ (আ) মানবিক

দুর্বলতায় পড়ে গেলেন। নূহ (আ)-এর ভেতরের মানুষটি নবীর ওপর প্রাধান্য পেল। তখন অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করে পুত্রকে ডাকলেন।

وَنَادٰى نُوحُ ۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ -

আর নূহ তাঁর ছেলেকে ডাক দিলেন, সে দূরে সরে ছিল। তিনি বললেন ঃ বেটা! আমাদের সাথে উঠে এসো, কাফিরদের সাথে থেকো না।

(সূরা হুদ ঃ ৪২)

কিন্তু পিতার শত অনুনয়-বিনয়কে বেয়াড়া পুত্র কোন পরওয়াই করলো না। সে যৌবন ও শক্তি-সামর্থের গর্বে স্ফীত হয়ে উঠলো।

قَالَ سَاٰوِىْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ -

সে বললো ঃ আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেবো, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। (সূরা হূদ ঃ ৪৩)

পিতা ব্যাকুলচিত্তে সর্বশেষ আহ্বান করলেন ঃ

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ (هود : ٤٣)

নূহ বললো ঃ আজ আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। (সূরা হূদ ঃ ৪৩)

এরপর একটি তরঙ্গ এসে সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ - (هود : ٤٣)

এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হয়ে গেল। (সূরা হূদ ঃ ৪৩)

কতো বড় মর্মান্তিক দৃশ্য! ভয়ে শ্রোতাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে নৌকা চলছে। হযরত নূহ (আ) পেরেশান হয়ে পুত্রকে আহ্বান করছেন। কিন্তু পুত্র শক্তি-সামর্থের বাহাদুরী দেখিয়ে সে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করছে। এ কথাবার্তা চলা অবস্থায় হঠাৎ এক তরঙ্গ এসে সবকিছুকে তছনছ করে দিলো। এ দৃশ্য অবলোকন করে মানুষের ভেতর সেই অবস্থা সৃষ্টি হয়, যে অবস্থা বাপ-বেটা অর্থাৎ নূহ (আ) ও তাঁর সন্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু মানুষ কেন অন্য প্রাণীকেও প্রভাবিত এবং বেদনাপ্লুত না করে ছাড়ে না।

কিয়ামতের চিত্র

এখন আমরা প্রথমে কিয়ামতের দৃশ্যাবলী বর্ণনা করবো তারপর কুরআনে কারীমে শান্তি ও শাস্তির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করবো। কারণ, 'শৈল্পিক চিত্রের' সাথে এগুলোর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

১. কিয়ামতের চিত্র অংকন করতে গিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ - خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ - مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ط يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ -

যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে। তখন তারা অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে, যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফিররা বলবে ঃ এটি কঠিন দিন।
(সূরা আ-ক্বামার ঃ ৬-৮)

এটি কিয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্যে একটি দৃশ্য। সংক্ষিপ্ত বটে কিন্তু হৃদয়কে নাড়া দেয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। পঙ্গপালের উপমায় কতো চমৎকারভাবে চিত্রটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। পঙ্গপাল যখন উড়ে তখন বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো মনে হয়। তদ্রূপ মানুষ যখন কবর থেকে উঠে আহ্বানকারীর দিকে ছুটবে তখন তারা দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে থাকবে। মনে হবে কোন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারবে না, কোথায় যাচ্ছে বা কেন যাচ্ছে। তাদেরকে অপসন্দনীয় এক বিষয়ের দিকে ডাকা হবে। তাদের চোখ অবনমিত হবে। এ হচ্ছে সর্বশেষ আলামত। যার মাধ্যমে চিত্রটি পূর্ণতায় পৌঁছে যায়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে কাফিররা বলবে এটিতো বড় কঠিন দিন। ছোট ছোট বাক্যে কতো সুন্দর করে পুরো ছবিটিকে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রোতার হৃদয়পটে ভেসে উঠে একটি বিশাল মাঠ, মনে হয় সবাই কবর থেকে উঠে

একযোগে দৌড়াচ্ছে। সকলের মাথা নিচু। চেহারা ভয়ে বিহ্বল। এ যেন এক জীবন্ত ও চলমান ছবি।

২. এটি হচ্ছে কিয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় দৃশ্য। এ দৃশ্যে মানুষের পালানোর কথাও আছে এবং ভীত-বিহ্বল অবস্থার কথাও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটি পূর্বের দৃশ্যের চেয়েও করুণ ও ভয়াবহ।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ -

জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে কখনো বেখবর মনে করো না। তাদেরকে তো ঐদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চোখ ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। (মানুষ) ঊর্ধ্বশ্বাসে ভীত-বিহ্বল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে (হাশরের মাঠের দিকে)। দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না, ভয়ে অন্তর উড়ে যাবে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪২-৪৩)

এখানে চারটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। যা একের পর এক সংঘটিত হবে। একই ঘটনার চারটি দৃশ্য যা পালাক্রমে প্রদর্শিত হচ্ছে। ভয়, লজ্জা ও লাঞ্ছনায় অবনত মস্তক। তার ওপর দুশ্চিন্তা ও ভয়ের ছায়া দুর্ভাবনায় মন-প্রাণ ছেয়ে যায়। এ ছবিটি জীবিতদেরকে দেখানো হচ্ছে, আবার যাদের ছবি দেখানো হচ্ছে তারাও মানুষ। ছবির লোকজন এবং দর্শক-শ্রোতা উভয়ের মাঝেই জাতিগত এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ের অনুভূতি পর্যন্ত এক ও অভিন্ন। মনে হয় একদলের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আরেক দলে সঞ্চালন হয়ে তাদের মন-মস্তিষ্ক ছেয়ে যায়। পাঠক মনে করে এ অবস্থা স্বয়ং তার ওপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে।

৩. অতপর ভয় ও আতংকের আরেকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ চিত্রটি পূর্বের চেয়ে আরো ভয়ংকর। শব্দগুলো যেন সেই ভয়াবহ অবস্থায় পুরোপুরি বর্ণনা দিতে পারছে না। আমরা এ বিভীষিকাময় চিত্রটি তুলে ধরলাম, যেন এটি নিজের অবস্থার নিজেই প্রকাশ করতে পারে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ

حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ -

হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তনদানকারিণী দুধ পানরত সন্তান রেখে পালিয়ে যাবে। ভয়ে গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটে যাবে। লোকদেরকে তুমি মাতালের মতো দেখতে পাবে কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ্র আযাব এতোদূর ভয়াবহ হবে। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ১-২)

এ বিভীষিকা মানুষকে এমন হতবিহ্বল করে তুলবে যে, স্তনদানরত মা তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানকেও ভুলে যাবে। গর্ভবতী সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে কিন্তু তাকে লক্ষ্য করার মতো কেউ থাকবে না। ছুটোছুটি করবে বটে কিন্তু ছুটোছুটির সেই অনুভূতিও তার থাকবে না। ফলে ভয়ে ও আতংকে তার গর্ভপাত ঘটে যাবে। মানুষ ছুটোছুটি শুরু করবে বটে কিন্তু মনে হবে তাদের পা জমিনে লেগে গেছে। মানুষ সবকিছু সংঘটিত হতে দেখবে কিন্তু এতো দ্রুত তা সংঘটিত হবে, মানুষ কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না। জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে। দেখলে মনে হবে তারা মাতাল। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না, কর্তব্য কর্মকে স্থির করতে না পেরে তারা এরূপ আচরণ করবে। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র শাস্তির সামান্যতম প্রভাব মাত্র। মনে হবে মানুষ এসব নিজের সামনে সংঘটিত হতে দেখছে। চিন্তাশক্তিও তাকে ধারণ করতে চায় কিন্তু ভয়ঙ্কর বিভীষিকা তাকে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এজন্য মনোজগতে তা স্থায়ীভাবে সমাসীন হতে পারে না।

৪. ইতোপূর্বে কিয়ামতের তিনটি বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যার ছবি (জীবন্ত হয়ে) চোখের সামনে ভেসে উঠে। কিন্তু এমন কিছু দৃশ্য আছে, যা শুধু অনুভূতিকে নাড়া দেয় মাত্র ঃ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ - (عبس ٣٧)

সেদিন প্রত্যেকেরই এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا -

প্রাণের বন্ধু আরেক প্রাণের বন্ধুকেও সেদিন জিজ্ঞেস করবে না।

দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী চিত্র এর চেয়ে আর কী হতে পারে ? অন্তরে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা ছাড়া আর কিছুর স্থান নেই। দুর্ভাবনা তা হৃদয়-মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, সে অন্য কিছু চিন্তা করার অবকাশও পায় না।

৫. কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবার আরেকটি দৃশ্য। কিছুটা বিস্তৃত এসব দৃশ্য। তবু প্রতিটি দৃশ্যের মাঝে সামান্য বিরতি পরিলক্ষিত হয়।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ - فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ -

তারা কেবলমাত্র একটি ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাক-বিতণ্ডাকালে। তখন তারা ওসিয়ত করতেও সক্ষম হবে না এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।

(সূরা ইয়াসীন ঃ ৪৯-৫০)

এখানে প্রথম ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। প্রথম শব্দেই শুরু হয়ে যাবে বিপর্যয়। এতো দ্রুত সংঘঠিত হবে যে, ওসিয়ত পর্যন্ত করার সময় পাবে না। কবরবাসী কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। তারপর কি হবে ? ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ - قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ -

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, অমনি তারা কবর থেকে উঠে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটতে থাকবে। তারা বলবে, হায় আফসোস! কে আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিলো ? রহমান আল্লাহ্ তো এরই ওয়াদা করেছিল এবং রাসূলগণ সত্য বলেছেন। (ইয়াসীন ঃ ৫১-৫২)

এখানে দ্বিতীয় ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। প্রথম ফুঁকে তো সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁকের পর সবাই হয়রান-পেরেশান হয়ে কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। আশ্চর্য হয়ে (ঈমানদারগণ) বলাবলি করবে, কে আমাদেরকে এমন সুখনিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিলো ? তারপর পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে নিজেরাই

সিদ্ধান্ত নিয়ে বলবে ঃ প্রভু দয়াময় যে ওয়াদা আমাদের নিকট করেছিল এবং নবী-রাসূলগণ যে সংবাদ আমাদেরকে প্রদান করেছিল আজ তা সত্য হলো।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ - فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

এটি তো হবে এক মহানিনাদ। সেই মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন কারো প্রতি জুলুম করা হবে না বরং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। (ইয়াসীন ঃ ৫৩-৫৪)

এটি সর্বশেষ ফুঁক, যেন মানুষ আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড়িয়ে যায়। সেদিন আমল অনুযায়ী মানুষ সেখানে জমায়েত হবে। এ দৃশ্য আপাতত এখানে শেষ।

এখন যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে সে-ই এসব চিত্র প্রত্যক্ষ করবে। মনে হবে তাকেই যেন লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে ঃ 'সেদিন কারো প্রতি জুলুম করা হবে না, শুধু তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে।'

৬. কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত লোক একত্রিত হবে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কৈফিয়ত দিতে থাকবে তখন আমরা এমন একটি দল দেখতে পাই যারা পৃথিবীতে পরস্পর প্রতিবেশী ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল না। অহংকার ও দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। সে তার প্রতিবেশীকে গুমরাহ বলতো, তাদের মধ্যে অনেকে মু'মিনদেরকে কষ্ট দিত। মু'মিনগণ যখন জান্নাতী হবার দাবি করতো তখন তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করা হতো। সেদিন যখন তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। তখন একদল প্রবেশের সাথে সাথে আরেক দলের খবর তাদেরকে দেয়া হবে।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ

এইতো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৫৯)

প্রতি উত্তরে বলা হবে ঃ

لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ط إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ -

তাদের জন্য কোন অভিনন্দন নেই, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৫৯)

যাকে গালি দিত সে শুনে কি চুপ থাকবে ? নিশ্চয় নয়। সে তখন বলবে ঃ

قَالُوا بَلْ اَنْتُمْ لَامَرْحَبًا بِكُمْ ط اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ج فَبِئْسَ الْقَرَارُ –

তারা বলবে, তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। এটি কতোই না ঘৃণ্য আবাসস্থল।
(সূরা ছোয়াদ ঃ ৬০)

তারপর সম্মিলিত কণ্ঠে বলে উঠবে ঃ

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ –

তারা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, আপনি তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৬১)

তারপর কি ঘটবে? তারা ঈমানদারদেরকে সেখানে দেখতে পাবে না, যাদেরকে পৃথিবীতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো এবং নিজেদের গায়ের জ্বালা ঝাড়ত। তারা আজ তাদের সাথে জাহান্নামে নেই এ কেমন কথা ?

وَقَالُوا مَالَنَا لَانَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ – اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ – اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ –

এবং তারা বলবে ঃ আমাদের কি হলো, যাদেরকে আমরা খারাপ মনে করতাম তাদেরকে তো দেখছি না! আমরা কি শুধু শুধুই তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র মনে করতাম, না আমাদের চোখ ভুল দেখছে ? এ ব্যাপারে জাহান্নামীদের বাক-বিতণ্ডা অবশ্যাম্ভাবী। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৬২-৬৪)

জাহান্নামীদের ঝগড়া-বিবাদ আমাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত হয়, যেন আমরা প্রত্যেকে তা প্রত্যক্ষ করছি। প্রতিটি মানুষই মনে করে, স্বয়ং তার চিত্রটিকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে সে ঐ দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। আর এ চেষ্টার ফলে উক্ত দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়াও হয়তো সম্ভব।

শান্তি ও শাস্তির দৃশ্যাবলী

বিগত আলোচনায় আমরা কবর, কিয়ামত, পুনরুত্থান এবং হাশরের দৃশ্যাবলী অবলোকন করেছি। এবার আমরা জান্নাত ও জাহান্নামের শান্তি ও শাস্তির কিছু দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবো।

১. জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ
اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا بَلٰى
وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ - قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ -

কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের দ্বাররক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে নবী-রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করতো এবং সতর্ক করতো এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ? তারা বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। তারপর বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, চিরদিনের জন্য। অহংকারীদের জন্য কতো নিকৃষ্ট স্থান।

জান্নাতীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا
وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ - وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۤءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ -

যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, চিরদিনের জন্য এ জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে সেখানে অবস্থান করবো। (দেখো) মেহনতকারীদের পুরষ্কার কতোই না চমৎকার। (সূরা আয-যুমার ঃ ৭৩-৭৪)

নিচের আয়াতটির মাধ্যমে এ দৃশ্যের যবনিকা টানা হয়েছে ঃ

وَتَرَى الْمَلٰۤئِكَةَ حَاۤفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখবে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে। বলা হবে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র।

এ চিত্রগুলো এতো সুস্পষ্ট যে, এর পৃথক কোন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। এবার আসুন, আমরা জাহান্নাম ও জান্নাতীদের পিছু পিছু গিয়ে তাদের কিছু হাল-অবস্থা জেনে নেই।

২. জাহান্নামীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ - طَعَامُ الْاَثِيْمِ - كَالْمُهْلِ ج يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ - كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ - خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ - ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ - ذُقْ لا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ - اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ -

নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ হবে পাপীদের খাদ্য। তা গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে, যেমন পানি ফুটে। (বলা হবে) একে ধরো এবং টেনে

জাহান্নামে নিয়ে যাও এবং তার মাথার ওপর ফুটন্ত গরম পানির আযাব ঢেলে দাও। (আরও বলা হবে) স্বাদ গ্রহণ করো, তুমিতো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। এ ব্যাপারেতো তোমরা সন্দেহে ছিলে।

সাথে সাথে জান্নাতীদের কথা বলা হয়েছে এভাবে ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامٍ أَمِيْنٍ - فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ - يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ - كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ - يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ - لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلٰى ج وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ -

নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে ঝর্ণা ও বাগানসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমী বস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে। আর আমি তাদেরকে সুনয়না হুরদের সাথে বিয়ে দেব। সেখানে তারা শান্তমনে বিভিন্ন ফলমূল চেয়ে পাঠাবে। সেখানে তারা কোন মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হবে। (সূরা আদ-দোখান ঃ ৫১-৫৬)

৩. আমরা কিয়ামতের দৃশ্যাবলী এমন এক জায়গায় শেষ করেছি যেখানে বিপরীতধর্মী দুটো চিত্র ছিল। এখানেও তেমনি ধরনের আরও কয়েকটি চিত্র ঃ

وَنَادٰى أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ أَصْحٰبَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ط قَالُوْا نَعَمْ ج فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ - الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ج وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ -

জান্নাতীগণ জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিল, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সঠিক পেয়েছ ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ। অতপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে ঃ আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত জালিমদের ওপর যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিতো এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের ব্যাপারেও অবিশ্বাসী ছিল।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ - وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -

উভয়ের মাঝে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ'রাফের ওপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তাদের চিহ্ন দেখে চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের ওপর পতিত হবে তখন তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে জালিমদের সাথী করো না।

(সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৪৬-৪৭)

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ - أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ - وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ - (الاعراف : ٤٨ - ٥٠)

আ'রাফবাসী যাদেরকে তাদের চিহ্ন দেখে চিনবে তাদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজেই এলো না। এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। (বলা হবে) জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ আমাদের নিকট সামান্য খাদ্য'ও পানীয় নিক্ষেপ করো অথবা আল্লাহ্ যে রিয্ক দিয়েছেন তা থেকেই কিছু দাও। জান্নাতীগণ উত্তর দেবে ঃ এগুলো কাফিরদের জন্য আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন।

ওপরের উদ্ধৃতিগুলোতে বেশ কিছু দৃশ্য এসেছে, যা একের পর এক আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে।

আয়াতগুলো পড়ে মনে হয় আমরা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সামনে দাঁড়ানো। জান্নাতীগণ জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করে বলছে ঃ আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা আমাদের করেছিল আমরা তা সত্য পেয়েছি। আর তোমাদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছিল তা কি তোমরা সঠিকভাবে পেয়েছ ? এ প্রশ্নের মাধ্যমে জাহান্নামীদের সাথে যে উপহাস করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারা তা অস্বীকার করতে পারবে না; বরং স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এমন সময় ঘোষক উভয় দলের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেবে, জালিমদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

তারপর আমরা আ'রাফবাসীদের সামনে গিয়ে দেখতে পাই তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। একটি উঁচু দেয়ালের ওপর কিছু লোকের সমাবেশ। যেখান থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম দুটোই দেখা যায়। জান্নাতীদের দেখা মাত্র তারা সালাম ও সম্বর্ধনা দিচ্ছে আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের ওপর গিয়ে পড়ছে সাথে সাথে তারা তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করছে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলছে ঃ তোমরা তো জান্নাতীদের ব্যাপারে পৃথিবীতে কসম করে বলতে, তাদের ওপরে আল্লাহ্‌র মেহেরবানী হবে না। আজ দেখতো তারা কোথায় ? জান্নাতে কতো শান-শওকত ও সম্মান-মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করছে।

তারপর আমরা দেখতে পাই জাহান্নামীদের কাছে খাদ্য ও পানীয়ের জন্য আবদার করছে। জান্নাতীদের সামনে আল্লাহ্ সমস্ত নিয়ামত উপস্থিত রেখেছেন কিন্তু তারা একথা বলেই তাদেরকে বিদায় করে দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় এ উভয়টি হারাম করে দিয়েছেন।

এ হচ্ছে কিয়ামতের দৃশ্য, জান্নাত ও জাহান্নামের শান্তি ও শাস্তির দৃশ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে— পাঠকগণ যখন এ আয়াতগুলো পড়েন তখন কি তারা এ ঘটনাগুলোকে ভবিষ্যতে ঘটবে বলে মনে করেন ? না একথা মনে করেন যে, ঘটনাগুলো এ মুহূর্তে এবং আমার চোখের সামনেই ঘটে চলেছে ?

আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখনই এ আয়াতগুলো পড়েছি, তখনই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছি যে, এ ঘটনাগুলো কুরআনী বিষয়ের আবরণে আমি দেখতে পাচ্ছি। বরং আমার মনে হয়েছে, আমি আমার নিজের চোখে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হতে দেখছি, যে ছবি কল্পনার নয়—

চাক্ষুস। সত্যি কথা বলতে কি, এটি আল-কুরআনের অলৌকিক এক কৌশল এবং শিল্প নৈপুণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ আলোচনা এখানে শেষ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আল-কুরআন যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, তার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এমনও আছে যা বাহ্যত চিত্রায়নের সূত্র থেকে ব্যতিক্রম মনে হয়। তা হচ্ছে কুরআন যুক্তি-তর্কের সাহায্যে দ্বীনের দিকে লোকদেরকে আহ্বান করে।

তা আল-কুরআনের প্রকৃতি এবং চিত্রায়নের সূত্রের চেয়ে ভিন্নতর। সত্যি কথা বলতে কি, সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চিত্রায়নের উপকরণ বাদ দিয়ে জ্ঞানগত উপকরণ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌছুতেও আল-কুরআন চিত্রায়নের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ থেকে বুঝা যায় চিত্রায়নের পদ্ধতি কুরআনের অন্যান্য পদ্ধতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এ অধ্যায়ে আমি সে প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে চাই। সংক্ষেপে উদাহরণসহ আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্। বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থের শেষ দিকে ভিন্ন এক অধ্যায়ে পেয়ে যাবেন।

৪. প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে স্থির ও চিরন্তনী দৃশ্য হচ্ছে সর্বদা প্রকাশমান আকাশ। মানুষকে আকাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল-কুরআনে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, দেখ, এটি আল্লাহ্র কুদরতের এক শক্তিশালী প্রমাণ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُه فِى السَّمَاءِ
كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُه كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِه ج فَاِذَا
اَصَابَ بِه مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ - وَاِنْ كَانُوْا مِنْ
قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِه لَمُبْلِسِيْنَ - فَانْظُرْ اِلٰى اٰثٰرِ
رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ
الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

তিনি আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। তারপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। অতপর তুমি তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে তা পৌছে দেন, তখন তারা

আনন্দিত হয়। তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এ বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিরাশ ছিল। অতএব, আল্লাহ্র রহমতের ফল দেখে নাও; কিভাবে তিনি মৃত জমিনকে জীবিত করেন। অবশ্যই তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং প্রতিটি বস্তুর ওপরই তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(সূরা আর-রূম ঃ ৪৮-৫০)

লক্ষ্য করে দেখুন, কিভাবে আল্লাহ্র কুদরত কাজ করছে। বাতাস প্রবাহিত হওয়া, তারপর সেই বাতাস কর্তৃক জলীয় বাষ্পকে ধারণ করা, অতপর তা মেঘমালায় রূপান্তর হওয়া এবং সর্বশেষে মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। আর তা সাধারণ মানুষের খুশির কারণ হওয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত-শুষ্ক জমিনকে জীবিত ও তরতাজা করা। এসব দৃশ্য যখন একের পর এক মানসপটে ভেসে উঠে তখন মানুষের অবচেতন মন প্রভাবিত না হয়েই পারে না। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌছে যে—

اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

নিশ্চয়ই তিনি মৃতকে জীবিতকারী এবং প্রতিটি বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।

৫. ৪ নং দৃশ্যের পরিধি ছিল ব্যাপক কিন্তু ৫ নং দৃশ্যটি জমিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। দুটো দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। চিন্তা করে দেখুন—

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ - (الزمر : ٢١)

তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং সেই পানি জমিনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেন, তারপর সেই পানি দিয়ে রঙ-বেরঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতপর তা শুকিয়ে যায়, যা তোমরা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ্ সেগুলো খড়কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (যুমার ঃ ২১)

এটি জমিনের এক চিত্র। এ চিত্রে জমিনের বিভিন্ন অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি অবস্থা মানুষকে চোখে দেখার চিন্তা করার সুযোগ করে দেয়। দেখুন আসমান থেকে বৃষ্টি হয়। সে বৃষ্টিতে জমিন রঙ-বেরঙের ফল-ফসলে ভরে যায়। আবার সে ফসল পেকে বাদামী রঙ ধারণ করে। এক সময় সেগুলো

খড়কুটোয় পরিণত হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়। এ আয়াতে ثُمَّ (ছুম্মা) শব্দটি যেভাবে ও যে জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে তাতে চোখ ও মনকে চিন্তা-ভাবনার পূর্ণ সুযোগ করে দেয়, দ্বিতীয় অবস্থা চোখের সামনে উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বেই। কোন দৃশ্যকে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরতে যে ধরনের বিন্যাস ও উপস্থাপনার প্রয়োজন, তা এখানে বিদ্যমান। (সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে— ইনশাআল্লাহ্)

৬. কিছু ছবি তো সম্পূর্ণ জীবন্ত। দেখুন— পাখী পা গুটিয়ে শুধু ডানায় ভর করে আকশে উড়ে বেড়ায়। আবার অবতরণের মুহূর্তে পায়ে ভর করে দাঁড়ায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ -

তারা কি তাদের মাথার ওপর পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী উড়ন্ত পাখীদেরকে লক্ষ্য করে না ? রহমান আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সবকিছুর ওপরই দৃষ্টি রাখেন। (সূরা আল-মুলক ঃ ১৯)

এ আয়াতে দুটো দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমত পাখী আকাশে ডানা মেলে উড়ে এবং উড়ার সময় সে তার পা গুটিয়ে রাখে। দ্বিতীয়ত, অবতরণের মুহূর্তে সে পায়ে ভর করে দাঁড়ানোর জন্য আগেই পা দুটো বের করে নেয়। এ চিত্র মানুষ হর-হামেশাই দেখে থাকে কিন্তু কখনো এ বিষয়ে তারা মাথা ঘামায় না। আল-কুরআন মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র এক কুদরতি নিদর্শন।

৭. জমিনে বারবার আরেকটি দৃশ্যের অবতারণা হয় কিন্তু মানুষ চোখ মেলে তা দেখে না এবং এ ব্যাপারে সে দেখার প্রয়োজন অনুভব করে না। যদি এর রহস্য নিয়ে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করতো তবে রহস্যের নতুন দিগন্ত তার সামনে উন্মোচিত হতো, এটি হচ্ছে শরীরী বস্তুর ছায়া. যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্থির মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্মভাবে তা চলমান। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَرَا اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ج وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ج ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا - ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا -

তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিস্তৃত

করেন? তিনি ইচ্ছে করলে একে স্থির রাখতে পারেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৪৫-৪৬)

উল্লেখিত আয়াত দুটো মানুষের চিন্তার জগতে দোলা দেয়। মন ও মানসকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীতে এ ধরনের দৃশ্যের অভাব নেই, যা প্রতিমুহূর্তে আমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়। কিন্তু যখন তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন তা এক নতুন বস্তু হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন কোন দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করা হয় চোখ, মন ও মস্তিষ্ক দিয়ে একযোগে।

৮. পৃথিবীতে এমন বহু জিনিস আছে যাকে শিক্ষামূলক মনে করা হয়। কিন্তু মানুষের অনুভূতিকে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় তা হচ্ছে কোন জাতির ধ্বংসাবশেষ। চোখ তা বাহ্যিকভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং মনের চোখ তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তাই আল-কুরআন অপরাধীদের পরিণতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব ফেলার জন্য তাদেরকে এ দুর্বল দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ -

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল, তারা জমি চাষ করতো এবং তাদের চেয়ে বেশি ফসল ফলাত। তাদের কাছে রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (আর-রূম ঃ ৯)

উপরোক্ত আলোচনা একথাই প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন চিত্রায়ণ ও দৃশ্যায়ন পদ্ধতিকে একটি স্টাইল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এজন্য চিত্রায়ণ পদ্ধতিটি মূল ভিত্তির গুরুত্ব রাখে। এ পদ্ধতিটি সার্বিক বিষয় ও উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি কুরআনের এমন এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা কুরআন বিশেষজ্ঞগণ আল-কুরআনের ছত্রে ছত্রে তা পেয়ে থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কল্পনা ও রূপায়ণ

আমরা বলছি দৃশ্যায়ণ ও চিত্রায়ণের মাধ্যমে নিজস্ব স্টাইলে আল-কুরআন তার বক্তব্য পেশ করেছে। যা আল-কুরআনের বর্ণনা রীতির মূল বা ভত্তি স্বরূপ। তাই বলে একথার অর্থ এই নয় যে, দীর্ঘ বিষয়স্তুর গুরুত্ব শেষ হয়ে গেছে, আর আমরা তার পুরোপুরি হক আদায় করে ফেলেছি। বরং বিষয়বস্তুর গুরুত্ব স্বাতন্ত্রভাবে আজও পুরোপুরি বিদ্যমান। সে কথা সামনে রেখেও পৃথক অধ্যায় রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রশ্ন হতে পারে, এ চিত্রগুলো কোন্ ভিত্তির ওপর স্থাপিত ? বিগত অধ্যায়ের শুরুতে আমরা এ প্রসঙ্গে আভাস দিয়েছি। আমরা সেখানে বলেছি, কোন কোন সময় চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থাৎ কল্পিত বিষয়কে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়ে পরিণত করা। তেমনিভাবে মানুষের স্বরূপ এবং প্রকৃতিকেও বোধগম্য চিত্রে উপস্থাপন করা হয়। অনেক সময় অনুভবের বিষয়কে কল্পিত চিত্রে প্রকাশ করা হয়। তারপর সেই চিত্রকে গতিশীল করার জন্য তার মধ্যে জৈবিক তৎপরতা সৃষ্টি করা হয়। ফলে তা চিন্তার জগৎকে আলোড়িত করে তোলে। তখন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু এক জীবন্ত চলমান ছবি হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠে। চাই তা কোন দুর্ঘটনার ছবি হোক, কিংবা কোন সাধারণ বা ঘটনামূলক ছবিই হোক। জীবন ও গতির সাথে সাথে যদি তাকে বাকশক্তি দেয়া হয়, তবে সেখানে কল্পনার সমস্ত উপাদানই জমা হয়ে যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। বিগত আলোচনায় আমি যে সমস্ত উদাহরণ ও উপমা পেশ করেছি সেগুলো আমার এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও সেই অধ্যায়ে ঐগুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল, বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আল-কুরআন কিভাবে চিত্রায়ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে সেই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু এ অধ্যায় শুধুমাত্র বিগত উপমার উদ্ধৃতিকে আমরা যথেষ্ট মনে করবো না। তার কারণ আল-কুরআন আমাদের কাছে বিদ্যমান। যা নতুন নতুন উদাহরণ ও উপমায় পরিপূর্ণ। আমরা সেখান থেকে এমন কিছু উপমা নির্বাচন করবো যা নির্দিষ্ট বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে নির্দেশ করবে এবং তা হবে কল্পনা ও অনুভবের রূপায়ণের নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত।

তাখঈল বা কল্পনা

কুরআনী চিত্রের মধ্যে এমন চিত্র কমই আছে যা নিরব ও নির্বাক অবস্থায় আমাদের সামনে আসে। অধিকাংশ ছবিতেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উদ্দীপনা পাওয়া যায়। এ উদ্দীপনাই জীবনের স্পন্দন জাগায় এবং তা হয়ে উঠে চলমান। মনে রাখতে হবে, চিন্তাকে আলোড়িত করার ব্যাপারটি শুধুমাত্র কিছু দুর্ঘটনা বা কিয়ামতের দৃশ্য অথবা শান্তি ও শাস্তির দৃশ্যাবলীর মধ্যেই নয় বরং তা এমন জায়গায়ও আছে যেখানে তার আশাও করা যায় না।

আমরা বলতে চাই, এই আলোড়নের ধরন ও প্রকৃতি কী। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের জীবন স্পন্দনের কারণেই প্রকাশ্য বস্তুসমূহকে জীবন্ত মনে হয়। মানুষের কাছে যে জীবন অদৃশ্য তাও এ উদ্দীপনার বাইরে নয়। এ উদ্দীপনাকে আমরা 'তাখঈলে হাস্‌সী' বা কল্পিত অনুভূতি বলে অভিহিত করবো। আল-কুরআনের প্রতিটি চিত্রের মধ্যেই এ উদ্দীপনা বিদ্যমান। জীবনের এ স্পন্দন প্রতিটি চিত্রের মধ্যেই এমনভাবে উপস্থিত, যেভাবে জীবনের বিভিন্ন ধারা ও প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়।

তাজসীম বা রূপায়ণ

আল-কুরআনে চিত্রায়ণের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় পাওয়া যায়, যা রূপায়ণ বা তাজসীম-এর ভিত্তি বলে গণ্য করা যায়। এ বিষয়ে কুরআন অগ্রসর হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গেছে। এমনকি যেসব বিষয় তার মূল ধারা থেকে পৃথক রাখা প্রয়োজন ইসলাম তাকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। অনেক সময় সেগুলোকেও দৈহিক আকারে উপস্থাপন করা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী)। এ থেকে অকাট্যভাবে যে কথাটি আমাদের সামনে চলে আসে তা হচ্ছে— রূপায়ণের স্টাইলকে আল-কুরআন অন্যান্য পদ্ধতির ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে হুশিয়ার করেও দেয়া হয়েছে যে, রূপায়ণের পদ্ধতি অনেক সময় বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনে। এখন আমি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।

ব্যক্তিরূপে প্রকাশ ঃ ১. কল্পনার একটি প্রকার এমন যাকে আমরা তাশখীস বা ব্যক্তিরূপে প্রকাশ বলতে পারি। তাশখীস বলতে বুঝায়, যে বস্তু জীবন থেকে মুক্ত তাকে জীবন দেয়া। যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা অন্য কোন জড়বস্তুকে জীবন্ত বোধগম্য আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়। অনেক সময় সেই জীবনকে

উন্নত করে মানুষের মতো বানিয়ে দেয়া হয়। তার মধ্যে বাহ্যিক উপকরণ ও অনুভূতি পর্যন্ত শামিল থাকে। প্রাণহীন বস্তুকে মানবিক আগ্রহ, উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্য প্রদান করা হয়। যার বদৌলতে তা মানুষের কাছে আসে এবং তাদের সাথে লেনদেনও করে। তাদের সামনে আবির্ভূত হয় বিভিন্ন রঙ ও পোশাকে। ফলে মানুষ তাকে জীবিত মনে করতে বাধ্য হয়। মনে হয় যেন সে নিজের চোখে তা দেখেছে এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুভব করছে। তার সূক্ষ্মানুভূতি ও তৎপরতা দেখে মানুষ ভীত বিহ্বলও হয়ে পড়ে। যেমন— একটি আয়াতে সকাল বেলাকে জীবন্ত মনে করে শ্বাস গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ —সকাল বেলার শপথ যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে। (আত-তাকভীর ঃ ১৮)

এ আয়াত পাঠ করলে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, 'সকাল বেলা' এর সময়টা জীবন্ত কোন বস্তু, কারণ সে শ্বাস গ্রহণ করে। এমনকি শ্বাস গ্রহণের সময় তার দাঁতগুলোও যেন দৃষ্টিগোচর হয়। এ জীবন শুধু 'সকালের' নয় বরং সকল বিশ্ব ও প্রকৃতির বলে মনে হয়। যেমন বলা হয়েছে, রাত দিনকে ধরার জন্য খুব জোরে তার পেছনে দৌড়াচ্ছে কিন্তু তাকে ধরতে পারছে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا -

তিনি পরিয়ে দেন রাতের ওপর দিনকে। এমতাবস্থায় দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৫৪)

রাত ও দিনের পরস্পর দৌড়ানোর যেমন শেষ নেই তেমনিভাবে মানুষের চিন্তাশক্তিও এদের পেছনে সমানভাবে দৌড়াচ্ছে। আবার দেখুন, রাতের চলাচলের কথা বলা হয়েছে।

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -

এবং শপথ রাতের যখন তা যেতে থাকে। (সূরা আল-ফজর ঃ ৪)

আয়াতটি পাঠ করা মাত্র পাঠকের চোখে ভেসে উঠে পৃথিবীর সীমাহীন পথে রাত নামক বস্তুটি শুধুমাত্র ভ্রমণ করেই যাচ্ছে। অতি পরিচিত এক চিত্র। আবার দেখুন, জমিন ও আসমানকে বুদ্ধিমান মনে করে তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং সাথে সাথে তারা জবাবও দিচ্ছে ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ -

তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ; অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো ঃ আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।

পাঠক কল্পনার চোখে দেখুন, আসমান ও পৃথিবীকে ডাকা হচ্ছে। তারা সে ডাকে সাড়াও দিচ্ছে। দেখুন চন্দ্র, সূর্য, রাত ও দিন নিজস্ব পথে ও নিজস্ব গতিতে চলমান। কিন্তু—

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط

সূর্য নাগাল পায় না চাঁদের এবং রাত আগে চলে না দিনের।

(সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০)

রাত এবং দিনের এ পরিভ্রমণ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেন কখনো কেবল রাত আবার কখনো কেবল দিন একটানা হতে না পারে। জমিনের দিকে দেখুন। মৃত জমিন। সেখানে বৃষ্টির পানি পড়ে। আর অমনি তা নবজীবন লাভ করে জেগে উঠে।

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ -

তুমি জমিনকে পতিত ও বিরাণ দেখতে পাও, তারপর আমি যখন সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে উঠে এবং সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ط

তাঁর আরেক নিদর্শন এই যে, তুমি জমিনকে দেখবে বিরাণ— অনুর্বর পড়ে আছে। যখন আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। (সূরা হা মীম আস-সাজদা ঃ ৩৯)

এভাবে মৃত-বিরাণ জমিন দেখতে না দেখতেই নবজীবন লাভ করে।

জাহান্নামের দৃশ্য ঃ এ হচ্ছে জাহান্নাম। কেমন জাহান্নাম ? ধ্বংসাত্মক ও

মহাযন্ত্রণাদায়ক বস্তু, যা থেকে কেউ বেঁচে বের হতে পারে না। যেখানে কোন নড়াচড়া পর্যন্ত করা যাবে না, যাদেরকে পৃথিবীতে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করা হতো কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এখন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকামাত্র এসে হাজির হবে। এটি ঐ জাহান্নাম যে অপরাধীদেরকে দেখে রাগে ফেটে পড়বে এবং ভীষণভাবে তর্জন-গর্জন করতে থাকবে। নিচের আয়াত ক'টি থেকে সে চিত্রের কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে ঃ

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ -

সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছো ? সে উত্তর দেবে আরো আছে কি ? (সূরা ক্বাফ ঃ ৩০)

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا -

জাহান্নাম যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা তার গর্জন ও হুংকার শুনতে পাবে। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ১২)

اِذَآ اُلْقُوا فِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ - تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ -

যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার ক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম ফেটে পড়বে। (সূরা আল মুল্ক ঃ ৭-৮)

كَلَّا ط اِنَّهَا لَظٰى - نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى - تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى - وَجَمَعَ فَاَوْعٰى -

কখনো নয়। নিশ্চয়ই এটি লেলিহান আগুন। যা চামড়া ঝলসে দেয়। তা সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ ছিল। ধন-সম্পদ জমা করে তা আগলে রেখেছিল।

অপরাধীরা যে ছায়ায় আশ্রয়ের জন্য আসবে তার অবস্থা হচ্ছে ঃ

وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ - لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ -

ধূয়ার কুণ্ডুলীর ছায়া, যা শীতলও নয় এবং আরামদায়কও নয়।
(সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৪৩-৪৪)

সেই ছায়ায় জাহান্নামীদের দম বন্ধ হয়ে আসবে এবং তারা দিশেহারা হয়ে যাবে। সে ছায়া তাদের জন্য শীত কিংবা আরামদায়ক হবে না। এমনকি তা দেখতেও সুন্দর দেখাবে না।

আর দেখুন, বৃষ্টির পানি ভর্তি বায়ুর চলাচল ঃ

وَاَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً -

আমি পানি ভরা বাতাস পরিচালনা করি এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি। (সূরা আল-হিজর ঃ ২২)

বাতাসকে لَوَاقِحَ (বৃষ্টি দ্বারা গর্ভবতী) বলে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করা হয়েছে। মনে হয় পানির দ্বারা বাতাস গর্ভবতী হয় এবং বৃষ্টি বর্ষণ করে তা গর্ভমুক্ত হয়।

আবার বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ -

যখন মূসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখ্‌তীগুলো তুলে নিলেন।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ -

অতপর যখন ইবরাহীমের আতংক দূর হলো এবং সুসংবাদ এসে গেল, তখন সে আমার সাথে তর্ক শুরু করলো কওমে লূত সম্পর্কে।

দেখুন, উপরোক্ত আয়াত দুটোতে الغَضَبُ (রাগ)-কে তীব্র আকার ধারণ ও কমে যাওয়া এবং الرَّوع (ভয়)-এর বিদূরিত হওয়া, আর البُشرى (সুসংবাদ) এর যাওয়া আসা করার কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এগুলো জীবিত কোন বস্তু। যার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়।

২. তাখঈল বা কল্পনার আরেকটির ধরন হচ্ছে, চলমান ছবি হয়ে সামনে উপস্থিত হওয়া। যার মাধ্যমে কোন অবস্থা বা কোন একটি অর্থকে বুঝানো হয়। যেমন— ঐ ব্যক্তির চিত্র, যে প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। অবস্থা ভাল দেখলে সে পরিতৃপ্ত হয় আর যদি কোন পরীক্ষায় নিমজ্জিত হয় তবে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। অথবা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের চিত্র, যারা আগুনের এক গর্তের কিনারে অবস্থান করছিল। অথবা ঐ ব্যক্তির উদাহরণ— যে তার ঘরের ভিত্তি এমন গর্তের কিনারে স্থাপন করে যা

অট্টালিকাসহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে। এগুলো এমন সব চিত্র যা প্রাণ চঞ্চলতায় ভরপুর। শেষ চিত্রটিতো পূর্ণতার শীর্ষে পৌছে গেছে। যে সম্পর্কে আমি 'শৈল্পিক চিত্র' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

হৃষ্টপুষ্ট এক উট সূচের ছিদ্র পথে প্রবেশের চেষ্টারত চিত্রটি তাখঈলের আরেকটি উদাহরণ। যা কাফিরদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা কোন অবস্থাতেই ক্ষমা পাবে না এবং জান্নাতেও যেতে পারবে না। এমন আজাব চলমান উদাহরণে চিন্তাশক্তি হতবাক হয়ে যায়। কারণ, চিন্তা যতোক্ষণ তার অনুগত থাকবে ততোক্ষণ এর গতি পূর্ণ হতে পারে না এবং তা শরীরী অবস্থায় আসার পরও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا -

বলো, আমার পালনকর্তার কথা লিখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা লিখা শেষ হওয়ার আগেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদি তার সাথে আরেকটি সমুদ্রের পানি যোগ করা হয়— তাও।
(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ১০৯)

এ আয়াত পাঠে সদা চলমান যে ছবিটি চিন্তার জগতকে আচ্ছন্ন করে রাখে তা হচ্ছে— সমুদ্রের পানি দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা লিখা হচ্ছে কিন্তু তা শেষ হচ্ছে না। শেষ করা যাবে না। এ এক গতিশীল বিরামহীন চিত্র। সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্র প্রশংসা লিখে শেষ করা যাচ্ছে না। এভাবেই এ গতিশীলতা পূর্ণতায় পৌছে যায়।

নিচের আয়াতগুলো থেকে মানসপটে যে ছবিটি ফুটে উঠে তাও উপরোক্ত চিত্রের সাথে মিলে যায়।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ -

তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে কৃতকার্য। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৫)

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ -

এরূপ আয়ুপ্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।
(সূরা বাকারাহ ঃ ৯৬)

এ আয়াতে زَخْرَجه শব্দ থেকেই গতিশীলতা অনুভূত হয় যা কল্পনায় চলমান ছবি হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমরা আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারবো।

এ গতিশীলতা থেকে কল্পনার চোখে ভেসে উঠে, কোন ব্যক্তি আগুনের গর্তের কিনারে দাঁড়ানো। আর তার লেলিহান শিখা সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

৩. তাখঈল বা কল্পনার আরেকটি ধরন হচ্ছে— যা কল্পনায় গতির সৃষ্টি হয়। কতিপয় শব্দের মাধ্যমে তা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়। যেমন—

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا –

আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবো, অতপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলোকণায় পরিণত করে দেব। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ২৩)

আমরা ইতোপূর্বে 'শৈল্পিক চিত্র' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, আমলকে ধুলোকণায় পরিণত করার অর্থ তাদের কৃতকর্মকে নষ্ট করে দেয়া। এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি চিত্র। এখন আমরা কাদিমনা قَدِمْنَا শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচ করবো। এ শব্দটি বুঝানো হয়েছে, তাদের সৎকর্মসমূহ ধ্বংস করে দেয়ার পূর্বে সামনে উপস্থিত করা হবে। যদি বাক্য থেকে কাদিমনা শব্দটি বিলুপ্ত করা হয় তবে চিন্তার সূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়। সাথে সাথে সমস্ত সৌন্দর্য (যা ঐ শব্দটির সাথে জড়িত) তাও আর অবশিষ্ট থাকে না যদিও ধুলোকণার নড়াচড়া তখনো অব্যাহত থাকে। নিচের আয়াতটিও একটি সুন্দর উদাহরণ।

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا –

বল, আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন কিছুকে আহ্বান করবো, যা আমাদের কোন কল্যাণ করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না।. আমরা কি পেছন দিকে ফিরে যাব? (সূরা আল-আনআম ঃ ৭১)

এ আয়াতে نُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا বাক্যাংশ দিয়ে দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া যা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু তাকে ইন্দ্রিয়ানুভূত অবস্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। পরবর্তী আয়াতটিও এ রকম একটি উদাহরণ ঃ

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ –

আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬৮)

উদ্দেশ্য ছিল— 'তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো না' একথা বলা। কিন্তু لَاتَتَّبِعُوا (অনুসরণ করো না) এবং خُطُوٰتِ (পদাংক) শব্দ দুটো দিয়ে শয়তানের চলাচলের ছবি আঁকা হয়েছে। মনে হচ্ছে শয়তান আগে আগে চলছে এবং মানুষ (যারা তার অনুসারী) তার পিছে পিছে পায়ের দাগ অনুসরণ করে চলছে। অদ্ভুদ একটি ছবি। শয়তান এমন এক অশুভ শক্তি যে মানব পিতা আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে বের করার ব্যবস্থা করেছিল। তবু মানুষ এখনও তার অনুসরণ করে।

এ রকম আরেকটি আয়াত ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ –

তুমি তাদেরকে শুনিয়ে দাও, সেই লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। (সূরা আরাফ ঃ ১৭৫)

এ আয়াত এবং তার আগের আয়াতের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। এ আয়াতে শয়তানকে গুমরাহ ব্যক্তির পেছনে নেয়া হয়েছে। আগের আয়াতে শয়তানের পেছনে চলা নিষেধ করা হয়েছে, আর এখানে খোদ শয়তানই পিছে লেগেছে।

নিচের আয়াতটিও এ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে ঃ

وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ –

(হে বান্দা) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে লেগে যেও না। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩৬)

এখানে জ্ঞানকে দেহ বিশিষ্ট বস্তু কল্পনা করা হয়েছে।

৪. কল্পনার আরেকটি ধরন হচ্ছে, তা দ্রুত এবং একের পর এক দৃশ্যমান

হয়। আমরা ইতোপূর্বে এ ধরনের উদাহরণ পেশ করেছি। অর্থাৎ মুশরিকদের তৎপরতা, যাদের সম্পর্কে নিচের আয়াতে বলা হয়েছে।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْتَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ۔

যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করলো, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো। (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

নিচের আয়াতটিতেও একটি সাদৃশ্যতা আছে ঃ

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ -

যে ধারণা করে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্ কখনো তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন না, সে যেন একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নেয়, তারপর তা কেটে দেয় এবং দেখে তার এ কৌশল তার আক্রোশকে দূর করতে পারে কিনা ? (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ১৫)

এ আয়াতে আশ্চর্য এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ কুধারণা পোষাণ করে যে, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন না। সে শুধু শুধু মনকে ব্যাথা ভারাক্রান্ত করে তুলে। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে পারে না অথবা আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার মানসিকতা রাখে না, তার উচিত অবস্থাকে পরিবর্তন করে কাংখিত মানে নিয়ে যাওয়া। আসলে আসমানে রশি লাগিয়ে তাতে আরোহণ করা যেমন অসম্ভব। অবস্থার পরিবর্তন করাও তার জন্য তেমন অসম্ভব। যদি আসমানে রশি লাগিয়ে তাতে আরোহণের চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়ে রশিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে তবু কি তার রাগ প্রশমন হবে ? রশি ছেঁড়া এবং জমিনে পড়ার পর হয়তো তা নিয়ে কিছুটা চিন্তা করার সুযোগ থাকে।

পরবর্তী আয়াতটিতেও এ ধরনের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে ঃ

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ -

আর যদি তাদের অবজ্ঞা তোমার নিকট কষ্টদায়ক হয়, তবে জমিনে কোন সুরঙ্গ খুঁজে বের করো কিংবা আকাশে কোন সিঁড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদেরকে কোন নিদর্শন এনে দিতে পার তবে তা নিয়ে এসো।

(সূরা আল-আন'আম ঃ ৩৫)

রাসূলে আকরাম (সা)-এর আহ্বানের প্রতি কাফিরদের অবজ্ঞা প্রদর্শন তাঁর কাছে বড় অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। তিনি চাইতেন যদি যুৎসই কোন মু'জিযা এনে তাদেরকে দেখাতে পারতেন তবে হয়তো তারা ঈমান এনে সোজা পথে চলতো। এ আয়াত স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য তাঁর মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত শালীন ও মার্জিত ভাষায় এবং সূক্ষ্ম রসিকতার সাথে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এটি কল্পিত চিত্রের উৎকৃষ্ট এক নমুনা, যেখানে শৈল্পিক সৌন্দর্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

৫. কল্পনার আরেকটি স্টাইল হচ্ছে— জড় বস্তুকে গতিশীল হিসেবে পেশ করা।

وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا

বার্ধক্যে মাথা সাদা হয়ে গিয়েছে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৪)

এ আয়াতে সাদা চুলকে জ্বলন্ত আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সাদা চুলকে কল্পনায় এমন পর্যায়ে পৌঁছান হয়েছে, যেভাবে শুষ্ক খড়কুটা আগুনের হল্কায় জ্বলে উঠে। এ কারণেই আয়াতটিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

রূপায়ণ ঃ আগের অধ্যায়ে আমরা রূপায়ণের বেশ কিছু উদাহরণ বর্ণনা করেছি। উপমেয় বাক্য এজন্যই ব্যবহৃত হয় যাতে তার অন্তর্নিহিত অবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট অবয়বে পরিবর্তন করা যায়। এটি তাজসীম বা রূপায়ণের সাথেও সংশ্লিষ্ট। নিচে আমরা তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করলাম।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ -

যারা তাদের পালনকর্তার সত্তায় বিশ্বাস করে না তাদের কর্মসমূহ যেন ছাইভস্ম, যার ওপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধুলোঝড়ের দিন।
(সূরা ইবরাহীম ঃ ১৮)

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى ۙ كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সেই ব্যক্তির মতো, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তার দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো, যার ওপর কিছু মাটি পড়েছিল। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৪)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ -

যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাঁর সন্তুটি অর্জনের জন্য এবং নিজের **মনকে দৃঢ়** করার জন্য স্বীয় সম্পদ দান করে তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো। (সূরা আল-বাকারা ঃ **২৬৫**)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ - تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ - وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ -

তুমি কি লক্ষ্য করো না, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন ঃ পবিত্র কথা হচ্ছে পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শেকড় মজবুত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল প্রদান করে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা

করতে পারে এবং নোংরা কথার উদাহরণ হচ্ছে নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির ওপর থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই।

(সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৬)

মনে রাখতে হবে, আমাদের মতে শুধু বোধগম্য কোন বস্তুর সাথে তুলনা করার নামই রূপায়ণ নয়। কেননা এতো সাধারণ কথা, ইন্দ্রিয়াতীত কোন বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়ের সাথেই তুলনা দেয়া হয়। আমাদের কাছে রূপায়ণের অর্থ হচ্ছে— ইন্দ্রিয়াতীত কোন বিষয়কে শুধু তুলনা ও উপমার সাহায্যে মূর্তমান না করে বরং ঘটনার মাধ্যমেই দেহাবয়ব গঠন ও মূর্তমান করে তোলা। যেমন ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا -

সেদিন প্রত্যেকেই চোখের সামনে দেখতে পাবে সে যা ভাল করেছে তা এবং যা মন্দ করেছে তাও। তখন তারা কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকতো। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩০)

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا -

তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার রব্ব কারো প্রতি জুলুম করবেন না। (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৪৯)

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ -

তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে ভাল কর্ম পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে পাবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১১০)

ওপরের উদাহরণগুলো থেকে বুঝা যায়— আমল একটি অদৃশ্য ও আকার-আকৃতিহীন বস্তু। কিন্তু একে সেদিন বোধগম্য আকার-আকৃতিতে পেশ করা হবে। এর-ই নাম রূপায়ণ বা তাজসীম। মনে হয় আমল কোন মানুষের অবয়বে সেদিন তার কাছে এসে হাজির হবে। সেই সাথে একথাও বুঝা যায় পৃথিবীতে আমল করলে তা আল্লাহ্র নিকট আমানত থাকে এবং কিয়ামতের দিন তা অবয়ব দান করে বান্দাদের ফেরত দেয়া হবে।

গুনাহ্কে সেদিন এক বিরাট আকৃতির বোঝাতে রূপান্ত করা হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْ زَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ -

সেদিন তারা নিজেদের গুনাহ্‌র বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে।
(সূরা আন'আম ঃ ৩১)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

সেদিন কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। (সূরা আন'আম ঃ ১৬৪)

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়কে মূর্তমান করে প্রকাশ করা হয়েছে নিচের আয়াতগুলোতেও। যেমন ঃ

وَتَزَوَّدُوْ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى -

আর তোমরা পাথেয় সাথে নিও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৭)

এ আয়াতে তাকওয়াকে পাথেয় বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً -

আমরা আল্লাহ্‌র রঙ ধারণ করেছি। আল্লাহ্‌র রঙের চেয়ে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে? (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৩৮)

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে রঙ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً -

হে ঈমানদারগণ! ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করো।

এ আয়াতে প্রবেশ করা যায় এমন আকৃতিতে ইসলামকে পেশ করা হয়েছে।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ -

তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গুনাহ্‌সমূহ পরিত্যাগ করো। (আ'আম ঃ ১২০)

এ আয়াতে গুনাহ্‌কে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্নতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

রূপক অর্থে ব্যবহৃত আরো কিছু উদাহরণ ঃ

১. মনের সংকীর্ণতা, দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা-বিমর্ষতা ইত্যাদি বিমূর্ত ও অতীন্দ্রিয় বস্তু, কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলোতে একে মূর্তমান করে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ -

আর অপর তিনজন যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল, আর তারা বুঝতে পারল, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১১৮)

বলা হয়েছে— পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। এ সংকীর্ণতাকে জমিনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সংকীর্ণতা ও বিমর্ষতা এক বিমূর্ত ও অতীন্দ্রিয় বস্তু কিন্তু এ আয়াতে তাকে মূর্তমান করে দেখানো হয়েছে। যেসব সাহাবা নবী করীম (স)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তাদের অবস্থাকে মূর্তমান করে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁরা পেছনে থেকে যাওয়ায় এতো লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং এতো বিপর্যস্ত ছিলেন যে, তাদের কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। সামান্য সময়ের জন্যও তারা একটু স্বস্তিবোধ করেননি, যতোক্ষণ তাদের তওবা আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত না হয়েছে।

এমনি ধরনের আরেকটি আয়াত ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ط مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ -

তুমি তাদেরকে আসন্ন দ্বীন সম্পর্কে সতর্ক করো, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপীদের জন্য কোন বন্ধু এবং সুপারিশকারী নেই, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (সূরা মু'মিন ঃ ১৮)

এ আয়াত থেকে মনে হয় কাঠিন্যের কারণে প্রাণ আসল জায়গা থেকে স্থানান্তর হয়ে কণ্ঠের কাছে চলে আসবে।

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ - وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ -

অতপর যদি কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক।
(সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৮৩-৮৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় রূহ একটি শরীরি বস্তু, যা নড়াচড়া করে গলা পর্যন্ত পৌছে যায়।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْجَاۤءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ -

কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয়, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক।

(সূরা আন্-নিসা ঃ ৯০)

অর্থাৎ এই পেরেশানী ও অনিশ্চয়তার কারণে তারা সংকটে পড়ে যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তারা তোমার সাথে মিলে স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, না স্বজাতির সাথে মিলেমিশে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৩. কুরআন কাফিরদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থানসমূহের বর্ণনা তুলে ধরতে চায়। কাফিররা কুরআন তো অবশ্যই শোনে কিন্তু এ থেকে তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না। মনে হয় তারা শুনেইনি। কুরআন সেই ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপারটিকে এমনভাবে তুলে ধরেছে মনে হয় কাফির ও কুরআনের মাঝে এমন এক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা তাদেরকে কুরআনের পথে আসতে দেয় না। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো ঃ

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ -

তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

(সূরা আল-শু'আরা ঃ ২২)

وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا -

আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছি যেন তারা একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। (সূরা আন'আম ঃ ২৫)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا -

তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না, তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ?

(সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৪)

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ - وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ -

আমি তাদের ঘাড়ে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, তাই তারা দেখে না।

(সূরা ইয়াসীন ঃ ৮-৯)

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ -

আল্লাহ্ তাদের অন্তর ও কানগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখগুলো পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ৭)

اَلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا -

আমার স্মরণ থেকে যাদের চোখে আবরণ পড়ে গেছে, তারা শুনতে সক্ষম নয়। (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ১০১)

কাফিররা যে ইন্দ্রিয়াতীত বাধার কারণে আল-কুরআনের পথে আসতে পারেনি তা মূর্তমান হয়ে আমাদের সামনে এসেছে। মনে হয় তা এক সুদৃশ্য দেয়াল। এভাবেই প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টিকারী বর্ণনার স্টাইল অবলম্বন করা হয়েছে।

৪. অনেক সময় কোন জিনিসের বর্ণনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঢংয়ে করা হয়েছে কিন্তু তার বর্ণনা পদ্ধতি এমন যে, প্রথম সম্বোধনেই তার মধ্যে বলিষ্ঠতা ও পরিপুষ্টতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করে নেবে মাথার ওপর এবং পায়ের নিচ থেকে। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৫৫)

অর্থাৎ আযাব তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। চতুর্দিক না বলে 'ওপর-নিচ' বলার কারণ হচ্ছে— এটি 'চতুর্দিক' শব্দের চেয়ে প্রভাব সৃষ্টিতে অধিক কার্যকর।

اِذْجَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ -

যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, উচ্চভূমি এবং নিম্নভূমি থেকে। (সূরা আল-আহযাব ঃ ১০)

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করতো তবে তারা ওপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে খেতে পারতো। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৬৬)

كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا -

তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। (সূরা ইউনুস ঃ ২৭)

মনে হয় কাফিরদের মুখমণ্ডল যে কালো রঙ ধারণ করবে তা কোন রঙের প্রলেপ নয়; বরং কালো আঁধার রাতের টুকরো, যা দিয়ে তাদের চেহারাকে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

৫. তাজসীম বা রূপায়ণের আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে— অতীন্দ্রিয় বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করা। যেমন এ আয়াতে আযাব বা শাস্তিকে غليظ (শক্ত)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতে দিনকে ثقيل (ভারী) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

وَمِنْ وَّرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ -

তাদের পশ্চাতেও রয়েছে কঠিন আযাব। (সূরা ইবরাহীম ঃ ১৭)

وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا -

এরা ভারী দিনকে পেছনে ফেলে রাখে। (সূরা আদ্-দাহর ঃ ২৭)

প্রথম আয়াতে আযাবকে এমন এক বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে, যা লম্বা, চওড়া ও মোটা বলে অভিহিত করা যায়। অন্য কথায় কঠিন শব্দটি বস্তুর সাথেই প্রয়োগ করা হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে দিনকে সময় বলে না বুঝিয়ে ঘনো মোটা ওজনদার বস্তু বলে বুঝানো হয়েছে।

৬. অতীন্দ্রিয় বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে এমন কিছু উদাহরণ ঃ

مَاجَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهِ -

আল্লাহ্ কোন মানুষের পেটে দুটো অন্তর রাখেননি। (সূরা আহ্যাব ঃ ৪)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا -

তোমরা ঐ মহিলার মতো হয়ো না, যে পরিশ্রম করে সূতো কেটে তারপর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। (সূরা আন-নাহল ঃ ৯২)

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا -

কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১২)

প্রথম আয়াতে বুঝানো হয়েছে, পরস্পর বিপরীতধর্মী কোন বস্তুকে একই অন্তরে জায়গা দেয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় আয়াতে বুঝানো হয়েছে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা ঐ রকম নিষ্ফল কাজ যেমন এক বুড়ি নিজে সূতো কেটে তারপর তা নষ্ট করে ফেলে। তৃতীয় আয়াতে গীবতের ওপর ঘৃণা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছে। বলা হয়েছে গীবতকারী তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। কারণ যে উপস্থিত নেই তাকে মৃতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কাজেই যার অনুপস্থিতিতে তার দোষ আলোচনা করা হলো— এ যেন দোষ আলোচনা নয় বরং খুবলে খুবলে তার গোশ্‌ত খাওয়া।

৭. রূপায়ণ পদ্ধতি একটি সাধারণ মূলনীতির মর্যাদা রাখে। যেমন শেষ বিচারের দিন আমলকে একটি অবয়ব দান করে ওজন করার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবো।
(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৪৭)

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ - فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ - وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ - فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ -

অতএব যার পাল্লা ভারী হবে সে সুখী জীবন যাপন করবে এবং যার পাল্লা হাল্‌কা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (সূরা ক্বারিয়া ঃ ৬-৯)

وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ -

যদি কোন আমল সরিষা-দানা পরিমাণ হয়, আমি তাও উপস্থিত করবো এবং হিসেব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৭)

وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -

তাদের ওপর সুতা পরিমাণ জুলুমও করা হবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৯)

وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا -

তাদের ওপর তিল পরিমাণ জুলুমও করা হবে না। (সূরা নিসা ঃ ১২৪)

ওপরের আয়াতগুলোতে আমল এবং মিযানকে শরীরী বস্তু বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কল্পনা ও রূপায়ণের যৌথ সমাবেশ

অনেক সময় আল-কুরআনের একই আয়াতে কল্পনা ও রূপায়ণের যৌথ সমাবেশ ঘটে থাকে। অতীন্দ্রিয় বস্তুটি তখন মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শরীরী ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সেই শরীরী বস্তুটিতে কাল্পনিক গতি সঞ্চারও করে দেয়া হয়। আমরা আগে যেসব উদাহরণ পেশ করেছি, সেখানে এর নমুনা আছে। কিন্তু আমরা এ নিয়মের আর কিছু নতুন উদাহরণ দিতে চাই। যেন প্রতিটি নিয়মের একাধিক উদাহরণ আমাদের নিকট থাকে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ -

বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, অতপর সত্য-মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১৮)

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ -

তিনি তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন. (সূরা আল-আহযাব ঃ ২৬)

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্বেষ ঢেলে দিলাম।
(সূরা মায়িদা ঃ ৬৪)

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

তারপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন নিজের পক্ষ থেকে প্রশান্তি তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি। (সূরা আত তওবা ঃ ২৬)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ -

বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সামনে ঝুঁকে থাকো।
(সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৪)

উল্লেখিত আয়াতগুলো বার বার পড়ুন এবং চিন্তা করুন। প্রথম আয়াতে মনে হয় সত্য বুঝি এক ধরনের বাতাসের গুলী যা বাতিলের ওপর পড়ে তাকে তছনছ করে দেয়। দ্বিতীয় আয়াতে ভীতিকে এমন এক কঠিন বস্তুরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দূর থেকে নিক্ষেপ করে অন্তরে প্রবেশ করানো যায়। তৃতীয় আয়াত থেকে মনে হয় বিদ্বেষ-শত্রুতা এমন একটি নিরেট বস্তু যা দু'দলের মধ্যে ছুড়ে দেয়া যায়। চতুর্থ আয়াত থেকে বুঝা যায় সান্ত্বনা এক ধরনের বস্তু যা রাসূলে করীম (স) ও ঈমানদারদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল এবং পঞ্চম আয়াত থেকে মনে হয় বিনয় ও নম্রতার জন্য বাহু প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যা সর্বদা তাদের সামনে ঝুঁকে থাকে।

ওপরের সবগুলো উদাহরণে কল্পনা এবং রূপায়ণের একত্রে সমাবেশ ঘটেছে। কারণ এসব উদাহরণ অশরীরী জিনিসকে শরীরীরূপে তুলে ধরা হয়েছে এবং তার মধ্যে কল্পিত গতি সৃষ্টি করা হয়েছে। আরো কয়েকটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করুন।

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَا طَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ -

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ৮১)

اَلَافِىْ الْفِتْنَةِ سَقَطُوْاؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ –

শুনে রাখো, তারাতো (পূর্ব থেকেই) ফিতনায় পড়ে গেছে এবং সিঃসন্দেহে জাহান্নাম এসব কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (সূরা তওবা ঃ ৪৯)

প্রথম আয়াতে গুনাহ্কে এক নিরেট বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পুনরায় পরিবেষ্টন করে রাখার কথা বলে তার গতিশীলতার কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা মনে হয় ফিতনা একটি গর্ত। আর কাফিররা সে গর্তে পড়ে গেছে।

وَلَاتَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ –

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে দিয়ো না। (সূরা বাকারা ঃ ৪২)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ –

অতএব আল্লাহ্র যে নির্দেশ তুমি পেয়েছ তা তাদেরকে শুনিয়ে দাও। (সূরা হিজর ঃ ৯৪)

প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায় সত্য ও মিথ্যা দুটো নিরেট পদার্থ। যা একটি আরেকটিকে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয় আয়াতে فَاصدَعْ (চিরে ফেলা) শব্দটি ব্যবহার করায় মনে হয় আল্লাহ্র নির্দেশ এমন এক বস্তু, যাকে চিরে ফেলা যায় এবং যা অন্য বস্তুতে মিলান যায়।

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ –

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৭)

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا –

আর যে তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করলো, সে এমন একটি হাতল ধরলো যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৬)

প্রথম আয়াতে হেদায়েতকে আলো এবং গুনাহ্‌কে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং বের করা কথাটি বলে চিন্তাকে গতিশীল করার প্রয়াস পেয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে ঈমানকে কঠিন বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে যা ভাঙ্গার কিংবা ছিন্ন হবার ভয় নেই।

বর্ণিত উদাহরণগুলোতে দেখা যায়, যখন অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মূল থেকে পৃথক করে শরীরী ও গতিশীল অবস্থায় পেশ করা হয় তখন সেই অর্থ মূর্তমান হয়ে আমাদের মস্তিষ্ককে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলে।

কুরআনে হাকীমের ঐ সমস্ত জায়গা, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাতের বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেখানে উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে সেখানেও একই স্টাইলে শরীরী চিত্র অংকিত হয়েছে। যেমন ঃ

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -

আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপরে। (সূরা আল-ফাতহ ঃ ১০)

وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ -

তার আরশ (তখন) পানির ওপর ছিল। (সূরা হূদ ঃ ৭)

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

তার আসন (ক্ষমতা) আসমান ও জমিনব্যাপী বিস্তৃত। (সূরা বাকারা ঃ ২২৫)

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -

অতপর আরশের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৫৪)

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ -

তারপর তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এবং তা ছিল ধুম্রকুঞ্জ।

(সূরা হামীম সাজদাহ ঃ ১১)

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ -

কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে।

(সূরা আয-যুমার ঃ ৬৭)

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى –

হে নবী! যখন তুমি কংকর নিক্ষেপ করছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছেন। (সূরা আল-আনফাল ঃ ১৭)

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ –

আল্লাহ্ সংকীর্ণ করেন এবং বিস্তৃত করেন। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৪৫)

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا –

এবং তোমার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে এসে উপস্থিত হবেন। (সূরা আল-ফজর ঃ ২২)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ –

ইহুদীরা বলে ঃ আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্য তাদের প্রতি লা'নত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত।

(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৬৪)

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ –

যখন আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা! আমি তোমাকে দুনিয়ায় থাকার সময়কাল পূর্ণ করবো এবং আমার নিকট উঠিয়ে আনবো। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৫)

আসল কথাতো তাই ছিল, ওপরে আমরা যা বর্ণনা করেছি। কিন্তু ভাষা ও বাক্যের প্রয়োগ এবং তার তাৎপর্য নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করা এক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে তাই উপরোক্ত শব্দসমূহ নিয়েও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এখানে সেরূপ বাক-বিতণ্ডার কোন অবকাশই ছিল না। কারণ এ সমস্ত বাক্যে বক্তব্য পেশ করার এমন স্টাইল অবলম্বন করা হয়েছে যা কুরআনের সাধারণ স্টাইল। অর্থাৎ মূল অর্থকে তাজসীম ও তাখয়ীলের পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এটি এমন এক স্টাইল যেখানে না আছে কোন পশ্চাৎপদতা আর না আছে কোন বক্রতা।

আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাস

যখন আমরা বলি কুরআনী উপকরণের মধ্যে চিত্রায়ণ পদ্ধতি মূল সূত্রের বা ভিত্তির মর্যাদা রাখে এবং কল্পনা ও রূপায়ণ চিত্রায়ণের উজ্জ্বলতম নমুনা। তো এখানেই কথা শেষ নয়। শুধু একথা বলায় না কুরআনের বিশেষত্ব বর্ণনার হক আদায় হয়ে যায় আর না কুরআনের দৃশ্যায়নের পুরো বৈশিষ্ট্যসমূহ সামনে চলে আসে। সত্যি কথা বলতে কি, চিত্রায়ণ, কল্পনা ও রূপায়ণ ছাড়াও কুরআনে বহু আলংকারিক দিক হয়েছে। যতোক্ষণ সে অরণ্যে প্রবেশ করা না যাবে ততোক্ষণ কুরআনের শৈল্পিক মূল্য ও মর্যাদা বুঝা সম্ভব হবে না। উদাহরণ স্বরূপ আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাসের কথা বলা যেতে পারে, যা দৃশ্যায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে।

শৈল্পিক বিন্যাসের ধরন

শৈল্পিক বিন্যাসের কয়েকটি স্তর আছে। বিন্যাসের শৈল্পিক এবং আলংকারিক কতিপয় দিক এমন আছে, যে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিশ্লেষণ করেছেন। আবার এমন কিছু দিকও আছে যে সবের মধ্যে তাদের স্পর্শ পর্যন্ত পড়েনি।

১. বিন্যাসের একটি ধরন, যার সম্পর্ক ইবাদতের বিন্যাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন— উপযোগী কিছু শব্দচয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যাস করা। যার বদৌলতে সে বাক্য বা কথা পরিশীলনে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এ বিষয়ে এতো বেশি আলোচনা হয়েছে যে, নতুন করে আর কিছু লেখার প্রয়োজনীয়তা নেই।

২. বিন্যাসের আরেকটি সম্পর্ক হচ্ছে, সুর ও ছন্দের সাথে। যা শব্দের সঠিক চয়ন এবং তাকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যাসের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি আল-কুরআনে পুরো মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং কুরআনের শৈল্পিক ভিত্তিতে তা একাকার হয়ে আছে। তবু আগের মনীষীগণের দৃষ্টি বাহ্যিক সুর ও ছন্দ ছাড়িয়ে আগে বাড়তে পারেনি। এমনকি তারা এটিও জানতেন না যে সঙ্গীতের সুর, তাল ও মাত্রার সংখ্যা কতো এবং তা কোন ঢংয়ে কোথায় ব্যবহৃত হয়।

৩. অলংকার শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ আল-কুরআনের বিন্যাসের আলংকারিক যেসব দিক সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, তার একটি হচ্ছে, আল-কুরআনের আয়াতের শেষ অথবা বক্তব্যের শেষ করা হয়েছে বক্তব্যের সাথে সংগতি রেখে। যেমন— যেসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও সিফাতের বর্ণনা করা হয়েছে তা শেষ করা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ বাক্য দ্বারা। আবার যেখানে কোন গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তা শেষ করা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ বাক্যটি দ্বারা। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে ইসমে মাওসুল (সংযোজিত পদ) নিয়ে তারপর ছিলাহ ৮সংযোজক পদ) ছাড়াই বাক্যকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া। তারপর জাযা বা প্রতিফল বর্দ্ধনা করা। যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ -

যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে এবং অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও যেতে পারবে না, যতোক্ষণ সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করতে না পারবে। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৪০)

তেমনিভাবে যেখানে তা'লীম ও তারবিয়াতের আলোচনা এসেছে সেখানে 'রব্ব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যথা ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ -الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسٰنَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

পড় তোমার রব্ব-এর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়, তোমার রব্ব অত্যন্ত দয়ালু যিনি কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানত না। (সূরা আল-আলাক ঃ ১-৫)

যেখানে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও সম্মান প্রতিপত্তির আলোচনা এসেছে সেখানে اللّٰهُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

এমিনভাবে الله শব্দটিকে স্থান ও কালভেদে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো আল্লাহ্ শব্দটি একবার বলে পরবর্তী আয়াতসমূহে শুধুমাত্র সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও বাক্যের প্রথমে, আবার শেষে, আবার কোথাও আল্লাহ্ শব্দ এবং তার সর্বনাম যৌথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক জায়গায় প্রশ্নের অবতারণার জন্য আবার অনেক জায়গায় ইতিবাচক বর্ণনার জন্য নেয়া হয়েছে। এটি অনেক অলংকার শাস্ত্রের পণ্ডিতদের নিকট আলংকারিক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত।

৪. কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের অর্থগত ধারাবাহিকতা থাকে। অতপর একটির উদ্দেশ্যকে অন্যটির উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করার ফলে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাও এক ধরনের শৈল্পিক বিন্যাসের নমুনা। অবশ্য অলংকার শাস্ত্রবিদগণ শৈল্পিক বিন্যাস সম্পর্কে যে নীতির কথা বলেন আল-কুরআন তা থেকে মুক্ত।

৫. সম্ভবত শৈল্পিক বিন্যাসের সর্বোচ্চ স্তর যে সম্পর্কে অলংকার শাস্ত্রবিদগণ এ পর্যন্ত পরিচিতি লাভ করেছেন তা হচ্ছে আল-কুআনের স্বভাবজাত বিন্যাস, যা কতিপয় আয়াতের বর্ণনা পরম্পরায় পাওয়া যায়। যেমন সূরা আল-ফাতিহা প্রসঙ্গে আমরা আল্লামা যামাখশারীর লেখা থেকে 'আল-কুরআনের গবেষণা ও তাফসীর' অধ্যায়ে উদ্ধৃতি দিয়েছি। অলংকার শাস্ত্রবিদগণ যে বৈশিষ্ট্যসমূহ নিরূপণ করেছেন, কুরআনী বালাগাতের গবেষক আলিমগণ আজ পর্যন্ত তাকে শৈল্পিক বিন্যাসের উত্তম প্রকাশ বলে ঘোষণা দিয়ে আসছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, তারা শৈল্পিক বিন্যাসের অন্য দিকটির নাগালও পাননি। তারা বেশি অগ্রসর হয়ে করার মধ্যে এই করেছেন, আল-কুরআনের সুর ও ছন্দ নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত তাদের নিকট মনে হয়েছে কুরআনের অন্য কোন বৈশিষ্ট্যই আর নেই। প্রকৃতপক্ষে কুরআনী বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। কিন্তু এখানেই তারা পরিতৃপ্ত হয়ে বসে পড়েছেন।

কেননা বালাগাতের আলিমগণ এর মর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না যে, চিত্রায়ণ ও দৃশ্যাংকনের মাধ্যমে আল-কুরআনে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তা মূল বা ভিত্তির মর্যাদা রাখে। তাই তারা শৈল্পিক বিন্যাসের ব্যাপারটি ভালভাবে আলোকপাত করতে পারেননি। এ বিষয়ে আমরা আমাদের নতুন চিন্তা-গবেষণা পেশ করবো বলেই এ পুস্তকটি লিখা হয়েছে। পুরোনো বিষয় নিয়ে বিবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাচ্ছি কুরআনের আলংকারিক

দিক সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝার চেষ্টা করা। আমাদের পূর্বসূরীরা যেখানে পৌঁছে থেমে গেছেন তা থেকে আরো সামনে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। কেননা তার প্রচুর অবকাশ আছে। এ বিষয়ে আমরা ঐ সমস্ত উদাহরণকে যথেষ্ট মনে করি, যা আমরা প্রথমদিকে 'সূরা আল-আলাক'-এর ব্যাখ্যায় এবং 'আল-কুরআনে সম্মোহনী শক্তির উৎস' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ঐসব উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয়, আল-কুরআনে চিন্তার যোগসূত্রতা এবং বাহ্যিক বিন্যাস প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ ও অবকাশ আছে।

আমরা শুধু একথাটি ইঙ্গিত দিতে চাই, আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী এবং ঐ সমস্ত স্থান, যা ঘটনার সাথে জড়িত এ দু'য়ের মধ্যে এক অদৃশ্য আত্মিক বন্ধন রয়েছে। সেই সাথে কুরআন সেসব ঘটনার দ্বীনি উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং শৈল্পিক দিকের প্রতিও দৃষ্টি রাখে। এ ধরনের মিল সংক্রান্ত উদাহরণ 'প্রসঙ্গঃ আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবালী' শিরোনামে উল্লেখ করা হবে। এছাড়াও কিয়ামতের দৃশ্য, শান্তি ও শাস্তির দৃশ্য, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথপোকথনের দৃশ্যাবলীতেও এ ধরনের মিল পাওয়া যায়, যা আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীতে বিদ্যমান। এ সমস্ত বিষয় বর্ণনার সময় একটি ধারবাহিকতা বা যোগসূত্রের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তাই বলে মূল উদ্দেশ্যটাকেও সরাসরি আলোচনায় নিয়ে আসা হয়নি, যে উদ্দেশ্যে ঐ ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে।

মূল কথা হচ্ছে কুরআনে কারীমের অর্থ ও তাৎপর্য এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদিও আলোচিত সেই বিষয়বস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং অতি উন্নত। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার নিগুঢ় যে সৌন্দর্য, দৃশ্যায়ণ থেকে তার বিস্তৃতি অনেক বেশি। আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় যে, আলোচনার সহজ ও সমতল পথ ছেড়ে অগ্রসর হয়ে এক ঝটকায় কলমের গতি সেই বিষয়বস্তুর সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে উপনীত করবো। এজন্য আমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে সেই চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করবো।

[৫.১] কুরআনুল কারীমে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে চিত্রায়ণ পদ্ধতিতে তার বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, সেখানে বক্তব্য এবং অবস্থার মধ্যে পুরোপুরি মিল পাওয়া যায়। যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণনার এ ঢং অথবা আভিধানিক অর্থ ছবির লক্ষণসমূহ পরিপূর্ণ করতে সহায়ক প্রমাণিত হয়। এটি এমন একটি বাঁক যা বর্ণনার জন্য ব্যাখ্যা এবং ছবির মধ্যে যোগসূত্রের মর্যাদা রাখে। যেখান থেকে হাল্কা ঢংয়ের বর্ণনা এবং উঁচু মানের নির্মাণ শৈলীর রাস্তা পৃথক হয়ে যায়। যেমন পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় নিকৃষ্ট সেইসব মূক ও বধির— যারা উপলব্ধি করে না। (সূরা আল-আনফাল ঃ ২২)

اَلدَّوَابُّ শব্দটি সাধারণত জীবজন্তুর বেলায় ব্যবহৃত হয়। অবশ্য অনেক সময় এ শব্দটি দিয়ে মানুষকেও বুঝানো হয়। কেননা دَابَّةٌ শব্দ দিয়ে ভূপৃষ্টে বিচরণকারী সকল প্রাণীকেই বুঝায় যেহেতু মানুষও ভূপৃষ্টে বিচরণ করে তাই মানুষের বেলায়ও এ শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু دَابَّةٌ শব্দটি মানুষ অর্থে গ্রহণ করতে বিবেক বাধ্য নয়। এটি স্বাভাবিকতার বিপরীত। এখানে মানুষের জন্য الدواب। শব্দটি ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে তাদের চরিত্র ও আচার আচরণে পশু সুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যা তাদের হেদায়েতের প্রথে প্রতিবন্ধক। এ থেকেই তাদের গাফলতি ও পশুত্বের ছবি পরিপূর্ণ হয়ে যায় لَا يَعْقِلُوْنَ (তারা উপলব্ধি করে না) শব্দ দিয়ে একথাটিকে আরো পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ -

আর যারা কাফির তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১২)

এ আয়াতে কাফিরদেরকে জন্তু-জানোয়ারের সাথে তুলনা করে এক চমৎকার চিত্র অংকন করা হয়েছে। কারণ তারা অল্প ক'দিনের দুনিয়ায় খুব আনন্দ ফূর্তি করছে এবং বিভিন্নভাবে তারা দুনিয়ার রং-তামাসাকে উপভোগ করার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু পরকালের শাস্তি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যে আচরণ একমাত্র জন্তু-জানোয়ারের দ্বারাই শোভা পায়। সেগুলো খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ ফূর্তিতে মশগুল থাকে কিন্তু একবারও ভেবে দেখে না, কসাইয়ের ছুরি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেগুলোর একমাত্র কাজই যেন শুধু খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-ফূর্তি করা।

আরো একটি উদাহরণ দেখুন ঃ

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ -

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ। নিজেদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছে যাও। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৩)

এ আয়াতে কয়েক প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য মিল পাওয়া যায়। এখানে স্বামী-স্ত্রীর স্পর্শকাতর সম্পর্ককে বড় সূক্ষ্ম ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপমা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে একজন কৃষক ও তার জমির সাথে তুলনা করা হয়েছে। জমি যেমন ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্র তদ্রূপ স্ত্রীও সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র। জমির ফসল দিয়ে যেমন গোলা পরিপূর্ণ করা হয়, তেমনি স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে বংশধারাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে গোটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সঠিক ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

[৫.২] অনেক সময় শুধুমাত্র একটি শব্দ— পুরো বাক্য নয়– ছবির আংশিক পূর্ণতার স্বাক্ষর বহন না করে বরং পুরো ছবিটিকেই উদ্ভাসিত করে তোলে। চিত্রায়ণ পদ্ধতিতে এ মিল পূর্বের চেয়েও জোরালো। এটি পূর্ণতার কাছাকাছি প্রায়। এর গুরুত্ব বেশি হওয়ার কারণ পূর্ণবাক্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র একটি শব্দই একটি চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। সেই শব্দটি কর্ণগোচর হওয়া মাত্র মনের মুকুরে ভেসে উঠে একটি পরিপূর্ণ চিত্র।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ -

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হয়েছে, যখন আল্লাহ্‌র পথে তোমাদেরকে বের হওয়ার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা জমিন আঁকড়ে পড়ে থাক।
(সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৮)

এ আয়াত পাঠকালে যখন اثَّاقَلْتُمْ শব্দটি কর্ণগোচর হয় তখনই চিন্তার জগতে একটি ভারী বস্তুর প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। মনে হয় কোন ব্যক্তি যেন ভারী কোন বস্তুকে উঠানোর জন্য বারবার চেষ্টা করছে কিন্তু তা ভারী হওয়ার কারণে উঠাতে পারছে না। মনে হয় শব্দটি ওজনে কয়েক টন। যদি আয়াতে تَثَاقَلْتُمْ বলা হতো (মূলত দুটো শব্দের অর্থ একই) তবে পূর্বের শব্দের মতো এতো ভারী বুঝাত না। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু ব্যবহৃত শব্দটির এতো যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে যে, শ্রোতা শোনামাত্র দুঃসাধ্য এক ভারী বোঝার চিত্র তার কল্পনার চোখে ভেসে উঠে।

এ ধরনের আরেকটি আয়াত হচ্ছে ঃ

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ –

আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যারা (ইচ্ছেকৃত) বিলম্ব করবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৭২)

এ আয়াতটি পড়া মাত্র বিলম্বের একটি ধারণা সৃষ্টি হয় বিশেষ করে لَيُبَطِّئَنَّ শব্দটি পাঠ কিংবা শ্রবণ করা মাত্র চোখের সামনে এক চিত্র ভেসে উঠে। তা হচ্ছে সেই কথা বলতে তাদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায়। বহু কষ্টে এবং অনেক বিলম্বে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে।

আল-কুরআনে হযরত নূহ (আ)-এর কথাটি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ –

(নূহ বললেন ঃ) হে আমার জাতি। দেখ তো আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলিলের ওপর থাকি, তিনি যদি তার পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তার পরেও যদি তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তবে আমি কি তা তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি, তোমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ? (সূরা হুদ ঃ ২৮)

এ আয়াতে اَنُلْزِ مُكُمُوْهَا শব্দটি পাঠ করা মাত্র অপছন্দ ও পীড়াপীড়ির এক চিত্র ভেসে উঠে মনের মুকুরে। তার সমস্ত চেতনা ও বাকশক্তি পরস্পর এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, যেমন كٰارِهُوْنَ বা ঘৃণাকারী সেই জিনিসের সাথে আচরণ করে যা সে ঘৃণা করে। এ আয়াতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিভাত হয় তা বালাগাত ও ফাসাহাতের এক বলিষ্ঠতম প্রয়োগ। যাকে পূর্ব যুগের ও বর্তমান যুগের মুফাসসিরগণ আল-কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ج لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ط كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ – وَهُمْ

يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۭ

আর যারা কাফির, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি অকৃতজ্ঞদেরকে এভাবেই শাস্তি প্রদান করি। সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন, আমরা সৎকাজ করবো, পূর্বে যা করেছি তেমনটি আর করবো না। (সূরা ফাতির ঃ ৩৬-৩৭)

এ আয়াতে يَصْطَرِخُوْنَ শব্দটি শোনামাত্র মনে হয়, জাহান্নামীরা চীৎকার করছে, সে আওয়াজ চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেই সাথে আরেকটি চিত্র ভেসে উঠে— তাদের এ মর্মান্তিক চীৎকার না কেউ শুনছে আর না এর কোন প্রতিকার করার জন্য কেউ এগিয়ে আসছে সেই প্রাণান্তকর চীৎকারের কারণে। এ চিত্র থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, শাস্তির তীব্রতা কতো ভয়াবহ।

যখন একটি মাত্র শব্দ সমস্ত বাক্যের বক্তব্যকে প্রস্ফুটিত করে তোলে তখন তা হয় تَنَاسُقٌ বা (শৈল্পিক) বিন্যাসের চূড়ান্ত রূপ। যেমন ঃ

عُتُلٍّ ۢبَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ -

কঠোর স্বভাব তদুপরি কুখ্যাত। (সূরা ক্বলম ঃ ১৩)

এ আয়াতে عُتُلٍّ শব্দটিই কঠোর স্বভাব ও নির্মমতার পূর্ণ চিত্র অংকন করার জন্য যথেষ্ট।

এ রকম আরেকটি আয়াতে কারীমা ঃ

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ -

কিন্তু এতো দীর্ঘজীবন তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।
(সূরা আল-বাকারা ঃ ৯৬)

এ আয়াতে بِمُزَحْزِحِهٖ-এর কর্তা হচ্ছে اَنْ يُّعَمَّرَ। যা পরিপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত একটি চিত্র অংকন করেছে। কথা ক'টি মুখে উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই চিত্র।

পরবর্তী আয়াতটিও একটি উত্তম উদাহরণ ঃ

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ - وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ -

অতপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদের (অর্থাৎ মূর্তি এবং মূর্তিপূজকদের) অধোমুখি করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলিস বাহিনীর সকলকেও। (সূরা আশ-শুআরা ঃ ৯৪-৯৫)

এ আয়াতে كُبْكِبُوْا শব্দটি জাহান্নামে পতিত হওয়ার যে আওয়াজ তার প্রতিনিধিত্ব করছে।

উল্লেখ্য যে, আয়াত দুটোতে مُزَحْزِحِه. এবং كُبْكِبُوْا শব্দদ্বয়ের আক্ষরিক অর্থই গোটা ছবিটিকে চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে.। কথা এটি নয় যে, কুরআনের বিশেষ ব্যবহারে তার মধ্যে এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মাত্র যে শব্দগুলো স্মরণ করা হলো তা কুরআনের বিশেষ এক প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে এবং একবার মাত্র তা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্যই একথা বলা যায় যে, উল্লেখিত শব্দদ্বয় যে স্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা আলংকারিক বর্ণনাসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট বর্ণনা হিসেবে গণ্য।

কুরআনে কারীমে কিয়ামতের বিশেষণমূলক যে কটি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে اَلصَّاخَّةُ (বধিরকারিণী) এবং اَلطَّامَّةُ (সকল কিছুর ওপর বিস্তার লাভকারী) শব্দ দুটোও আছে। اَلصَّاخَّةُ শব্দের মধ্যে এমন পরিমাণে গর্জন ও কাঠিন্য পাওয়া যায়, শব্দটি শোনামাত্র মনে হয়, সে গর্জনে কান ফেটে যাবে। এ শব্দটি বাতাস ভেদ করে কর্ণকুহরে গিয়ে আঘাত করে এবং বধির করে দেয়। তেমনিভাবে اَلطَّامَّةُ শব্দটিও মনে হয় তীব্রবেগে চলমান। এটি ঝড়ের গতিতে সকল কিছুতে ছেয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলছে। এ রকম আরেকটি আয়াত ঃ

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ -

সকাল বেলার শপথ, যখন সে শ্বাস গ্রহণ করে (অর্থাৎ উদ্ভাসিত হয়)।
(সূরা তাকবীর ঃ ১৮)

আমি تَنَفَّسَ-এর মতো সূক্ষ্ম ও মনোরম শব্দ চয়ন দেখে এবং এর বিকল্প প্রতিশব্দের কথা চিন্তা করে 'থ' খেয়ে গেলাম। আপনিও কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে অবাক হয়ে যাবেন এবং একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, সঠিক জায়গায় সঠিক শব্দটি নির্বাচনে আল-কুরআনের সৌন্দর্য ও অলৌকিকত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ -

যখন তিনি তোমাদের প্রশান্তির জন্য নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর নিদ্রার চাদর বিছিয়ে দিলেন। (সূরা আল-আনফাল ঃ ১১)

এ আয়াতে নিদ্রাকে اَلنُّعَاسَ (তন্দ্রাবেশ) শব্দ দিয়ে নিদ্রার প্রচণ্ড প্রভাবের কথা বুঝানো হয়েছে। মনে হয় নিদ্রা এক ধরনের পাতলা ও সূক্ষ্ম চাদর যা খুব আরাম ও মসৃণতার সাথে ঢেকে দেয়। اَمَنَةً مِّنْهُ শব্দ থেকে মনে হয় গোটা পৃথিবীব্যাপী প্রশান্তি ও নিরাপত্তা ছেয়ে আছে।

শব্দ ও উচ্চারণ থেকে চিত্রায়ণ আমরা আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা— সূরা আন–নাসেও দেখতে পাই। চিন্তা করে দেখুন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

বলে দাও, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (আশ্রয় চাচ্ছি) লোকদের প্রকৃত বাদশাহ্‌র নিকট। মানুষের ইলাহ্‌র নিকট। শয়তানের খারাপ ওয়াসওয়াসা থেকে (যে আল্লাহর নাম শুনে ভেগে যায়), যে লোকদের অন্তরে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি করে। চাই সে মানুষের মধ্য থেকে হোক কিংবা জ্বিনদের মধ্য থেকে। (সূরা আন-নাস ঃ ১-৬)

এ সূরাটিকে বার বার পড়ুন এবং দেখুন আপনার আওয়াজ একটি পরিপূর্ণ ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করবে যা অবিকল সূরায় বর্ণিত ওয়াসওয়াসার মতো। বিশেষ করে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠে সৃষ্টি হয়।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ -

আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ط اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا -

কতো কঠিন তাদের মুখের কথা, তারা যা বলে তাতো সবই মিথ্যে।
(সূরা কাহাফ ঃ ৫)

এ আয়াতটিও আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তবে সামান্য পার্থক্য আছে। এ আয়াতে একটি দোষের কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সন্তান আছে। এ আয়াতে সম্ভাব্য সকল পন্থায় এ চরম মিথ্যে কথাটিকে খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন প্রথমে كَبُرَتْ কথাটি বলে কর্তাকে গোপন রাখা হয়েছে। আবার كَلِمَةً শব্দটি তমীয ও নাকারা (অনির্দিষ্ট) হিসেবে নিয়ে জঘণ্যতার মাত্রাধিক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর مِنْ اَفْوَاهِهِمْ বলে বুঝান হয়েছে, কথাগুলো মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃত এবং অজ্ঞতা প্রসূত বের হয়েছে। اَفْوَاهِهِمْ. -এর মাধ্যমে যে ঘৃণা ও নীচতা সৃষ্টি হয় তাকে বলবৎ রাখা হয়েছে। এ শব্দটি উচ্চারণের সময় মুখকে সামান্য ফাঁক করা হয় কিন্তু শেষ মীম (م) টি উচ্চারণের সাথে সাথে তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। অথচ তখনও কণ্ঠনালী থেকে বাতাস বেরিয়ে মুখ ভর্তি থাকে।

এক ধরনের শব্দ আছে, যা বিষয়বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে ঠিকই কিন্তু নিজের বক্তব্য ও আওয়াজকে কানে প্রবেশ করিয়ে নয়। তার চিত্রের পরিধি শুধুমাত্র ঐ ছায়ার মতো যা চিন্তার জগতে সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, শব্দ এবং বাক্যের নিজস্ব এক ছায়া বা প্রতিবিম্ব থাকে, যখন মানুষের দৃষ্টি পড়ে তখন তা দৃষ্টিগোচর হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে নিচের এ আয়াতটি ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا -

তাদেরকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা শুনিয়ে দাও যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। (সূরা আরাফ ঃ ১৭৫)

এ আয়াতে 'ফানসালাখা' (فَانْسَلَخَ) শব্দটি দ্বারা অনুমিত হয়, ঐ ব্যক্তিকে যে নিদর্শন দেয়া হয়েছিল সে তা থেকে কিভাবে বেরিয়ে গেছে। নিচের আয়াতটিও আরেকটি উত্তম উদাহরণ ঃ

فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَئِفًا يَّتَرَقَّبُ -

অতপর তিনি প্রভাতে শহরে ভীত শংকিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন।
(সূরা কিসাস ঃ ১৮)

এ আয়াতে يَتَرَقَّبُ শব্দে হযরত মূসা (আ)-এর ভীত ও শংকিত হবার চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সামনে রাখতে হবে যে, হযরত মূসা (আ) ভয়ের প্রকাশ স্থল 'ফিল মাদীনাতি' فِى الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ শহরকে মনে করেছেন যা সাধারণ শান্তি ও নিরাপত্তার হয়ে থাকে। যদিও 'ইয়াত্তারাক্কাবু'

(يَتَرَقَّبُ) ঐ সমস্ত জায়গাকেই বলা হয় যেখানে ভয়-ভীতি লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে শান্তি নিরাপত্তার জায়গাকে ভীতিকর চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে 'কল্পনা ও রূপায়ণ' অধ্যায়ে এ ধরনের উদাহরণ পেশ করেছি, সেগুলোও এর সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রাখে।

কখনো কখনো একই শব্দে আওয়াজ এবং প্রভাব একত্রিত হয়ে থাকে। যেমন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا –

যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা আত-তুর ঃ ১৩)

এ আয়াতে دَعًّا শব্দটি আওয়াজ ও প্রভাবের সাথে সাথে তার তাৎপর্যের চিত্র সৃষ্টি করে। এখানে চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে دَعًّا শব্দের অর্থ জোরের সাথে ধাক্কা দেয়া। যখন খুব জোরে কাউকে ধাক্কা দেয়া হয় তখন তার মুখ থেকে তার অজান্তে اُعْ (ওহ্) শব্দটি বেরিয়ে যায়। এ শব্দটি دَعًّا শব্দের সাথে অত্যন্ত সমঞ্জস্যশীল। নিচের আয়াতটিও লক্ষ্য করুন ঃ

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ –

একে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। (সূরা দুখান ঃ ৪৭)

এ আয়াতে فَاعْتِلُوْهُ শব্দটির আওয়াজ কানে প্রবেশ করা মাত্র ভাবজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং একটি জীবন্ত ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে।

এ অধ্যায়ে আমরা সেইসব শব্দের উল্লেখ করতে পারি, যে সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম, আওয়াজটাই তার আক্ষরিক অর্থের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন النُّعَاسَ (তন্দ্রা), اَلتَّنَفُّسُ (শ্বাস গ্রহণ করা), اَلطَّآمَّةُ (কিয়ামত)। এসব শব্দ আওয়াজের সাথে সাথে একটি ছায়াও সৃষ্টি করে। কিন্তু এর আওয়াজ ও ছায়ার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান তার সীমা নির্ধারণ অত্যন্ত কঠিন কাজ। যখন শব্দ তার অর্থ ও ভাবের ছবি অংকন করে তখন ধ্বনি ও ভাব একত্রিত হয়ে যায়। তা শুধু অর্থগত দিকে নয় বরং চিন্তা ও চিত্রের দিকেও ধাবিত হয়। আর ঐ জায়গাটিই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যস্থল।

[৫.৩] আল-কুরআন তার বক্তব্য তুলে ধরার জন্য দৃশ্যায়নের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তার মধ্যে তাকাবুল বা বৈপরিত্যও একটি। কুরআন যেখানে

শব্দের মাধ্যমে সূক্ষ্ম চিত্র অংকন করতে চায় সেখানে অধিকাংশ সময় তাকাবুল পদ্ধতির অনুসরণ করে থাকে। যেমন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ –

তার এক নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছে এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম। (সূরা আশ শুরা ঃ ২৯)

এ আয়াতে بَثَّ (বিক্ষিপ্ত) এবং جَمْعِهِمْ (একত্রিত করা) শব্দদ্বয় তাকাবুল বা বৈপরিত্যের। বিপরীতমুখী এ শব্দ দুটোকে একই আয়াতে একত্রে প্রয়োগ ঘটিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকা হয়েছে। যা চিন্তার জগতে একের পর এক ছবির মতো আবির্ভূত হয়। যদিও শব্দ দুটো বিপরীতার্থক তবু তা সুন্দরভাবে মিলে গেছে।

নিচের আয়াতটিতে জীবন ও মৃত্যু বিপরীতধর্মী দুটো চিত্রকে একত্রিত দেয়া হয়েছে।

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ – اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ –

এতে কি তাদের চোখ খুলেনি, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়ি-ঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না ? তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উৎপন্ন করি। যা তারা এবং তাদের পশুগুলো খেয়ে থাকে। তারা কেন এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে না ?

(সূরা সাজদা ঃ ২৬-২৭)

দেখুন, এ আয়াতে জীবন মৃত্যুর মধ্যে কতো পার্থক্য। প্রথমে ঐ সমস্ত লোকের কথা বলা হয়েছে যারা একদিন জমিনের ওপর চলাফেরা করতো। আজ তারা মৃত, তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাদের আবাসভূমি বিরাণ। আবার পলকের মধ্যে অন্য রকম এক চিত্রের অবতারণা। মৃত জমিনকে

সবুজ-শ্যামল করে সুশোভিত করার চিত্র। এখানে তাকাবুল বা বৈপরিত্য মূলত এক অবস্থার সাথে আরেক অবস্থার মধ্যে নয় বরং জীবন ও মৃত্যুর সাথে।

এ ধরনের 'তাকাবুল' (বৈপরিত্য)-এর চিত্র পরকালীন জীবনের শান্তি ও শাস্তি প্রসঙ্গে যেসব জায়গায় বলা হয়েছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ধরনের কতিপয় উদাহরণ আমরা নিচে বর্ণনা করলাম।

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا - وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا -
وَجِاْىْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى -
يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ - فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ -
وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ - يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِىْٓ اِلٰى
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ - وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ -

এটি অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং তোমার প্রতিপালক আবির্ভূত হবেন। ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে। কিন্তু এ স্মরণ তার কী কাজে আসবে ? সে বলবে ঃ হায় আমি যদি এ জীবনের জন্য আগেই কিছু পাঠিয়ে দিতাম। সেদিন তার শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দেবে না এবং সে বাঁধনের মতো বাঁধনও কেউ দেবে না। (সূরা ফজর ঃ ২১-৩০)

চিন্তা করে দেখুন, একদিকে জাহান্নাম ভয়াবহ রূপে উপস্থিত এবং অপরদিকে ফেরেশতাগণ সেনাবাহিনীর মতো ঘিরে দাঁড়ানো। জাহান্নাম অত্যন্ত ভয়াল মূর্তিতে আবির্ভূত। তার শাস্তি এতো ভয়ঙ্কর যার কোন উপমা নেই।

এমন বিপদ এবং বিপর্যয়ের মুহূর্তেও ঈমানদারদেরকে ডেকে বলা হবে ঃ

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ -ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً -
فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ - وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ -

হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। (সূরা ফজর ঃ ৩০)

এমন বিভিষিকাময় অবস্থায়ও একজন মু'মিনকে দরদ ও স্নেহমাখা বাক্যে

আহ্বান করা হবে— 'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার রব্ব-এর দিকে ফিরে যাও।' আর এ ফিরে যাওয়ার মধ্যে ঐ বান্দা এবং প্রতিপালকের সাথে গভীর ভালবাসা ও সন্তোষের প্রমাণ পাওয়া যায়। رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন। এসব শব্দে প্রেম-ভালবাসার যে নিদর্শন পাওয়া যায় মনে হয় পুরো পরিবেশটাই প্রীতিডোরে বাধা। তারপর বলা হয়েছে ঃ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ আমার বিশেষ বান্দাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এবং তাদের সাথে ভালবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করো।وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ তারপর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। জাহান্নামের বর্ণনা পুরো পরিবেশটিকে ভয় ও পেরেশানীর এক চিত্রে ঘিরে রেখেছিল। এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক চিত্র পাওয়া যায়। যা প্রেম-প্রীতিতে পরিপূর্ণ।

ওপরের উদাহরণটি ছিল কাফির ও মু'মিনের মধ্যে বিপরীতধর্মী এক চিত্র। এখন আমি জাহান্নামীদের আযাব ও জান্নাতীদের নিয়ামতের বিপরীতধর্মী এক চিত্র পেশ করছি।

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ - وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ - تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً - تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ - لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ - لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ - وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ - لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ - فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً - فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ - فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ - وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ - وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ - وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ -

তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি ? অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট-ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে, আর কাঁটাযুক্ত ঝাড় ছাড়া তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। এতে তাদের দেহের পুষ্টি সাধন কিংবা ক্ষুধা নিবারণ হবে না। আবার অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব। তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। সেখানে কোন অসার কথাবার্তা তারা শুনবে না। সেথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা, উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পানপাত্র ও সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।

আযাব ও নিয়ামতের বিপরীতধর্মী একটি সুন্দর চিত্র পূর্বের আয়াত কটি। এ ধরনের উদাহরণ আল-কুরআনে অনেক।

[৫.৪] ওপরের উদাহরণগুলো ছিল দু'টো বিপরীতধর্মী চিত্র। কিন্তু এবার আমরা এমন কিছু উদাহরণ পেশ করবো যা বিপরীতধর্মী বটে কিন্তু তার একটি অতীতের এবং অপরটি বর্তমানকালের। অতীতকে কল্পনায় বর্তমানে নিয়ে এসে দুটো অবস্থার বিপরীতধর্মী ছবি আঁকা হয়েছে। যেমন ঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ -

তিনি মানুষকে এক ফোটা বীর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তা সত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। (সূরা আন-নাহল ঃ ৪)

যে অবস্থা বর্তমানে আমাদের সামনে উপস্থিত তা একজন প্রকাশ্য ঝগড়াটে (خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ) ব্যক্তির, কিন্তু অতীতে সে ছিল সামান্য এক ফোটা বীর্য মাত্র। এ দু' অবস্থার মধ্যে যে ব্যাপক ব্যবধান তাই এখানে বুঝান উদ্দেশ্য। এজন্য দুটো অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাকে উহ্য রাখা হয়েছে। যেন একথা প্রকাশ করা যায় যে, মানুষের শুরু যদি এই হয়ে থাকে, তাহলে তার ঝগড়া করা সাজে না। অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ ঃ

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً - اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالاً وَّجَحِيْمًا - وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا -

বিত্তবৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দাও। নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে শিকল, অগ্নিকুণ্ড, গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(সূরা মুজাম্মিল ঃ ১১-১৩)

এখানেও দুটো অবস্থার মধ্যে বৈপরিত্য দেখা যায়। এক অবস্থাতো বর্তমানে উপস্থিত অর্থাৎ বিত্তবৈভবের অহংকার। আরেক অবস্থা বর্তমান অনুপস্থিত শুধু কল্পনার রাজ্যে সীমাবদ্ধ। বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। এ উদাহরণ থেকে শৈল্পিক ও দ্বীনি গুরুত্বই প্রকাশ পাচ্ছে। নিচের আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ - يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ - كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ - وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ

اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ - الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ - اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ - فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ -

পশ্চাতে ও সম্মুখে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ; যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং গুণে গুণে হিসেব রাখে। সে মনে করে, তার সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে। কক্ষণ নয়। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে 'হুতামায়'। তুমি কি জান, 'হুতামাহ' কি ? তা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, লম্বালম্বি খুঁটিতে। (সূরা হুমাজাহ ঃ ১-৯)

এ সূরাটিতে বিপরীতধর্মী দুটো অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। একটি দুনিয়ার অবস্থা এবং অপরটি আখিরাতের। কিছু দাম্ভিক ও অহংকারী আছে যারা দুনিয়ার বিত্ত বেসাতে মত্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে গেছে এবং দুনিয়ার রঙ-তামাশায় লিপ্ত আছে। কিন্তু তাদের এ চলার পথের অপর প্রান্তে অপেক্ষা করছে জাহান্নাম। এমন জাহান্নাম যা সবকিছুকে পিষ্ট করে দেয় এবং তার আগুন হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করে। ঐ হৃদয় যা আজ অহংকার ও দাম্ভিকতায় উন্মাতাল। তাদেরকে সেখানে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হবে, যেখান থেকে তারা স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসতে পারবে না কিংবা অন্য কেউ বের করে আনতেও সক্ষম হবে না।

নিচের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَااَصْحٰبُ الشِّمَالِ - فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ - وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ - لَّابَارِدٍ وَّلَاكَرِيْمٍ - اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ -

বামপন্থী লোক, (হায়!) বামপন্থী লোকেরা কী আযাবে থাকবে। তারা থাকবে প্রখর বাষ্প ও উত্তপ্ত পানিতে এবং ধুম্রকুঞ্জের ছায়ায়। যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। তারা ইতোপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল।

(সূরা আল-ওয়াকিয়া ঃ ৪১-৪৫)

এখানে দুটো অবস্থাকে মুখোমুখি পেশ করা হয়েছে। এক অবস্থা হচ্ছে জাহান্নামীদের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ গরম বাষ্প, গরম পানি, ধুয়ার ছায়া যা শুধু নামেমাত্র ছায়া। এ কঠিন অবস্থাকে তাদের পূর্বের অবস্থার (অর্থাৎ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের) সাথে মুখোমুখি করে পেশ করা হয়েছে।

ওপরে বর্ণিত অবস্থা এবং তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অবস্থার মধ্যে এক সূক্ষ্ম চিন্তার ব্যাপার আছে। এ আয়াতে যেসব লোকের কথা বলা হচ্ছে তারা রীতিমতো জীবিত এবং দুনিয়ায় বিচরণরত। দুনিয়ার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাদের করায়ত্ত। এ অবস্থাটি বর্তমানে বিদ্যমান। আখিরাতে তাদের জন্য যে দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে তা পরের কথা। কিন্তু সেই পরের অবস্থাকে কুরআন বর্তমান অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। পাঠক মনে করেন দুনিয়ার লেনদেন চুকিয়ে ঐ অবস্থায় তারা ইতোমধ্যেই প্রবেশ করেছে, যে অবস্থা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। তাদের পেছনের সমস্ত সুখ-সম্ভোগ শেষ হয়ে গেছে। তারা তীব্র আযাবের সম্মুখীন। এমতাবস্থায় তাদের পেছনের কথা, সেই সুখের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

মনে হতে পারে, এটি আশ্চর্য ধরনের চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু তাকে কি ? কুরআনের বহু জায়গায় এ ধরনের স্টাইলে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কুরআনের এ বর্ণনা শৈল্পিক এবং দ্বীনি দুটোরই আবেদন রাখে। শিল্পের অনুসন্ধানী মনে করে— এ শুধু উপমা উৎক্ষেপণ নয় বরং এটি অনুভব ও বোধের সীমানা ছাড়িয়ে চোখের সামনেই সংঘটিত একটি ঘটনা, যা ঘটে চলছে।

দ্বীনি অনুসন্ধানীদের অনুভূতি হচ্ছে জাহান্নামে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর ওপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস (ইয়াকীন) করা উচিত, যেন তা এখনই সংঘটিত হচ্ছে। তার সম্পর্ক উপলব্ধির সাথে। আর এ দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য প্রস্তুত করে।

নিচের আয়াতটিও ওপরের উদাহরণের সাথে সম্পর্ক রাখে।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ - ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ
عَذَابِ الْحَمِيْمِ - ذُقْ ج اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ -

একে ধরো এবং টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাও। তারপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। (এখন) মজা বুঝ। তুমিতো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। (সূরা আদ-দুখান ঃ ৪৭-৪৯)

নিচের আয়াতটিও বিপরীত ধর্মী এক চিত্র পেশ করে ঃ

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىْ - وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ - وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ -
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ - اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمَسَاقُ - فَلَا صَدَّقَ

وَلَا صَلّٰى - وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى - ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى -

কখনো না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, কে ঝাড়-ফুঁক করবে ? আর সে মনে করবে, বিদায়ের মুহূর্তটি এসে গেছে এবং পায়ের গোছা অপর গোছার সাথে জড়িয়ে যাবে। সেদিন তোমার রব্ব-এর কাছে সবকিছু উপস্থিত করা হবে। সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি। পরন্তু মিথ্যা মনে করেছে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। তারপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ্ ঃ ২৬-৩৩)

উক্ত আয়াতগুলোতে দুটো অবস্থার বিপরীতধর্মী চিত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এক, অতীতে যা অতিবাহিত হয়েছে। মনে হয় যেন, গোটা সৃষ্টি জগৎ তার সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে ম্রিয়মান হয়ে গেছে। এমন একটি সময় ছিল— যখন মৃত ব্যক্তি নামায আদায় করেনি, কুরআনের সত্যতা মেনে নেয়নি। এক অবস্থা (অর্থাৎ মৃত্যুর সময়) চোখের সামনে উপস্থিত। আর সে ব্যক্তি নির্বিকার। মৃত্যুর সময় উপস্থিত, ভয়ে এতোটা বিহ্বল যে, দু' পা ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে। আত্মা গলা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছে, কোন ঝাড়-ফুঁককারী নেই ? যে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। যেভাবে জ্বিন-প্রেতের আসর থেকে মুক্তির জন্য ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

মুমূর্ষু ব্যক্তি মনে করে, আজ আমার পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দিন। বিগত দিনের স্মৃতি তার হৃদয়পটে ভেসে উঠে। নবী করীম (স)-এর দাওয়াত থেকে দাম্ভিকতার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিজের পরিজনের কাছে চলে আসা, তাঁর দাওয়াতকে মিথ্যে মনে করা। দুটো ছবিই তার চোখের সামনে ভেসে উঠে। কিন্তু তাতে কোন কল্যাণ হবে না। কারণ পা তো একটির সাথে আরেকটি পেঁচিয়ে রয়েছে। এখন আর সময় নেই। এখন তো রব্ব-এর দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল-কুআনে সুর ও ছন্দ

আল-কুরআনের শব্দের মিল ও সাদৃশ্য সম্পর্কে অন্যান্য লেখকগণ যা কিছু আলোচনা করেছেন, আমি তার ওপর শুধুমাত্র একবার দৃষ্টি প্রদান করে আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাসের ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই, যে সম্পর্কে এখন বিস্তারিত কিছু আলোচনা হয়নি এবং তা এ পুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথেও সংশ্লিষ্ট। বিশেষ করে আল-কুরআনের উচ্চারণের সাদৃশ্যতা।

আমি এর আগে আভাস দিয়েছি যে, কুরআনে কারীমের মধ্যে সুর ও ছন্দ (শব্দের উচ্চারণ সাদৃশ্যতা) আছে এবং তার কিছু প্রকার ও ধরন আছে। যা তার বক্তব্য উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেহেতু সমস্ত কুরআন-ই ছন্দবদ্ধ সেহেতু সর্বত্রই সুর ও তাল বিদ্যমান। দেখা গেছে একই শব্দের বিভিন্ন অক্ষর এবং একই আয়াত ও তার শেষ শব্দ ছান্দিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে। চাই সে আয়াত ছোট হোক কিংবা বড়। বাক্যের শেষ শব্দের মধ্যে সেই মিল কিভাবে হয়, সেসব বাক্য সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ -

আমি তাঁকে (অর্থাৎ রাসূলকে) কবিতা বা কাব্য শিক্ষা দেইনি। আর তা তাঁর জন্য শোভাও পায় না। এতো একটি স্মারক যা সুস্পষ্ট কুরআন (হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে)। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৯)

একথাটি হচ্ছে কাফিরদের ঐ অভিযোগের জবাব, যা সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

بَلِ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

(তারা বলতো) সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না বরং সে একজন কবি।
(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৫)

আল-কুরআন ঠিকই বলেছে, এটি কাব্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে— আরববাসী যারা একে কবিতা বা কাব্য বলতো তারা কি পাগল ছিল, না কবিতা ও কাব্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল ? নিশ্চয়ই নয়। যেহেতু তারা একে কাব্য বলেছে কাজেই এর মধ্যে অবশ্যই কবিতা ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে যার যাদুকরী আবেশে তারাও মোহবিষ্ট হয়েছিল। কুরআনের উচ্চারণ সাদৃশ্যতা ও তার সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদের কান পরিচিত ছিল, ফলে এটি যে একটি কাব্য তা তারা বুঝতে পেরেছিল। আমরা যদি কেবল মাত্রা ও অন্তমিলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তবু বুঝা যায় কাব্য ও কবিতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান।

তাছাড়া কুরআন গদ্য ও পদ্য উভয়কেই সুন্দরভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে। আল-কুরআন মাত্রা (وزن) ও অন্তমিল (قافية) থেকে স্বাধীন এবং এতে মিল থাকতেই হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা কুরআনের নেই। তবু সেখানে সুর ও ছন্দ বর্তমান। আয়াতের শেষে মিত্রাক্ষরের প্রয়োজন, সে প্রয়োজনও কুরআন অবশিষ্ট রাখেনি। সেই সাথে আমরা ওপরে কাব্যের যে বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেগুলোও সে ধারণ করে নিয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় কুরআনে গদ্য ও পদ্য উভয় বেশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যমান।[১]

সত্যি কথা বলতে কি, মানুষ যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন বাহ্যিক উচ্চারণে সে মাত্রা ও অন্তমিল দেখে, বিশেষ করে এ ব্যাপারটি ছোট ছোট আয়াত সম্বলিত সূরাগুলোতেই দৃষ্টিগোচর হয়। অথবা ঐ সমস্ত জায়গায় যেখানে কোন ঘটনাচিত্র উপস্থাপন করা হয়। অবশ্য দীর্ঘ আয়াতের সূরাগুলোতেও এটি আছে তবে তা এতোটা স্পষ্ট নয়। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন, যেখানে সুর, ছন্দ ও মাত্রার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে ঃ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى - مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى - عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى - ذُوْ مِرَّةٍ ط
فَاسْتَوٰى - وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى - ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى -

১. ডাঃ ত্বা-হা হোসাইন লিখেছেন ঃ কুরআন পদ্যও নয় কিংবা গদ্যও নয়, কুরআন শুধু কুরআন-ই। অবশ্য এতে মাত্রা ও অন্তমিল বিদ্যমান বলে মনে হয় কিন্তু তা শুধু দৃশ্যমান বাহ্যিক অবস্থার সাথেই সীমাবদ্ধ। আরবী সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন যে এক উৎকৃষ্ট ও উন্নত মানের গদ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত, কুরআনের গদ্যরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী যার কোন উপমা উদাহরণ পেশ করা সম্ভব নয়। —লেখক।

নক্ষত্রের কসম, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট কিংবা বিপথগামী নয় এবং প্রবৃত্তির তাড়নায়ও কথা বলে না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষাদান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা। সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল ঊর্ধ্ব দিগন্তে।

(সূরা আল-নজম ঃ ১-৮)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدْنٰى - فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى - مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى - اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَايَرٰى -

অতপর নিকটবর্তী হলো এবং ঝুলে রইলো, তখন ব্যবধান ছিল দুই ধুনক কিংবা তার চেয়ে কম। তখন আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে ? (সূরা নজম ঃ ৯-১২)

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى - اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَايَغْشٰى - مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى - لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى -

নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুল মুনতাহার কাছে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার তা দিয়ে আচ্ছন্ন হচ্ছিল। তাঁর দৃষ্টিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। নিশ্চয়ই সে তাঁর পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।

(সূরা আন-নাজম ঃ ১৩-১৮)

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى - وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى -

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উজ্জা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে ? (সূরা আন-নজম ঃ ১৯-২০)

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى -

পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য আর কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য ?

(সূরা নজম ঃ ২১)

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى -

এ ধরনের বণ্টন তো খুবই অসঙ্গত বণ্টন। (সূরা আন-নজম ঃ ২২)

উল্লেখিত আয়াতগুলোর শেষাক্ষরে মাত্রার প্রায় মিল আছে। কিন্তু আরবী ছন্দের মাত্রার চেয়ে তা কিছুটা ভিন্ন। সব আয়াতের শেষেই মিত্রাক্ষর এক ধরনের। মাত্রা ও মিত্রাক্ষরের বদৌলতে প্রতিটি আয়াতের সাথে অপর আয়াতের একটি মিল সংঘটিত হয়েছে। ফলে বিচ্ছুরণ ঘটেছে অপূর্ব সুর মূর্ছনার। এই যে মিল ও সাদৃশ্য তার আরেকটি কারণ আছে, অবশ্য তা মাত্রা ও মিত্রাক্ষরের মতো এতোটা উজ্জ্বল নয়। কেননা তা একক শব্দ, অক্ষরের বিন্যাস এবং বাক্যে শব্দসমূহের বিন্যাসের কারণে সৃষ্টি হয়। তার অনুভূতি ও উপলব্ধির পরিধি, দ্বীনি চেতনা এবং সুর ও সঙ্গীতের উপভোগের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য অন্তরার সুরেলা আওয়াজ এবং বেসুরো আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য করা যায়, শুধুমাত্র বাক্যান্তে মিত্রাক্ষর হলেই তাকে সুর বা ছন্দ বলে অভিহিত করা যায় না।

উল্লেখিত আয়াতগুলো ছোট ছোট বিধায় তা থেকে সৃষ্ট সূর-তরঙ্গের স্থায়িত্বও খুব দীর্ঘ নয়। তবে সব আয়াতের ছন্দ ও মাত্রা এক। তাই সব আয়াতে মিল আছে। এসব আয়াতে শেষ অক্ষর এক রকম হতে হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যেমন আধুনিক সাহিত্যে কোন গল্প-উপন্যাস লিখার সময় এদিকে নজর দেয়া হয় না, কুরআনী সুর ও ছন্দের বেলায় এসব কিছুকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনেক আয়াত থেকে তো স্পষ্ট বুঝা যায় বাক্যান্তে মিলের জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিতভাবে তা করা হয়েছে। যেমন নিচের আয়াতটি লক্ষ্য করে দেখুন।

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى - وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى -

যদি এভাবে বর্ণনা না করে নিচের মতো করে বর্ণনা করা হতো ঃ

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى - وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ -

তাহলে অন্তমিলে পার্থক্য সৃষ্টি হতো এবং ছন্দপতন ঘটতো। তদ্রূপ নিচের আয়াতও ঃ

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى - تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى -

যদি এভাবে উল্লেখ না করে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হতো ঃ

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى - تِلْكَ قِسْمَةٌ ضِيْزٰى -

তাহলে ছন্দের মিল হতো না। 'ইযান' (اِذًا) শব্দটি দিয়ে সেই মিলকে পুরো করা হয়েছে।

তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, 'আল উখরা' (الأخرى) এবং 'ইযান' (إذا) শব্দ দুটো ছন্দের মিল ছাড়া আর অন্য কোন কারণে নেয়া হয়নি, এ দুটো অতিরিক্ত শব্দ। আসলে এ দুটো অতিরিক্ত শব্দ নয় বরং বাক্য বিন্যাসের জন্য সূক্ষ্ম অপরিহার্যতার কারণেই এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আল-কুরআনের আরেকটি শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য। একটি বিশেষ অর্থে আল-কুরআনে এ ধরনের শব্দ চয়ন করা হয়েছে এবং সাথে সাথে সেই শব্দটি সুর ও তালের মাত্রাকেও ঠিক রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যেমন আমরা আলোচনা করেছি, আল-কুরআনের এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের উচ্চারণের সময় এক ধরনের ছন্দের মিল লক্ষ্য করা যায় এবং শেষে মিত্রাক্ষর দৃষ্টিগোচর হয়। আবার অনেক জায়গায় শব্দ নির্বাচন এমনভাবে করা হয়েছে, যেখানে একটি শব্দ আগ-পাছ করলেই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম অবস্থা ঃ প্রথম অবস্থা হচ্ছে কোন শব্দের স্বাভাবিক অবস্থাকে পরিবর্তন করার উদাহরণ। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একথাটি যা কুরআন হুবহু নকল করেছে ঃ

قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ - اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ -
فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّلِّى اِلَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ - الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ -
وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ - وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ -
وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنَ - وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ
يَوْمَ الدِّيْنِ -

(ইবরাহীম (আ) বললো ঃ তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ, তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ? বিশ্ব প্রতিপালক ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন। যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। তিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন আবার তিনিই পুনরুজ্জীবিত করবেন। আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন।

(সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ৭৫-৮২)

উল্লেখিত আয়াতে 'ইয়াহ্‌দিনি' يَهْدِيْنِ 'ইয়াসকিনি' يَسْقِيْنِ 'ইয়াশফিনি' يَشْفِيْنِ এবং 'ইউহ্‌ঈনি' يُحْيِيْنِ শব্দের শেষ থেকে উত্তম পুরুষের 'ইয়া' (ی) -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। কারণ 'তা'বুদুনা' تَعْبُدُوْنَ ও 'আল আকদামুনা' الاقدَمُوْنَ শব্দদ্বয়ের মতো 'নুন' (ن) -এর মিত্রাক্ষর বহাল রাখার জন্য।

এমনিভাবে নিচের আয়াত ক'টিতেও 'ইয়া' কে বিলুপ্ত করা হয়েছে ঃ

وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ - وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ - وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ - هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ -

শপথ ফজরের, শপথ দশ রাতে, শপথ তার যা জোড় ও বেজোড় এবং শপথ রাতের যখন তা গত হতে থাকে। এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য। (সূরা আল-ফজর ঃ ১-৫)

উল্লেখিত আয়াতে 'ইয়াসরী' (يَسْرِى) শব্দের 'ইয়া' (ی) কে এজন্য বিলুপ্ত করা হয়েছে, যেন 'আল-ফাজরি' (اَلْفَجْرِ) 'আশরীন' (عَشْرٍ) 'ওয়াল বিতরি' (وَالْوِتْرِ) ইত্যাদি শব্দসমূহের সাথে মিল থাকে।

নিচের আয়াতগুলোও এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَىْءٍ نُّكُرٍ - خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَحْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ - مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ط يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ-

অতএব তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে। তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে, যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফিররা বলবে ঃ এটি কঠিন দিন।

এ আয়াতে 'আদ দায়ি' (الدَّاعِ) শব্দের শেষ থেকে যদি 'ইয়া' (ی) কে বিলুপ্ত করা না হতো তবে মনে হতো এ পংক্তিতে ছন্দপতন ঘটেছে। আর এ ত্রুটি কারো নজর এড়াত না। তেমনিভাবে নিচের আয়াতটি লক্ষ্য করুন ঃ

ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّ عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا -

(মূসা বললেন ঃ) আমরাতো এ জায়গাটিই খুঁজছিলাম। অতপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললো। (সূরা আল-কাহফ ঃ ৬৪)

এ আয়াতেও যদি نَبْغِ শব্দটি এভাবে نَبْغِي. লিখা হতো তবে মিলের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হতো।

তদ্রূপ যদি নিচের আয়াতগুলো থেকে আসল 'ইয়া' এবং উত্তম পুরুষের 'ইয়া' (ى) -এর শেষ থেকে বিরতিসূচক 'হা' (ه) কে বিলোপ করা হয় তবে অবশ্যই ছন্দ পতন ঘটবে।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ - فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ - وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ - نَارٌ حَامِيَةٌ -

আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার ঠিকানা হাবিয়া। তুমি কি জানো তা কি ? তা হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন। (সূরা আল ক্বারিয়া ঃ ৮-১১)

নিচের আয়াতটিও লক্ষ্য করুন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ - اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ - فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ -

অতপর যার আমলনামা ডানহাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসেবের মুখোমুখি হতে হবে। অতপর সে সুখ-স্বাছন্দে জীবন যাপন করবে। (সূরা হাক্কাহ ঃ ১৯-২১)

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ শব্দের সাধারণ অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন করা হয়নি বটে কিন্তু কৌশলী বিন্যাসে তা হয়ে উঠেছে ছন্দময়। যদি সেই বিন্যাসে সামান্যতম হেরফের করা হয় তবে ছন্দের মিল আর অবশিষ্ট থাকে না। নষ্ট হয়ে যায় সুর ব্যঞ্জনা।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا - اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا - قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا - وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا -

এটি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে নিভৃতে আহ্বান করেছিল এবং বলেছিল ঃ হে আমার রব্ব! আমার অস্থি বয়স ভারাবনত হয়েছে। বার্ধক্যে মাথা সুশুভ্র হয়েছে কিন্তু আপনাকে ডেকে কখনো বিমুখ হইনি। (সূরা মারইয়াম ঃ ২-৪)

ওপরের আয়াতে যদি শুধুমাত্র 'মিন্নী' مِنِّيْ শব্দটিকে পরিবর্তন করে 'আল আজমু' الْعَظْمُ শব্দের পূর্বে এনে এভাবে বলা হয় যে, قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ مِنِّي الْعَظْمُ তবে স্পষ্টতই বুঝা যায় উক্ত বাক্যে ছন্দ বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র ছন্দ ও মাত্রা ঠিক রাখার জন্যই 'মিন্নী' مِنِّي শব্দটিকে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে। এবার দেখুন কতো সুন্দর মিল দেয়া হয়েছে। বাক্যের প্রথম দিকে বলা হয়েছে ঃ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ এবং তারপরই বলা হয়েছে ঃ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, আয়াতের ভেতর সুর ও ছন্দ এতো সূক্ষ্ম, শুধু অনুধাবন করা যায় কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। আগেও আমরা এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করেছি। এ ধরনের সুর ও তাল একক শব্দ সমষ্টি কিংবা একই বাক্যের বিন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা অনুধাবন করতে হলে একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েই সম্ভব, অন্য কোনভাবে নয়।

উপরোক্ত আলোচনা একথারই ইঙ্গিত করে যে, আল-কুরআনের বর্ণনা রীতিতে সুর ও ছন্দের ভিত্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে হয়। তা এতো স্পর্শকাতর যে, শাব্দিক সাধারণ বিন্যাসের ব্যতিক্রম হলেই ছন্দপতন ঘটে যায়। অথচ তা কবিতা বা কাব্য নয়। এমনকি তা কাব্যের নিয়ম-নীতি মেনে চলতেও বাধ্য নয়। কিন্তু মানুষ একে এমনভাবে সাজানো ও বিন্যাসিত দেখতে পায়, যে কারণে তারা একে কাব্য না বলে কি যে বলবে তাও ভেবে পায় না।

বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল

সুর ও ছন্দের মতো বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিলের কয়েকটি প্রকার আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিলের সেই প্রকারগুলোর কোন নিয়ম-নীতি আছে কি ? এবং তা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে আবর্তিত হয় কি ?

এর উত্তর হচ্ছে— যখন একথা প্রমাণিত হয়েছে, আল-কুরআনে সুর ও ছন্দ বিদ্যমান। তাই আমরা এ প্রশ্নের জবাব সুর ও ছন্দের নিয়মানুযায়ীই দেয়ার চেষ্টা করবো। বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিলের ধরন বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন রকমের। অনেক সময় একই সূরায়ও একাধিক নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। বিভিন্ন সূরার বাক্যান্তে বিরতির যেসব পার্থক্য পাওয়া যায় তা বাক্য ছোট, বড় কিংবা মধ্যম হওয়ার উপর নির্ভর করে। এর স্বরূপ সেই রূপ, যেরূপ কবিতার একই পঙক্তিতে কোন লাইন ছোট, আবার কোন লাইন বড় হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে শেষ যে কথা বলা যেতে পারে, তা হচ্ছে ছোট সূরার আয়াতান্তে বিরতিও স্বল্প। আর মাঝারি ধরনের আয়াতে বিরতি মধ্যম এবং বড় ধরনের আয়াতে বিরতি (মোটামোটি) দীর্ঘ। আর যদি অন্তমিলের দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখা যায়, ছোট সূরাগুলোতে ছন্দের সাথে উদাহরণগুলো বেশ ঘনিষ্ঠ আবার বড় সূরাগুলোতে তাদের ঘনিষ্ঠতা কম। আল-কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে যে অন্তমিল পাওয়া যায় এবং যেগুলোর ব্যবহার অত্যধিক তা হচ্ছে, 'নূন' (ن) 'মীম' (م) এবং তার পূর্বে 'ওয়াও' (و) অথবা 'ইয়া' (ى)। উদ্দেশ্য সুর ও ছন্দের মতো এখানেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা।

এখন আরেকটি কথা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা হচ্ছে একই অবস্থায় বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিলের পার্থক্য কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ? এর জবাব হচ্ছে— যে কথার উদাহরণ আমরা কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় পেয়ে থাকি, তা শুধুমাত্র বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়; বরং তার কিছু উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে। অনেক জায়গায় এ বৈচিত্র্যের কারণ আমরা উপলব্ধি করতে পারি আবার অনেক জায়গায় আমরা তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই। যে জায়গায় আমরা ব্যর্থ হই সে জায়গায় আমরা প্রচলিত রীতি-নীতি রক্ষা করে একথা প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থ প্রয়াস পাই যে, এ পদ্ধতিও চিত্রায়ণ, কল্পনা ও রূপায়ণের মতো একটি পদ্ধতি মাত্র।

যে সমস্ত জায়গায় আমরা বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিলের রহস্য বুঝতে পারি তার মধ্যে সূরা মারইয়াম একটি। চিন্তা করুন এ সূরা শুরু হয়েছে হযরত জাকারিয়া (আ) ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর ঘটনা দিয়ে। তারপর তার সাথে হযরত মারইয়াম ও ঈসা (আ)-এর ঘটনাটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ সূরায় বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল নিম্নরূপ। যা সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا - اِذْنَادٰى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا - قَالَ رَبِّ اِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا - وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا -

এটি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা জাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। সে বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি বয়সে ভারাবনত হয়েছে, বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে, হে আমার পালনকর্তা। আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিমুখ হইনি। (সূরা মারইয়াম ঃ ২-৪)

তারপর মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

وَاذْكُرْ فِىْ الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا - فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا - قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا -

এ কিভাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করো, যখন সে পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করলো। মারইয়াম বললো ঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি, যদি তুমি আল্লাহ্ ভীরু হও। (সূরা মারইয়াম ঃ ১৬-১৮)

হযরত জাকারিয়া (আ) ও হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষর বা হরফে-রাবী (حرف روى) একই বর্ণের মাধ্যমে সমাপ্তি করা হয়েছে। আবার যেখানে হযরত ঈসা (আ)-এর ঘটনা শেষ করা হয়েছে সেখানে এ পদ্ধতির কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ط اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا لا وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَاكُنْتُ ص وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا - وَّبَرًّا ۢ بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا - وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا -

(সন্তান বললো ঃ) আমিতো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতোদিন জীবিত থাকি, ততোদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে এবং জননীর অনুগত থাকতে। আর আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি, আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবো। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩০-৩৩)

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ - مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لا سُبْحٰنَهٗ ط اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ - فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

এ-ই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্য কথা, যে সম্পর্কে লোক সন্দেহ করে। আল্লাহ্ এমন নয় যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, 'তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন ঃ হও, আর অমনি তা হয়ে যায়। সে আরো বললো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদাত করো, এটি সরল পথ। অতপর তাদের মধ্যে প্রতিটি দল পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করলো। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের জন্য ধ্বংস।

(সূরা মারইয়াম ঃ ৩৪-৩৭)

ওপরের আয়াতগুলো আপনি নিরীক্ষণ করে দেখুন শেষ আয়াতের বিরতির

মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এবং তার মধ্যে দীর্ঘতা সৃষ্টি হয়েছে। এমনিভাবে অন্তমিলের সিস্টেমেও পরিবর্তন সুস্পষ্ট। শেষাক্ষরে 'নুন' অথবা 'মীম' নেয়া হয়েছে এবং তাদের পূর্বাক্ষরে 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' নেয়া হয়েছে। এমন মনে হয় যে, কিছুপূর্বে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল এবং এখন তার সমাপ্তি বর্ণনা করা হচ্ছে, যা স্বয়ং ঐ কাহিনী থেকে নেয়া।

আমরা একথার সত্যতা প্রমাণের জন্য আরো প্রমাণ উপস্থাপন করছি— যেখানে ঐ ঘটনার সমাপ্তি হয়েছে সেখানে বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল প্রথম রীতির দিকে ফিরে আসে। তা এজন্য যে, যেন পুনরায় নতুন ঘটনাবলীর দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يُوْمٍ عَظِيْمٍ - اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ لا يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

অতপর তাদের ভেতরের দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করলো। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের জন্য ধ্বংস। সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ জালিমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে। তুমি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও। যখন সকল ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না।

(সূরা মারইয়াম ঃ ৩৭-৩৯)

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ - وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ط اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا - اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا - يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا - يٰۤاَبَتِ لَاتَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا -

يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا –

আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকার হবো পৃথিবীর এবং তার ওপর যা আছে তার। আর আমার কাছেই তাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। তুমি এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা শুনিয়ে দাও। নিশ্চয়ই সে ছিল সত্যবাদী নবী। যখন সে তার পিতাকে বললো ঃ হে আমার পিতা, যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত করো কেন ? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে। অতপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।

সূরা নাবা'র শুরু 'নূন' (ن) এবং 'মীম' (م)-এর অন্তমিল ব্যবহার করে। যেমন ঃ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ – عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ – ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ –كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ –

তারা পরস্পর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? মহাসংবাদ সম্পর্কে, যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে, না সহসাই তারা জানতে পারবে। অতপর না, অতি সত্ত্বর তারা জানতে পারবে। (সূরা আন-নাবা ঃ ১-৫)

যেখানে এ বর্ণনা শেষ হয়েছে এবং তার পরিবর্তে তর্ক-বিতর্কের স্টাইলে আলোচনা শুরু হয়েছে, তো হঠাৎ নিয়ম পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَٰدًا – وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا – وَخَلَقْنَٰكُمْ أَزْوَٰجًا – وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا – وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا – وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا –

আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে পেরেক ? আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী, রাতকে করেছি আবরণ। দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়।

সূরা আলে-ইমরানের পুরো সূরাটিতেই 'নুন' এবং 'মীম'-এর অন্তমিল বিদ্যমান। যা আল-কুরআনের সাধারণ একটি রীতি। যখন সূরা সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং একদল ঈমানদারের দো'আর প্রসঙ্গ এসেছে, তখন অন্তমিলের স্টাইলও পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেমন ঃ

رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ-

(ঈমানদারগণ বলে ঃ) হে পরওয়ারদিগার! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল পবিত্রতা আপনার। আমাদেরকে আপনি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিন। হে প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেন তাকে অপমানিত করে ছাড়লেন। আর জালিমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯১-১৯২)

বাক্যান্তে বিরতি ও অন্তমিল পরিবর্তনের এ ধারা আল-কুরআনের অনেক জায়গায়ই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সকল জায়গায় পরিবর্তনের রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা বলতে পারি না। পরিবর্তনের যে ক'টি ধারা সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল সে সম্পর্কে আমি ইঙ্গিত দিলাম। এ প্রসঙ্গে যতোটুকু আলোচনা করা হয়েছে আমার মতে তা-ই যথেষ্ট।

একটি কথা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা হচ্ছে আল-কুরআনের সুর ও ছন্দের রীতি-নীতি আলোচ্য বিষয় ও স্থানের (موقع ومحل) পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে যায়। তবু আমরা একথা জোর দিয়ে বলতে পারি, কুরআনের সুর ও ছন্দ একটি বিশেষ নিয়মের অধীন। সর্বদা তা বাক্য ও তার পরিধির অনুরূপ হয়ে থাকে। এটি এমন এক নীতি যার কোন ব্যতিক্রম ব্যত্যয় ঘটে না। সুর ও ছন্দের প্রকার ও বিশ্লেষণের জন্য তার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও পরিভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া তার আলোচনা সম্ভবপর নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে পাঠকদের যেমন পরিভাষাগত জ্ঞানের অভাব আছে তদ্রূপ আমারও। কিন্তু আমি মনে করি, যদি সুর ও ছন্দের ধরন ও সেই সম্পর্কে মৌলিক কিছু আলোচনা করে দেয়া যায়, তাতেই আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে।

সূরা আন-নাযিয়াতে সুর ও ছন্দের দুটো নীতি আছে যা এ সূরায় পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথম নিয়মটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়। সূরার এ অংশটি ছোট ছোট কিছু বাক্যের সমাহার। এ সমস্ত বাক্যে মৃত্যু ও কিয়ামতের ধারা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেখানে দ্রুত এবং বলিষ্ঠ তৎপরতা পাওয়া যায়।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا - وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا - وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا -
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا - فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا - يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ -
تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ - قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ -

শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, শপথ তাদের যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে, শপথ তাদের যারা সন্তরণ করে দ্রুত গতিতে, শপথ তাদের যারা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় এবং শপথ তাদের যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। কিয়ামত অবশ্যই হবে। যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পনকারী। অতপর আসবে পশ্চাতগামী। সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে। (সূরা আন-নাযিয়াত ঃ ১-৮)

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ - يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ط ءَاِذَا
كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ط قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ -

তাদের দৃষ্টি অবনত হবে। তারা বলে ঃ আমরা কি উল্টো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবোই, গলিত অস্থি হয়ে যাবার পরও ? তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে। (সূরা আন-নাযিয়াত ঃ ৯-১১)

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ - فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -

অতএব তা হচ্ছে এক মহানিনাদ। তখনই তারা ময়দানে উপস্থিত হবে। (সূরা আন-নাযিয়াত ঃ ১৩-১৪)

সুর ও ছন্দের দ্বিতীয় প্রকার পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতগুলো। এ আয়াতগুলো মন্থর, ধীরগতিসম্পন্ন এবং দীর্ঘতার দিকে মধ্যমাকৃতির। এ সমস্ত আয়াতের সম্পর্ক ঐ সমস্ত আয়াতের মতো যেখানে কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ) সংক্রান্ত যে সমস্ত আলোচনা এসেছে এ আয়াত ক'টি তারই অংশ বিশেষ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى - اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى -
اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى - فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى -

وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى –

মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌছেছে কি? যখন তার রব্ব তাকে তুর উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন, (এবং বলেছিলেন) ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করছে। অতপর বলো ঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি ? আমি তোমাকে তোমার রব্ব-এর দিকে পথ দেখাব, যেন তুমি তাকে ভয় করো। (সূরা আন-নাযিয়াত ঃ ১৫-১৯)

আমি ওপরে দু' ধরনের সুর ও ছন্দের আলোচনা করলাম। আমার মনে হয়, এ দু' প্রকারের পার্থক্য ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। দুটোর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। উপরন্তু উভয়টির আলোচনাস্থলও এক এবং অভিন্ন। উভয়স্থান সুর ও ছন্দ স্বকীয়তায় ভাস্বর।

আসুন এবার আমরা সুর ও ছন্দের তৃতীয় প্রকার নিয়ে কিছু আলোচনা করি। এ প্রকারের সুর ও ছন্দ বিশেষ করে দো'আর বাক্যসমূহে পাওয়া যায়। এবং সেখানে নরম সুরে হৃদয়ের আবেগকে তুলে ধরা হয়। অবশ্য এ ধরনের আয়াতগুলো কিছুটা দীর্ঘ। যেমন ঃ

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ – رَبَّنَا
اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ –
رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ق
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ –
رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ – (ال عمران : ١٩١-١٩٤)

(তারা বলে ঃ) হে পরওয়ারদিগার! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল পবিত্রতা আপনার, আমাদেরকে আপনি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচান। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আপনি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলেন তাকে অপমানিত করে ছাড়লেন। আর জালিমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে। (এই বলে যে,)

'তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনো' তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে প্রভু! তাই আমাদের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিন এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দিন নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দিন— যা আপনি ওয়াদা করেছেন আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে আপনি অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার।

অন্য এক দো'আয় বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ
عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ - رَبِّ
اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ - رَبَّنَا
اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনিতো জানেন যা আমরা গোপনে করি এবং প্রকাশ্যে করি। আল্লাহ্র কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নেই, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দো'আ শ্রবণ করেন। হে আমার প্রতিপালক আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে মাফ করুন, যেদিন হিসেব-নিকেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

(সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৮-৪০)

সুর ও ছন্দের আগের দুটো ধরনের ব্যতিক্রম এবারের ধরনটি, একথা প্রমাণের জন্য সুর ও ছন্দের কায়দা-কানুন ও তার পরিভাষাগুলো আয়ত্ত করতে হবে এমন নয়। এটি হৃদয় নিঃসৃত এক ঝংকার যা উঁচু-নীচু সুর তরঙ্গে দো'আয় রূপ নিয়েছে।

আমি সুর ও ছন্দের আর একটি ধরন নিয়ে আলোচনার সাহস দেখাব। এ সুর ও ছন্দের দুলায়িত উর্মিমালা এবং তার সুরলহরী বড় দীর্ঘ। এর প্রকৃতি ওপরে আলোচিত প্রকৃতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আমি পুরো আস্থার সাথেই একথা বলতে পারি যে, এর মধ্যে এবং পূর্বে আলোচিত সুর ও ছন্দের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া যায় তা দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট।

আমি সুর ও ছন্দের যে প্রকৃতির কথা বলতে চাচ্ছি, সেখানে উর্মিমালার সাথে সাথে গভীরতা ও প্রশস্ততাও পাওয়া যাবে। অধিকন্তু ভয় এবং বিভিষিকাও বিদ্যমান। কেননা এ সুর ও ছন্দ হচ্ছে ঝড়ের, প্লাবনের। চিন্তা করুন ঃ

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوْحُ نِ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ - قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ط قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ج وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ -

আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চললো পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার সাথে। আর নূহ তার পুত্রকে ডাক দিলো (কারণ) সে সরে রয়েছিল। সে বললো ঃ হে বেটা! তুমি আমাদের সাথে আরোহণ করো, এবং কাফিরদের সাথে থেকো না। পুত্র বললো ঃ আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ্ বললো ঃ আজকের দিনে আল্লাহ্র হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল। ফলে সে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

(সূরা হুদ ঃ ৪২-৪৩)

ঝড় ও প্লাবন যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার সাথে গভীর সাদৃশ্য সৃষ্টির জন্য এ আয়াতে সুর-তরঙ্গের যে অবতারণা করা হয়েছে, ঢেউয়ের মতো দীর্ঘ এবং সদা দুদুল্যমান, কখনো উঁচু এবং কখনো নিচু। এ আয়াতে শব্দ বিন্যাসের যে ধারা পাওয়া যায় তা ঝড়-বন্যা পরিবেষ্টিত বিভিষিকাময় দৃশ্যের সাথে পুরোপুরি সঙ্গত এক চিত্র।

আমরা আরেকটু ধৃষ্ঠতা দেখিয়ে সুর-তরঙ্গের আরেকটি ছন্দায়িত ধরন সম্পর্কে আলোচনা করবো। কিন্তু এটি ওপরের উদাহরণের মতো এতো বেশি মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ - وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ -

হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার রব্ব-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করো সন্তুষ্ট ও স্নেহভাজন হয়ে। অতপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। (সূরা আল-ফজর ঃ ২৭-৩০)

যখন পাঠক উচ্চস্বরে এ আয়াত পাঠ করে তখন এর কোমল সুর তরঙ্গ অনুভূত হয়। এ আয়াতে যে সুর-তরঙ্গ পাওয়া যায় তা ঐ তরঙ্গের মতো যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ঐ আয়াতে প্রাপ্ত সুর-তরঙ্গ — মৃদু ও তীব্র— উভয় অবস্থাই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। ইয়া'র প্রথম আলিফের আওয়াজ যখন উচ্চস্বরে পৌঁছে এবং 'আইয়্যু'কে অপেক্ষাকৃত নিচু আওয়াজে পড়া হয় তখন সেখানে এক ধরনের সুর-তরঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শুধু একথার দ্বারা সুর-তরঙ্গের সে সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হবে না। কেননা সেখানে তো শুধু মাত্রার (وزن) মধ্যে সমতা সৃষ্টি হয়, স্বরের মধ্যে নয়। তাই সেখান থেকে সঙ্গীতের সুর অবশ্যই প্রভাবিত হয়। প্রবেশরত রূহের ওপর কোন প্রভাব পড়ে না, প্রবেশরত রূহের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে ঐ বৈশিষ্ট্যের সাথে যা শব্দসমূহের স্বর ও ধ্বনির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর সন্ধান শুধু ঐ ব্যক্তি লাভ করতে পারে যে চোখ-কান খুলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কুরআন পাঠ করে।

আমরা এ প্রসঙ্গের এখানেই যবনিকা টানলাম। যেন সুর-তরঙ্গের অথৈ সাগরে আর হাবু-ডুবু খেতে না হয়।

কুরআনী চিত্রের উপাদান

আল-কুরআনের চিত্রায়ণ পদ্ধতিতে যে শৈল্পিক বিন্যাস দেখা যায়, এবার আমরা তার আরেকটি দিক নিয়ে আলোচনা করবো। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কুরআন বিভিন্ন ঘটনাবলীকে দৃশ্যাকারে ও চিত্রাকারে বর্ণনা করে। এজন্য আমরা বলতে চাই, যখন ঐ সমস্ত চিত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ একত্রিত হয়ে যায় তখন তার শৈল্পিক বিন্যাস সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে।

১. চিত্রে একটি থিম থাকা।

২. স্থান কাল ও পাত্র চিত্রের অনুরূপ হওয়া।

৩. চিত্রের সমস্ত অংশ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।

৪. যে কাগজ বা কাপড়ের টুকরোতে চিত্রাংকন করা হবে তার প্রতিটি অংশ চিত্রের অংশানুপাতে ভাগ করা।

আমরা 'শৈল্পিক চিত্র' অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে কিছু ইঙ্গিত করেছি। যেখানে আমরা নাম-যশের জন্য ধন-সম্পদ খরচ করার চিত্রটি উপস্থাপন করেছি। সাথে ঐ পাথরটির ছবিও, যার ওপর মাটির হাল্কা আবরণ পড়েছে। সেই সমস্ত লোকের চিত্রের পাশাপাশি তাদের চিত্রও অংকনের চেষ্টা করা হয়েছে যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মাল-সম্পদ দান করে। আর ঐ বাগানের ছবিও আমরা দেখিয়েছি, যা একটি টিলার ওপর অবস্থিত। আমরা সেখানে বলেছি, ঐ সমস্ত চিত্রের অংশ এবং তার আনুষাঙ্গিক বিষয়াদিতে কী পরিমাণ ভারসাম্য পাওয়া যায়।

আমরা এখন আল-কুরআনের শৈল্পিক বিন্যাসের যে দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তা হচ্ছে বিন্যাসের উপায়-উপকরণ। অন্য কথায় বলা যায় এটি হবে সেই তালার চাবি স্বরূপ।

আমাদের দৃষ্টিতে আল-কুরআনের বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ এ বিষয়ে যে কথাটি অত্যন্ত জরুরী তা 'ওয়াহ্‌দাতে নক্‌শ' (ছবির একক)। চিত্রকর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রাখেন এমন একজন ব্যক্তিও বুঝতে পারেন যে, 'ওয়াহ্‌দাতে নক্‌শ' কী ? আমরা শুধু একথা বলেই শেষ করতে চাই

যে, এটি চিত্রকর্মের মৌলিক ও বুনিয়াদী নিয়মের অন্যতম একটি নিয়ম। যেন এক অংশ আরেক অংশের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

দুই ঃ দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে, যে কাগজ কিংবা কাপড়ের টুকরোতে ছবি আঁকা হয় সেখানে ছবির প্রয়োজন অনুসারে তার অংশসমূহ ভাগ করে নেয়া। যেন ছবি আঁকায় কোনরূপ সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

তিন ঃ তৃতীয় বস্তু হচ্ছে, ঐ রং যা দিয়ে চিত্রকে আকৃতি প্রদান হয় এবং যার মাধ্যমে সৌন্দর্য পুরোমাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং চিন্তা ও বিষয়বস্তুর সম্মিলন ঘটায়।

রঙের মাধ্যমে যে ছবি আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তার মধ্যে মিল বা অনুকূল তা এতো বেশি প্রয়োজন, যেমন সিনেমা ও থিয়েটারে প্রদর্শনীর জন্য হয়ে থাকে। কুরআনী ছবির ভিত্তিও একই জিনিসের ওপর স্থাপিত। যদিও তা শুধুমাত্র শব্দ বা বর্ণ সমষ্টির মাধ্যমে আঁকা হয়। ছবি আঁকার অন্য কোন উপদান সেখানে থাকে না। তবু কুরআনী চিত্রের চমক ও অলৌকিকত্ব ঐসব চিত্রের উর্ধ্বে যা রং-তুলির সাহায্যে ক্যানভাসে আঁকা হয়।

১. আল-কুরআনের ছোট সূরাসমূহের মধ্যে যে সূরা সম্পর্কে কিছু লোকের ধারণা এটি যাদুকরদের যাদুটোনা সম্পর্কিত সূরা। সেই সূরা ফালাক সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। প্রশ্ন হতে পারে, এ সূরাটি কখন পাঠ করা হয় ? স্বভাবতই দেখা যায় এটি আশ্রয় প্রার্থনার মুহূর্তে তিলাওয়াত করা হয়। এ সময় ভয়, নিন্দুকের নিন্দা, কিংবা অজানা আশংকা জেগে উঠে। শুনুন এবং চিন্তা করে দেখুন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ - وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ - وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ -

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সূরা আল-ফালাক ঃ ১-৫)

একটু চিন্তা করুন, 'ফালাক' (فَلَق) কী ? যার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা জরুরী হয়ে পড়ে। অনেকগুলো অর্থের মধ্যে আমরা 'প্রভাত' অর্থটি নির্বাচন করেছি। কেননা অন্ধকারকে একমাত্র 'প্রভাত'ই বিদীর্ণ করে দেয়। তাই প্রভাত অর্থ গ্রহণ করাই এখানে সমীচীন। কারণ, এখানে বিশেষ

ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। যার যৌক্তিকতা আমরা সামনে অগ্রসর হলে বুঝতে পারবো।

এ সূরায় সমস্ত সৃষ্টি থেকে প্রভাতের পালনকর্তার নিকট আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে। 'মা খালাকা' (مَاخَلَقَ) শব্দের 'মা' (مَا) অক্ষরটি মাওসূলার অর্থ প্রদান করেছে অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি। মনে হয় সমস্ত সৃষ্টি অন্ধকারের গভীরে নিমজ্জিত। وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ —"যখন রাতের আঁধার সবকিছুকে ঢেকে নেয় তখন এক ধরনের ভীতিকর অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়।"

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ —'যাদুকর মহিলাদের অনিষ্ট হতে যা তারা গ্রন্থিতে ফুঁক দিয়ে করে থাকে।' যাদুকর মহিলাদের গ্রন্থিতে ফুঁক দেয়ার ঘটনা গোটা পরিবেশকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলে। কারণ ফুঁকের মাধ্যমে যাদু অধিকাংশ সময় রাতের আঁধারে সংঘটিত হয়ে থাকে। مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ হাসাদ বা হিংসা এক গোপনীয় কাজের নাম, যা মানুষের মনের অন্ধকার কুঠুরীতে লুকিয়ে থাকে। এ অর্থে হিংসাও এক ধরনের ক্ষতিকর এবং ভয়ংকর কাজ। এখানে অন্ধকার, ভয় ও আতংক ইত্যাদি কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আশ্রয় প্রার্থনাকারী ঐ সকল অন্ধকার থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসতে চায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্‌তো সবকিছুর প্রতিপালক তবে নির্দিষ্ট করে 'রাব্বিল ফালাক' বা প্রভাতের প্রতিপালক বলার সার্থকতা কি ? এর উত্তর হচ্ছে, সৌন্দর্য সৃষ্টি ও স্থান-কালের সাথে অনুকূলতা সৃষ্টির জন্য এরূপ করা হয়েছে। তবে সাধারণ জ্ঞানের দাবি ছিল, অন্ধকার থেকে 'রাব্বিন নূর' বা আলোর প্রভুর কাছে আশ্রয় চাওয়া। কিন্তু এ চিন্তা ঠিক নয়, কারণ এখানে যে জিনিসকে দেখা গেছে তা স্পর্শকাতর ও রহস্যময় এক ছবি। যা আলোর পরশে বিলীন হয়ে যায়। আলো সবকিছুকে স্পষ্ট করে দেয়। যদি অন্ধকারের বিপরীতে আলো বা 'নূর' (نور) শব্দ ব্যবহার করা হতো তবে তা গ্রন্থিতে ফুঁক দেয়া ও হিংসা শব্দদ্বয়ের সাথে খাপ খেতো না। তাই তার পরিবর্তে 'ফালাক' শব্দটি দিয়ে সামঞ্জস্য সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়েছে। যা প্রকারান্তরে আলোর কথাই বুঝিয়ে থাকে। 'ফালাক'-এর সময়টি প্রভাতের উজ্জ্বলতার পূর্বে আসে যখন আলো-আঁধারী ভাব বিরাজমান থাকে। সে সময়টি অস্পষ্ট ও রোমাঞ্চকরও বটে।

প্রশ্ন হতে পারে, এখানে কি কি বস্তুর সমন্বয়ে চিত্র অংকিত হয়েছে ?

উত্তর হচ্ছে, যদি 'ফালাক' (الفلق) ও 'আল গাসিক' (الغاسق) শব্দ দুটোকে লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে এ হচ্ছে প্রকৃতিগত দুটো চিত্র এবং যদি النّفّثت।

فِى الْعُقَدِ ও حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ নিয়ে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে, এ দু'টো দল আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ।

আর যদি 'ফালাক' ও 'গাছিকিন' শব্দ দুটোকে পৃথক পৃথক করে দেখা হয় তবে সেখানে দুটো চিত্রই প্রতিভাত হয়ে উঠে। সময়ের বিচারে একটি আরেকটির বিপরীত। অর্থাৎ 'ফালাক' অর্থ প্রভাত আর 'গাসিকিন' অর্থ রাত। তদ্রূপ 'আন্ নাফ্‌ফাসাত' (النفثت) এবং 'আল হাসিদ' (الحاسد) শব্দ দুটোও মানুষের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের দু'টো দল। দেখা যাচ্ছে ছবির সব ক'টি উপাদান ক্যানভাসে পর্যায়ক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে। চিত্রপট বা ক্যানভাসে একে-অপরের মুখোমুখি। সমস্ত অংশের রং-ঢং পর্যন্ত এক ও অভিন্ন। সমস্ত অংশের মধ্যেই ভয়-ভীতি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্ধকার সব কিছুকে গ্রাস করে নিয়েছে। ছবির মূল থিম বিভিন্ন অংশ এবং রঙ সবকিছু একই কেন্দ্রে কেন্দ্রিভূত।

এ আলোচনায় প্রচলিত কোন রীতি-নীতির সাহায্য নেয়া হয়নি এবং এ চিত্রে যে অনুপম সৌন্দর্য পাওয়া যায়, কালের পরিক্রমণে তা ম্লান হবার মতো নয়। কারণ, এখানে কয়েকটি শব্দ এবং চিন্তার বৈপরিত্যের প্রশ্ন নয়। চিত্রের ক্যানভাস, স্থানের বিস্তৃতি ও পরিধি, তার মিল ও ধারাবাহিকতা এবং ছবির থিম যা ছবি আঁকার জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন শুধু শব্দ ও বর্ণনা ঐ সমস্ত উদ্দেশ্যকে পুরো করে দেয় তখন তা অলৌকিক এক ছবির রূপ নেয়।

২. কুরআন মজীদ অনাবাদী ও শুষ্ক জমিনকে এক জায়গায় 'হামিদাতান' حَامِدَةً (মৃত-পতিত) এবং অপর জায়গায় 'খাশিয়াতান' خَاشِعَةً (ঝুঁকে পড়া) বলেছে। অনেকেই মনে করেন, ভাষাকে মাধুর্য করে তুলার জন্য পৃথক দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এবার দেখুন, এ দুটো শব্দ কোন্ প্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

'হামিদাতান' (حَامِدَةً) শব্দটি এসেছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ
يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ

عِلْمٍ شَيْئًا ط وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ -

হে লোক সকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করো তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছে রেখে দেই, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় (সেখান থেকে) বের করি। তারপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো, তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে এবং কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দেই। তখন সে জানার পরও জ্ঞাত বিষয়ে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে মৃত দেখতে পাও, অতপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায়। এবং সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫)

'খাশিয়াতান' (خَاشِعَةً) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -
فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ
لَايَسْئَمُوْنَ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ -

তাঁর নিদর্শণসমূহের মধ্যে আছে দিন, রাত, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকে না, আল্লাহ্‌কে সিজদা করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে তাঁরই ইবাদত করো। অতপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা তোমার পালনকর্তার নিকট আছে, তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে কখনো ক্লান্ত হয় না। তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অবনত হয়ে (অনুর্বর) পড়ে আছে। অতপর যখন আমি তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে উঠে। (সূরা হা-মীম আস-সিজদাহ ঃ ৩৭-৩৯)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে 'হামিদাতান' (هَامِدَةً) এবং 'খাশিয়াতান' (خَاشِعَةً) শব্দ দুটোর পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রথম আয়াতে জীবন, জীবনের রূপান্তর ও পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই সেখানে সেগুলোর সাথে সাম স্য রেখে 'হামিদাতান' বা মৃত বলা হয়েছে। আবার মানুষকে যেভাবে পুনরুত্থান ঘটাবেন ঠিক সেইভাবে তিনি জমিনকে পুনরুজ্জীবিত করেন, ফলে সে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে ইবাদত, নম্রতার সাথে আনুগত্য ও সিজদার কথা বলা হয়েছে, তাই সেখানে জমিনকে 'খাশিয়াতান' বা বিনয়ে মস্তক অবনত বলে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জমিন পানির মুখাপেক্ষী হয়ে অধমুখে আল্লাহ্র পানির প্রতীক্ষা করতে থাকে, যখন পানি পায় তখন তা ফুলে-ফেঁপে উঠে। একথা বলার পর পূর্বোক্ত আয়াতের মতো ফল-ফসল উৎপন্নের কথা বলা হয়নি। কেননা ইবাদত ও সিজদার সাথে ফল-ফসল উৎপন্নের কথাটি অসুন্দর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই এ আয়াতে اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ (সতেজ ও স্ফীত) শব্দ দুটো সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, যে অর্থে পূর্বের আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শুধু এজন্যই শব্দ দুটো ব্যবহার করা হয়েছে, যেন জমিনের নড়াচড়া প্রমাণিত হয়। কেননা ইতোপূর্বে জমিন নতজানু হয়ে পড়েছিল। এখানে সেই অবস্থার ওপর গতি সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ, এ দৃশ্যে ইবাদতের জন্য সবাই নড়াচড়ার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন করছে, এজন্য এটি সম্ভব ছিল না যে, এখানে জমিন স্থির থাকবে। সে জন্য চলমান এ দৃশ্যে ইবাদতকারীদের সাথে জমিনেরও গতি সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ, ছবিতে সবকিছু চলমান হলে জমিন স্থির থাকবে কেন ? এখানে অতি সূক্ষ্ম এক সৌন্দর্য কিংবা দর্শকের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

'হুমুদুন' (هُمُوْدٌ) এবং 'খুশুয়ুন" (خُشُوْعٌ) শব্দ দুটো অর্থের দিক দিয়ে অভিন্ন। এ দুটো শব্দের অর্থের মধ্যেই পুনরায় জীবন লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। শুধু বর্ণনায় নতুনত্ব আনার জন্য এ দুটো শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কুরআন যেহেতু বক্তব্যের সাথে সাথে শুধু চিন্তার জগতেই নয় বরং মনের মুকুরেও একটি প্রতিচ্ছবি ফেলতে চায় তাই এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যাতে পুরো বক্তব্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র পাওয়া যায় এবং সবগুলোর সমন্বয়ে একটি চিত্রও পূর্ণতা লাভ করে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে শব্দের বিভিন্নতা একথার অকাট্য প্রমাণ বহন করে যে, আল-কুরআনের চিত্রায়ণ পদ্ধতিটি বর্ণনা-বিশ্লেষণের অন্যতম মৌলিক

ভিত্তি। তাছাড়া কুরআন শুধুমাত্র বোধগম্য একটি অর্থ বলে দিয়েই তৃপ্ত নয় বরং অর্থের সাথে সাথে একটি জীবন্ত চিত্রও সে উপস্থাপন করে। এ কারণেই স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে কুরআনের শব্দচয়নেও সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এবার আমরা দেখব ঐ দুটো ছবি এবং তার অসংসমূহের মধ্যে কোন্ ধরনের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। প্রথম চিত্রের ভিন্নতা হচ্ছে তার মধ্যে এমন কতিপয় বস্তুর বর্ণনা করা হয়েছে যা অস্তিত্বহীন ছিল, তাদেরকে আকার-আকৃতি দিয়ে জীবন দান করা হয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে দৃশ্যমান করা হয়েছে। তার অংশের মধ্যে একটি হচ্ছে বীর্য যা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে একটি পর্যায়ে উপনীত হয়। আরেকটি হচ্ছে মৃত জমিন, বৃষ্টির সংস্পর্শে এসে জীবন্ত হয়ে উঠে। আস্তে আস্তে তা ফল-ফসলে ভরে যায়। বস্তুত সবকিছু মিলে যে অবস্থা ও পরিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা জীবনের।

দ্বিতীয় চিত্রের প্রাকৃতিক কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এও বলা যায় যে, কতিপয় প্রাকৃতিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এ চিত্রের অংশগুলো হচ্ছে রাত, দিন, চাঁদ, সূর্য এবং জমিন যারা আল্লাহ্র নিকট আনুগত্যের মস্তক ঝুঁকিয়ে রয়েছে। জমিনের ওপর জীবন্ত দুটো দলকে পাওয়া যায় যাদের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু দৃশ্যত এক। একদল হচ্ছে মানব সমাজ যারা আল্লাহ্র ইবাদত থেকে উদাসীন। অপর দল হচ্ছে ফেরেশতাগণ, যারা রাত-দিন সারাক্ষণ আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল। এ সমস্ত অংশ মিলে যে ছবিটি পরিদৃষ্ট হয় তা ইবাদতের চিত্র। এ চিত্রের বিশাল ক্যানভাসে তার প্রতিটি অংশকেই যথাযথভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

৩. আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঐসব নিয়ামতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক আলোচনায়ই নিয়ামতের এক সার্বিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে এক ধরনের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ দুটো জায়গার উল্লেখ করছি। যেমন ঃ

(৩.ক)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ
الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ
اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ - وَاللّٰهُ
جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ

لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ -

আল্লাহ্ তোমাদের ঘরকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দিয়ে তোমাদের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তোমরা সেগুলোকে সফরকালে এবং বাড়িতে অবস্থানকালেও পাও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরিচুল ও ছাগলের লোম দিয়ে কতো আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সৃজিত বস্তু দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্য আত্মগোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্য পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন। যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম ও বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যেন তোমরা অনুগত হও। (সূরা আন-নাহল ঃ ৮০-৮১)

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ - وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ - وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ - ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয় এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাকো, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তোমার রব্ব মৌমাছিকে

নির্দেশ দিয়েছেন ঃ পাহাড়-পর্বতের গায়ে, বৃক্ষ বা উঁচু ডালে ঘর তৈরী করো। তারপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ করো এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়, তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। এতে নিদর্শন আছে যারা চিন্তাশীল তাদের জন্য। (সূরা আন নাহল ঃ ৬৬-৬৯)

ওপরে আমরা 'ক' ও 'খ'-তে দু' প্রকারের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি। উভয় প্রকারের আয়াতেই ঐসব নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যা আল্লাহ্ বান্দার জন্য দিয়েছেন। এবার আমরা দেখব উভয় প্রকার আয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা, আর যদি থাকে তবে তা কি ধরনের ?

প্রথম আয়াত ক'টিতে (৩. ক) এমন বস্তুর বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে মানুষ আশ্রয় লাভ করে থাকে। অথবা যে ছায়া থেকে উপকৃত হয় কিংবা তা পরে লজ্জা আবৃত করে। যেমন— ঘর, ছায়া, কাপড়-চোপড় এবং এ ধরনের অন্যান্য সামগ্রী। উপরোক্ত আয়াতের মূল বক্তব্য তাই। এ চিত্রে চতুষ্পদ জন্তুর বর্ণনাও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেমন তার চামড়া দিয়ে মানুষ তাঁবু তৈরী করে যা সহজে বহনযোগ্য। পশম দিয়ে চাদর ও অন্যান্য পোশাক তৈরী করা হয়। বস্তুত এ চিত্রে স্থান, চাদর এবং ছায়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াত ক'টিতে (৩. খ) পানীয় তৈরীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন মাদকদ্রব্য (যা ফল থেকে তৈরী করা হয়), দুধ, মধু (যা মৌমাছি থেকে তৈরী হয়) এবং ঐসব জন্তুর বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে মানুষ পানীয় পেয়ে থাকে।

মূলত ওপরে অতি সূক্ষ্ম এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যা কোন সাধারণ চিত্র নয়, এক অসাধারণ চিত্র। দেখুন, মাদক দ্রব্য ফল থেকে তৈরী করা হয়, কিন্তু তার ধরন ও প্রকৃতি ঐ ফল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আবার মধু ফুল থেকেই সংগৃহীত হয় কিন্তু তার সাথে এর কোন সাদৃশ্যতা নেই। দুধ গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয় কিন্তু দুধের প্রকৃতি ও গুণাগুণের সাথে গোবর ও রক্তের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। এ সমস্ত পানীয় অন্য বস্তু থেকে সৃষ্টি। চিন্তা করলে পুরো দৃশ্যেই প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়।

বর্ণিত আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রতার যে সূক্ষ্ম চিত্র প্রতিভাত হয়েছে তার প্রতিটি অংশেই একের সাথে অপরের সাদৃশ্যতা ও সমতা বর্তমান। তার মধ্যে একদিকে যেমন সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। অপরদিকে তা আশ্চর্যের বিষয়ও বটে। এ

ধরনের উপমার সখ্যা কুরআনে নেহায়েত কম নয়। আমরা নিচে আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরছি, যা এ বিষয়ের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ج وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপরে রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে অবশ্যই সে নিজের ক্ষতি ডেকে আনে, আর যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে আল্লাহ্ অচিরেই তাকে মহাপুরষ্কার দানে ধন্য করবেন। (সূরা আল-ফাতাহ ঃ ১০)

এ আয়াতে যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা হচ্ছে হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণের। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِ هِمْ —'আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপরে রয়েছে।' এখানে এক বিশেষ মুহূর্তে যাচাই ও পরখ করা হচ্ছে। কিন্তু 'ইয়াদুল্লাহি' (আল্লাহ্‌র হাত) বলে রূপায়ণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য প্রাসঙ্গিকতা ও বাক্যের সামঞ্জস্যতা বিধান করা। অলংকার শাস্ত্রের ওলামাদের কাছে এর পারিভাষিক নাম হচ্ছে— 'মুরাআতুন নযীর' বা মনোযোগ আকৃষ্টকারী উপমা। কিন্তু অলংকার শাস্ত্রের ওলামাগণ শুধু বাহ্যিক অবস্থার ওপরই দৃষ্টি প্রদান করেন। তাই ছবি তাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। কিন্তু আমরা তাদের সে পরিভাষা ছাড়াও দৃশ্যাংকনে ছন্দ, বিন্যাস এবং থিম এর পুরো সম্মিলন দেখতে পাই। এ সম্মিলন এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে চিত্রের অংশাবলী পুরো দৃশ্যটার সাথেই খাপ খেয়ে যায়।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার, আল-কুরআন এ দৃশ্যাংকনে শুধু পারস্পরিক সূক্ষ্ম সম্পর্কের সাহায্য নেয়নি বরং অনেক সময় দূরের সম্পর্ককেও সে কল্পনার মাধ্যমে খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আমরা মূলত চিত্রায়ণ ও দৃশ্যাংকনের ভাষায় কথা বলছি। কারণ আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনের পূর্বেই একটি চিত্রের মুখোমুখি হই (যা ওপরের আয়াতে পেশ করা হয়েছে)। দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আসমান ও জমিনকে একত্র করে উপস্থাপন করা হয়। অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং জীবিত প্রাণীকে একই পরিসরে একত্রিত

করে দেয়া হয়। আর এটি ঐ জায়গায়ই হয়ে থাকে যেখানে চিত্রপটে প্রশস্ততা ও বিস্তৃতির অবকাশ থাকে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ - وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
- وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ - وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ -

তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে দেখে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে ? এবং পাহাড়ের দিকে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে ? এবং পৃথিবীর দিকে, দেখ, কিভাবে তা সমতল করা হয়েছে ? (গাশিয়া ঃ ১৭-২০)

দেখুন, শিল্পীর তুলি একই ছবির মধ্যে কতো সুন্দরভাবে জমিন, আসমান, উট এবং পাহাড়কে একত্রে সাজিয়ে দিয়েছে। ছোট পরিসরে দিগন্ত বিস্তৃত এক ছবি। এখানে যে বস্তুর বর্ণনা করা উদ্দেশ্য তা বিশাল, পুরো ও ভয়ানক ঐ বস্তুগুলো দেখলেই নিজের অজান্তে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। যে চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তা আসমান থেকে শুরু করে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত। অপরদিকে বিশাল আকাশচুম্বী পাহাড় এবং উঁচু কুঁজওয়ালা উট, সবকিছুকে ছোট একটি ক্যানভাসে নিপুঁণভাবে সাজানো হয়েছে। যা বড় মাপের শিল্পী ছাড়া আর কাউকে দিয়েই সম্ভব নয়। একজন বড় মাপের শিল্পীই পারেন এরূপ কারুকাজ ও সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করতে।

দ্বিতীয়ত, যাকে শুধুমাত্র শিল্পীর চোখই দেখে থাকে তা হচ্ছে, পুরো ক্যানভাসের একদিকে আসমান অপরদিকে জমিন, মাঝে বিশালায়তনের পাহাড়, তার মধ্যে জীবন্ত প্রাণী উট— যে দিগন্ত প্রসারী মরুভূমিতে চরে বেড়ায়। যাকে পাহাড় চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

৪. সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া নিচের এ আয়াত ক'টিও ওপরের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ
كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ - اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ
مُّبِيْنٌ - وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ - وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ
بِرٰزِقِيْنَ -

নিশ্চয়ই আমি আকাশে দূর্গ সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি। আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে রেখেছি। কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড। আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিকল্পিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আসমানে বড় বড় দূর্গ ও উল্কাপিণ্ড আছে। যে উল্কাপিণ্ড বিদ্রোহী শয়তানদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়। বিস্তৃত জমিনের ওপর মজবুত পাহাড় স্থাপন করা হয়েছে, আবার জমিনের ওপর উৎপন্ন করা হয়েছে বিভিন্ন উদ্ভিদ, তবে তা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এবং যথাযথভাবে। এজন্য 'মাওযুন' (موزون) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'বাহীজ' (بهيج) কিংবা 'লাতীফ' (لطيف) শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সৃষ্টিকে 'মাআয়িশ' আধিক্যবাচক বহুবচনের শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে জমিনে এমন সব প্রাণীও আছে যাদেরকে মানুষ প্রতিপালন করে না। কিন্তু কথাটি উহ্য রাখা হয়েছে।

গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায়, এ আয়াতগুলোতে যে দৃশ্য ও চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা বিশাল আয়তনের এবং ভারী। সবকিছুকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও তাৎপর্যপূর্ণ করে এমনভাবে গেঁথে দেয়া হয়েছে, যেভাবে বিশাল আয়তনের পুরো এক বইতে একটি ফিতার ওপর সবগুলো ফর্মা সেলাই করে গেঁথে দেয়া হয়।

৫. অনেক সময় ছবির বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা সৃষ্টির জন্য ক্যানভাসের প্রস্থের দিককে ওপরে ও নীচে করে দেয়া হয়। তবু তার মধ্যে চিত্রের সবকিছুকে শামিল করা কষ্টকর হয়ে যায়। তাই ক্যানভাসের পুরো কাপড়টিই ব্যবহার করে ছবি আঁকা হয়। এ রকম এক ছবির উদাহরণ হচ্ছে নিচের আয়াতটি ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি

উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোথায় সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, সকল বিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

দেখুন এ আয়াতে ক্যানভাস বা চিত্রপট সাধ্যাতীত বিস্তৃত। এর মধ্যে স্থান ও কাল, বর্তমান ও ভবিষ্যত, অদৃশ্য জগতের খবরাখবর, কিয়ামত, বৃষ্টি, জরায়ুর মধ্যে লুক্কায়িত ভ্রূণ ইত্যাদি সবকিছু শামিল করা হয়েছে। সেই সাথে ভবিষ্যতে অর্জিত হবে এমন রিযিকের কথাও এসেছে। তা অর্জনের সময় খুব একটা দূরে নয়। চোখের সামনেই। মৃত্যু কখন আসবে এবং কোথায় দাফন কাফন হবে এ দৃশ্যটি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে।

এ ছবি সময় ও পরিসীমা উভয় দিকেই বড় বিস্তৃত। তার পরিসীমা এবং চতুর্পাশ অদৃশ্য বিষয়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে। এ সবকিছু মনে হয় ছোট একটি তাকের সামনে দাঁড়ানো, আর তাকের দরজা বন্ধ। যদি সেখানে সুঁইয়ের ছিদ্রের মতো সূক্ষ্ম কোন ছিদ্র দৃষ্টিগোচর হয় তবে দেখা যাবে— যে বস্তু অনেক দূরে তা অতি নিকটে যে বস্তু কাছে তা পেছনেই দণ্ডায়মান, উভয়ের মাছে কোন ফাঁক নেই। অর্থাৎ এসব বস্তু দূরত্বের শেষ সীমায় অবস্থান করছে ঠিকই কিন্তু অদৃশ্য বস্তুটিই কোন এক সময়ে চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তখন সব কিছুকেই একত্রে একই প্লাটফর্মে উপস্থিত মনে হয়।

শৈল্পিক বিন্যাসের একটি সূক্ষ্ম দিক

কুরআনী দৃশ্যসমূহের মধ্যে শৈল্পিক যে মিল ও বিন্যাস পাওয়া যায়, তার আর একটি দিক নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো। এ পর্যন্ত শৈল্পিক বিন্যাস ও তার সংগতি নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা ছবি ও দৃশ্যে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তাছাড়া সেটি পরিপূর্ণ শৈল্পিক বিন্যাস ছিল যা ছবির কোন অংশে কিংবা পুরো ছবিতে পাওয়া যেতো। কিন্তু আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব ও মাহাত্ম্য এখানে এসেই থেমে যেতে পারে না। অনেক সময় তা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি কিংবা চলমান কোন দৃশ্যাকারে প্রতিভাত হয়। আবার কখনো সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে এক সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, যা তার চারিদিকের সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে তা থেকে যে পরিণতি সৃষ্টি হয় তা নিচের উদাহরণ থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। যেমন ঃ

وَالضُّحٰى - وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - وَلَلْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى - وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى - اَلَمْ يَجِدْكَ

يَتِيمًا فَآوٰى - وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى - وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى - فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ - وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাতের যখন তা গভীর হয়। তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি তিনি বিরূপ নন। পূর্বের চেয়ে পরের অবস্থা উত্তম। তোমার প্রতিপালক শীঘ্রই তা তোমাকে দেবেন যেন তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তিনি কি তোমাকে ইয়াতিম পাননি ? অতপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তুমি ছিলে পথহারা, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না, ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না এবং তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা প্রকাশ করো। (সূরা দোহা ঃ ১-১১)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে অনুগ্রহ ও অনুকম্পা, দুশ্চিন্তা ও অসহায়ত্বের এক সম্মিলিত আবহ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। যেমন ঃ .... مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى আয়াত পর্যন্ত রহম ও করম এবং দুঃখ ও হতাশার যে সুর মুর্ছনা সৃষ্টি করা হয়েছে তা যেন হৃদয়বীণার সূক্ষ্ম তন্ত্রীর প্রলয়ংকরী ঝংকার। বক্তব্য উপস্থাপনে উপযুক্ত হাল্কা ও করুণ সুরের সমাবেশ ঘটান হয়েছে। যেখানে দুশ্চিন্তার করুণ রাগিণী বেজে চলছে অবিরত। মধ্যাহ্ন (ضُحٰى) এবং কালো পর্দা বিস্তৃতিকারী রাতকে দিয়ে সেই সুরকে ঘিরে দেয়া হয়েছে। মধ্যাহ্নে এ সময়টি রাত ও দিনের মধ্যে সর্বোত্তম সময়। আর দুঃখ-বেদনার প্রতীক হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে রাতকে। রাত যেমন অন্ধকারের হাল্কা আবরণী দিয়ে সবকিছুকে ঢেকে দেয় তদ্রূপ ইয়াতিমী এবং দারিদ্রতা নামক দুঃখের এক সূক্ষ্ম চাদর রাসূলে আকরাম (স)-কে ঢেকে দিয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সে চাদর সরে যাচ্ছে এবং সুখের প্রভাত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে মধ্যাহ্নে পৌঁছে যাচ্ছে।

مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى - وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى -

তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি। তোমার প্রতি তিনি বিরূপও নন। আগের চেয়ে পরের অবস্থা ভাল। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে যা দেবেন, তুমি খুশী হয়ে যাবে।

এ সুসংবাদ শুনানো হচ্ছে। এভাবেই ছবিটি পরিবেশ-পরিস্থিতি, রং-ঢং এবং উপমা-উৎক্ষেপণ সবকিছু মিলে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

খ. এখন আরেক ধরনের সুর শুনুন। এর প্রেক্ষাপট ও ছবি দুটোই ভিন্নধর্মী।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا - فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا - فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا - فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا - فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا - اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ - وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ - وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ - اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَافِى الْقُبُوْرِ - وَحُصِّلَ مَافِى الصُّدُوْرِ - اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ -

শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। অতপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের। অতপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের ও যারা সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। অতপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার অকৃতজ্ঞ এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত এবং সে নিশ্চিত ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা বের করা হবে ? সেদিন তাদের কি হবে সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সম্যক অবহিত।

(সূরা আল-আদিয়াত ঃ ১-১১)

এ সূরার সুর ও ছন্দের ঢং সূরা আন-নাযিয়াতের অনুরূপ। তবে এখানে 'আন-নাযিয়াতের' চেয়ে কাঠিন্য ও তীক্ষ্নতা অনেক বেশি। তাছাড়া এখানে কর্কষতা, ভীতি, রাগ ও শোরগোলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ সূরাটি স্থান, কাল ও পাত্রের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। যখন মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠবে তখন শোরগোল সৃষ্টি হবে এবং তার মনের যাবতীয় গোপন জিনিসকে মূর্তমান করে বের করে রাখা হবে। এখানে এক প্রকার কাঠিন্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। যা অকৃতজ্ঞা, ঔদ্ধত্য ও সংকীর্ণতার পরিবেশের সাথে পূর্ণ মিল আছে। যখন এ পুরো সৌন্দর্যের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তখনই সেইরূপ কোলাহলপূর্ণ একটি পরিবেশকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং দ্রুতগামী ঘোড়ার পদধূলি এবং হ্রেষা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে সে প্রেক্ষাপট। সেগুলো প্রাতঃকালে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিত্রের সাথে প্রেক্ষাপট এবং

প্রেক্ষাপটের সাথে চিত্র চমৎকারভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এভাবেই গোটা ছবিটি তার প্রতিটি অংশ নিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

গ. আমরা ইতোপূর্বে ছবির দুটো প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করলাম। দুটোই স্বতন্ত্র এবং পরস্পর ভিন্নধর্মী। তবে এ দুটো ছবির রং-ঢং একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্য রাখে। প্রেক্ষাপট সবসময় একই রঙ-ঢঙ সীমাবদ্ধ থাকে না বরং বিভিন্ন ধরনের ও রঙের হয়ে থাকে এবং তার মধ্যস্থিত যে ছবি, তাও অনুরূপ হয়। যেমন ঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى - فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى - وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى - وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى - اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى - وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى - فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى - لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى - الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى - وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى - الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى - وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤى - اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى - وَلَسَوْفَ يَرْضٰى -

শপথ রাতের যখন সে আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন সে আলোকিত হয় এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন। অতএব, যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে ও উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে আমি তার সুখের জন্য সহজ পথ দান করবো। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যে মনে করে আমি তার কষ্টের জন্য সহজ পথ দান করবো। যখন সে ধ্বংসে নিপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোন কাজেই আসবে না। আমার দায়িত্ব পথ-প্রদর্শন করা। আমিই ইহকাল ও পরকালের মালিক। অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে মুত্তাকী ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার

ধন-সম্পদ দান করে এবং তার ওপর কার কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অন্বেষণ ছাড়া। সে অচিরেই সন্তুষ্টি লাভ করবে। (সূরা আল-লাইল ঃ ১-২১)

এ সূরায় যে ছবি আঁকা হয়েছে, তার মধ্যে সাদা ও কালো (অর্থাৎ পাপ ও পুন্য) দুটোই বর্তমান। সেখানে اَعْطٰى وَاتَّقٰى —'যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।' যেমন বলা হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি এও বলা হয়েছে যে, مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى —'যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয়।' তেমনিভাবে فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى —'আমি তার সুখের জন্য সহজ পথ দান করো।' সাথে সাথে فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى —'আমি তার কষ্টের জন্য সহজ পথ দান করবো' বলা হয়েছে। তদ্রূপ الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى —'হতভাগ্য সে, যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়'-এর সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِى مَالَهٗ يَتَزَكّٰى —'আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে।' এভাবে সাদা এবং কালায় গোটা ছবির প্রেক্ষাপট নির্বাচন করা হয়েছে।

যেমন একদিকে বলা হয়েছে ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى —'রাতের শপথ যখন তা আচ্ছন্ন করে নেয়।' ঠিক তেমনিভাবে বলা হয়েছে ঃ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى —'দিনের শপথ যখন সে আলোক উদ্ভাসিত হয়ে যায়। এখানে 'আল লাইল' (الليل) এর সাথে 'ইয়াগ্‌শা' (يغشى) শব্দ নেয়া হয়েছে কিন্তু সূরা দ্বোহায় নেয়া হয়েছে 'সাজা' (سَجى) শব্দটি। সম্ভবত রাত ও দিনের মুখোমুখি অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যই এরূপ করা হয়েছে। আবার الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى -এর মধ্যে নর ও নারী একই জাতি কিন্তু একে অপরের বিপরীত। এজন্যই বলা যায়, এ প্রেক্ষাপট ছবির সম্পূর্ণ আনুকূল্যে।

সূরা আল-লাইলে যে সুর-ছন্দ পাওয়া যায় তা সূরা দ্বোহার চেয়ে অনেক উন্নত। কিন্তু সেই সুর ব্যঞ্জনায় নির্দয়তা ও মনের গহন বেদনা নেই। কারণ বর্ণনা ও প্রেক্ষাপটের দাবিও তাই। এ ঐক্য ও মিল তর্কাতীতভাবেই বড় চমৎকার।

কুরআনী চিত্রের স্থায়ীত্বকাল

আল-কুরআনে যে শৈল্পিক সঙ্গতি পাওয়া যায়, এখন আমরা তার আরেকটি দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

আল-কুরআনের দৃশ্য ও ছবি সম্পর্কে শুধু একথা বলেই শেষ করা যায় না যে, ছবি ও দৃশ্যের বিভিন্ন অংশ ও রঙের মধ্যে মিল করে দিলে, সুর ও ছন্দের এমন তাল সৃষ্টি করে দিলেই হয়ে যাবে যা প্রেক্ষাপট বা মূল থিমের অনুকূলে। বরং দৃশ্যকে আকর্ষণীয় শিল্প মানের পরিপূর্ণতা এবং স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসকে সামনে রেখে আরেকটু অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ঐ দৃশ্যকে কল্পনার জগতে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সময়কে স্থিরিকরণ একান্ত প্রয়োজন। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, কুরআনে কারীম এ প্রয়োজনটাকেও অত্যন্ত সুন্দর ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছে।

আল-কুরআনের উপস্থাপিত কিছু দৃশ্য তো চোখের পলকেই হারিয়ে যায়, যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশটুকুও থাকে না। কিছু ছবি এতো দীর্ঘস্থায়ী হয়, পাঠক মনে করে এ দৃশ্য আর কখনো চোখের আড়াল হবে না। কিছু ছবি চলমান আবার কিছু স্থির। দৃশ্যের দ্রুততা এবং স্থায়ীত্ব একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যা ঐ দৃশ্যের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। তাছাড়া কুরআনের সাধারণ উদ্দেশ্যও সেখানে সমভাবে প্রতিফলিত হয়। কোন দৃশ্যের দীর্ঘতা কিংবা সংক্ষিপ্ততা একটি বিশেষ উপায়ে সংঘটিত হয়। তার মধ্যস্থিত সমস্ত উপায় ও উপকরণ দৃশ্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে।

এ নতুন ময়দানে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ, এখন আমরা পর্যায়ক্রমে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরবো ঃ

১. কুরআন মানুষের সামনে এ দৃশ্য উপস্থাপন করতে চায় যে, এ পৃথিবীর সময়কাল কতো কম— যা মানুষকে পরকালের জীবন সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। এ দৃশ্যকে কুরআন এভাবে উপস্থাপন করেছে ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا -

তাদেরকে পার্থিব জীবনের উপমা শুনিয়ে দাও, তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতপর তার সংমিশ্রণে জমিন থেকে লতা ও ঘাস-পাতার অংকুরোদ্গম হয়। তারপর তা শুষ্ক হয়ে ভূসির মতো বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ সবকিছু করতেই সক্ষম। (সূরা আল-কাহফ ঃ ৪৫)

এখানে তিনটি কথা বলা হয়েছে। ১, পানি আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়া। ২.

পানি ও মাটির সংমিশ্রণে উর্বরা শক্তির বিকাশ এবং ৩. তারপর তা শুকিয়ে ভূসির মতো বাতাসে উড়ে যাওয়া।

এ তিনটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে একথাই বলা হয়েছে যে, তিনটি দৃশ্যেই পার্থিব জীবন শেষ হয়ে গেছে। আহা! জীবন কতো সংক্ষিপ্ত!

সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ভিদের যাবতীয় বিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কোন দিকই বাদ পড়েনি। অবশ্য দ্বিতীয় অবস্থার কথাটা বলা হয়নি। প্রথমে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা ফসল উৎপাদনের পূর্বেই মাটিতে সঞ্চিত হয় এবং সেই পানি মাটির সাথে মিশে মাটিকে উৎপাদনক্ষম করে তুলে। তারপর এক পর্যায়ে ফসল পেকে যায় এবং শুকিয়ে খড়কুটোগুলো বাতাসে উড়ে যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে উদ্ভিদের দ্বিতীয় অবস্থার কথা ছাড়া আর কী বাদ পড়েছে?

উল্লেখিত আয়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনা, দৃষ্টিকাল এবং সৌন্দর্য সুষমা সব উপকরণই জমা হয়ে গেছে। বর্ণনা পদ্ধতি তো এতো সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ যে, তার মাধ্যমে যা কিছু বুঝানোর উদ্দেশ্য ছিল তার সামান্যও আর অবশিষ্ট নেই যাতে দ্বীনি উদ্দেশ্য পুরো হতে পারতো। দর্শন-কাল এ চিত্রকে পূর্ণতায় পৌছে দিয়েছে যা সৌন্দর্য সুষমার সীমাতিক্রম করে চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে তুলে।

এ দৃশ্যকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার জন্য শব্দ বিন্যাস এবং শৈল্পিক উপকরণ দুটোরই সাহায্য নেয়া হয়েছে। যেমন 'ফাখ্তালাতা' (فَاخْتَلَطَ) শব্দের অনুসরণীয় 'ফা' যা ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। এ অক্ষরটি পুরো দৃশ্যটিকে পরিপূর্ণতা এবং দ্রুততার সাথে উপস্থাপন করেছে। এ 'ফা' অক্ষরটি হতেই প্রতীয়মান হয় যে, পতিত পানি প্রকৃতপক্ষে জমিনের সাথে না মিলে বরং জমিন থেকে সৃষ্ট লতাগুল্ম ও উদ্ভিদের সাথে মিলে যায়। এমন ঢঙে তা উপস্থাপন করা হয়েছে যা কাংখিত দ্রুততাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

২. প্রায় এ রকম আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে নিচের আয়াতটি। অর্থ, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি আকর্ষণের ধরন ও পদ্ধতি একই কিন্তু কিছুটা ভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন করা হয়েছে।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا -

তোমরা জেনে রেখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক

অহমিকা ও ধন-জনের প্রাচুর্য ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন বৃষ্টি, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে উৎফুল্ল করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, তারপর তা খড়কুটো হয়ে যায়।

এ আয়াতে নশ্বর দুনিয়ার যে ছবি আঁকা হয়েছে তা আগের আয়াতের সাথে মিল আছে। অনেকে মনে করতে পারেন এ ছবিতে চিত্রে কোন গড়মিল নেই। আসলে এ দুটো আয়াতের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। তা হচ্ছে কাফিররা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ হচ্ছে এখানে খেলাধূলা ও হাসি-তামাশার পরিবেশের ন্যায় পরিবেশ এবং আনন্দ-ফূর্তির যাবতীয় উপায়-উপকরণ হাতের মুঠোয়— যা একটু পরিশ্রমেই লাভ করা যায়। ধন-সম্পদ ও জনবলে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা যায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ কাফিররা যেসব বিষয়ে মত্ত আছে এবং জীবনকে অনেক দীর্ঘ উপভোগ্য মনে করছে, মূলত তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও ধ্বংসশীল। যেমন বৃষ্টি মাটিকে উর্বর করে এবং বিভিন্ন ধরনের ফল-ফসল উৎপন্ন করে, কৃষকরা উৎফুল্ল হয়, কিন্তু দেখা যায় সেসব উদ্ভিদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পেকে শুকিয়ে যায় এবং খড়কুটোর মতো বাতাসে উড়ে যায়। দুনিয়ার অবস্থাও ঠিক এমন।

আল-কুরআনে যে সমস্ত আয়াত দেখতে একরকম মনে হয় সে সবের মধ্যে ওপরে আলোচিত পার্থক্যের মতো সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। দেখতে এক রকম এরূপ দুটো আয়াতের মধ্যেও এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকে যার কারণে দুটো আয়াতের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। অবশ্য এ পার্থক্যটা সাধারণ হতে পারে আবার গুরুত্বপূর্ণও হতে পারে। ঐ সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে যেমন দাওয়াতী কাজ হয়, তেমনিভাবে তা শৈল্পিক সৌন্দর্য ও সৌকর্যের বাহনও বটে। তাছাড়া ঐ সূক্ষ্ম পার্থক্যের কারণে যেমন তার মধ্যে নতুনত্বের সৃষ্টি হয় আবার তা একটি প্রকার হিসেবেও গণ্য হয়।

৩. আগের দুটো উদাহরণে দেখা গেছে দ্বিতীয় অবস্থাকে বিলোপ করে বর্ণনার সংক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু এখন এমন একটি উদাহরণ পেশ করবো যা আগের উদাহরণের মতোই দুনিয়ার সময়কে সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এ সংক্ষিপ্ততা পূর্বের (উদাহরণের) চেয়েও বেশি। এখানে দুনিয়ার দুটো অবস্থাকে (শুরু ও শেষ) এক মুহূর্তের মধ্যেই একত্র করে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়টি কী পরিমাণ দীর্ঘ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ -

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল করে রাখে। এমনিভাবে তোমরা কবরের সাক্ষাত পেয়ে যাবে। (সূরা আত্-তাকাছুর ঃ ১-২)

এ আয়াতে যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা জীবনের পরিসীমার একটি চিত্র। যার শুরু ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অনুসন্ধান দিয়ে এবং শেষ কবর। জীবনের শেষ সীমা সম্পর্কে এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ চিত্র, বর্ণনার কিংবা চিন্তার মাধ্যমে আর কিভাবে আঁকা সম্ভব ? এ ছবির আরেকটি দিক হচ্ছে জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যে সময়টি তাও দুনিয়ার খেল-তামাশায় লিপ্ত হয়ে শেষ হয়ে যায়। 'হাত্তা' (حَتّٰى) শব্দটি ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, তার দীর্ঘতার শেষ সীমা কোথায়। এতো স্বল্প সময়েও মানুষ অপ্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, অথচ সে জানে তার জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত দুটো আয়াত দিয়ে পুরো উদ্দেশ্যটিকে সুন্দর ও সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৪. নিচের আয়াতটিও এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত, কিন্তু এর উদ্দেশ্য ভিন্ন।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

কিভাবে তোমরা আল্লাহ্কে অস্বীকার করতে পার ? তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ অতপর তিনিই তোমাদের প্রাণ দান করেছেন। আবার মৃত্যু দেবেন, তারপর আবার তোমাদের জীবিত করবেন। অতপর তার দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮)

একই আয়াতের চারটি অংশে সৃষ্টির চার অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রথম অবস্থা হচ্ছে সৃষ্টিপূর্ব অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা সৃষ্টির পর দুনিয়ার জীবনে বিচরণ সংক্রান্ত, তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে এ পৃথিবী থেকে অবশ্যই একদিন চলে যেতে হবে এবং চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে, দুনিয়ার জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে এবং সেখানে সবাইকে উপস্থিত হতে হবে।

দুনিয়ার জীবনের পূর্ব অবস্থাকে বলা হয় আযল। অস্তিত্ব লাভ করার পরের অবস্থা ও অবস্থানকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যার নাম হায়াত বা জীবন। তারপর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর শুরু হবে আখিরাতের জীবন। সংক্ষিপ্ততার জন্য চারটি অবস্থাকে মাত্র চারটি শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু চিন্তাশক্তি একে অনেক দীর্ঘসময় মনে করে অথচ কুদরতে আযীমের নিকট এ দীর্ঘ সময়টুকু চোখের একটি পলকের ন্যায় মাত্র। কুদরতে আযীমা একটি জিনিসকে শুধু বলেন, 'হয়ে যাও' আর অমনি তা হয়ে যায়। সেই দ্রুততাকেই আরো উজ্জ্বল

করে উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে সেই দীর্ঘ সময়কে যখন চোখের পলক পরিমাণ সময়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। তাহলে কিভাবে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা যায় ? আর কিভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যায় ? তিনিইতো সেই সত্তা যিনি প্রথম থেকেই তোমাদের সবকিছুর মালিক। আবার শেষ পর্যন্ত তিনিই মালিক থাকবেন। আর তোমরা তার নিকটই ফিরে যাবে।

পরের আয়াতে সংক্ষিপ্ততাকে পূর্ণ রূপ দেয়া হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ -

তিনিই সেই সত্তা যিনি পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি মনোযোগ দিয়েছেন আকাশের দিকে, আকাশ সাতটি স্তরে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৯)

এভাবে এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পৃথিবীর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই তা সাত স্তরে বিন্যাস করে সৃষ্টি করেছেন। আল-কুরআনের যেসব জায়গায় এ বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে সেসব আয়াতে আসমান-জমিনের সৃষ্টির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৫. এ পর্যন্ত দৃশ্যাবলীতে সংক্ষিপ্ততার সাহায্য নেয়া হচ্ছিল। এসব দৃশ্যে কোথাও মধ্যবর্তী অবস্থার কথা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে আবার কোথাও এক অবস্থাকে আরেক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এখন আমরা সংক্ষিপ্ততার এমন একটি উদাহরণ পেশ করবো যেখানে প্রকৃতির শিল্পী তাঁর নিপুণ শিল্পকর্মে সুন্দর এক কলা প্রদর্শন করেছেন, যেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী তুলির সাহায্য নেয়া হয়েছে। সেখানে তুলির বিক্ষিপ্ত স্পর্শে এমন এক অবিস্মরণীয় ছবি ভাস্বর হয়ে উঠেছে, যার দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হবে এখানে কিছুই ছিল না। যখনই কল্পনাশক্তি সেই ক্যানভাসে দৃষ্টি প্রদান করে তখনই মনে হয় সেখানে কিছুই ছিল না।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো, সে যেন আকাশ থেকে

ছিটকে পড়ল, অতপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।
(আল-হাজ্জ ঃ ৩১)

কতো দ্রুত এটি সংঘটিত হচ্ছে, জমিন থেকে ছিটকে পড়া, তৎক্ষণাৎ কোন মাংশাসী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া কিংবা বাতাস তাকে দূর-দূরান্তে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দেয়া। এবার এমন একট চিত্র চোখের সামনে রয়ে যায় মনে হয় এখানে কোনকালেই কিছু ছিল না।

একটু চিন্তা করুন, ছোঁ মেরে নেয়ার ক্ষিপ্রতার মধ্যে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? এর রহস্য হচ্ছে, কেউ যেন মনে না করেন যে, মুশরিকদের কোন ঠিকানা বা স্থায়ীত্ব আছে। তবু পৃথিবীতে তাদেরকে ক্ষণিকের জন্য জায়গা দেয়া হয়েছে। মুশরিকদের বংশ পরিচয় কেমন, তারা কতোটুকু শান-শওকতের অধিকারী, তাদের গোত্রের শাখা-প্রশাখা এবং জনবল কেমন— এসব বিষয় কোন ধর্তব্যই নয়, তারা অজানা স্থান থেকে এসে আবার চোখের পলকে আরেক অজানায় চলে যায়। দুনিয়ার জীবনে স্থির হয়ে বসা তাদের নসীবেই নেই।

এবার আমরা কিছু দীর্ঘ চিত্র পেশ করব।

দীর্ঘ চিত্র

১. আমরা সেই আয়াতের আলোচনা করেছি, যেখানে বলা হয়েছে বৃষ্টির পানি আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। তারপর জমিন থেকে নানা ধরনের উদ্ভিদের অংকুরোদ্গম হয়। এক পর্যায়ে সেগুলো পেকে শুকিয়ে খড়কুটোয় পরিণত হয় এবং বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। গোটা দৃশ্যটিকে চোখের পলকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন আমরা দেখবো যে, এ ধরনের দৃশ্যকে অনেক জায়গায় কতো ধীরে-সুস্থে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

(ক)

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ - فَاِذَا اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ -

তিনি আল্লাহ্ যিনি বাতাসকে প্রেরণ করেন এবং তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি তার মধ্য থেকে বৃষ্টি হতে দেখ। তিনি

তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে তা পৌছান, তখন তারা আনন্দিত হয়। (সূরা আর-রূম ঃ ৪৮)

এ আয়াতটি প্রথম অবস্থার অন্তর্ভুক্ত যেখানে বৃষ্টির পানি জমিন পর্যন্ত পৌছার কথা বলা হয়েছে। যেমন বৃষ্টি মেঘ আকারে আকাশে বাতাসের সাথে ভেসে বেড়ায়। যখন আল্লাহ্ চান তখন তা ভারী করে দেন এবং বৃষ্টি আকারে জমিনে নেমে আসে। মানুষ প্রথমে নিরাশ হলেও পরে বৃষ্টি দেখে খুশী হয়। আসুন এবার দেখি বৃষ্টি বর্ষণের পরে কি হয় ?

(খ)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ -

তুমি কে দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং সে পানি দিয়ে বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তোমরা সেগুলো পীতবর্ণ দেখতে পাও ? তারপর আল্লাহ্ সেগুলোকে খড়কুটোয় পরিণত করে দেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ আছে। (সূরা আয-যুমার ঃ ২১)

দেখুন এখানে সব কাজ ধীরে-সুস্থে পরিচালিত হচ্ছে। পানি আকাশ থেকে বর্ষিত হয় কিন্তু সাথে সাথেই জমিনে অংকুরোদ্গম হয় না। বরং সে পানি নদী বা ঝর্ণা হয়ে বয়ে যায়। ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا —'অতপর তা থেকে ফসল উৎপন্ন হয়।' যা বিভিন্ন রঙে পরিবর্তিত হয়। রঙের পরিবর্তনই অবকাশের দাবি রাখে। তারপর তা আন্দোলিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে পেকে যায় এবং পীতবর্ণ ধারণ করে। এখানে সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা একটি সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সংঘটিত হয়, 'ছুম্মা' ثُمَّ শব্দ দিয়ে তাই বুঝা যায়। ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا —'অতপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়' বাক্য দিয়ে বুঝা যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করার কাজটিও একটু সময় নিয়ে করা হয়। এখানে يَجْعَلُهٗ শব্দটি বর্তমান/ভবিষ্যতকালের শব্দ নেয়া হয়েছে। অন্যত্র اَصْبَحَ هَشِيْمًا —'চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে 'এবং يَكُوْنَ حُطَامًا —'চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়' বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া একাকী তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এখানে বলা হয়েছে, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়

এবং সে অবস্থায়ই রয়ে যায়। কিন্তু আরেক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ تَذْرُوْهُ الرِّيٰحِ —'বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।' তারপর তার আর কোন স্মৃতি চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

এ ধীর-স্থিরতা ও দীর্ঘতার মধ্যে রহস্য হচ্ছে, এ আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এজন্য নিয়ামতের কথা বলতে গিয়ে ধীরে ধীরে বলা হয়েছে যাতে দর্শকগণ ধীরে-সুস্থে এ দৃশ্য অবলোকন করতে পারে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে, কোন আকাঙ্ক্ষাই যেন আর অবশিষ্ট না থাকে। শুধু এ কারণেই দৃশ্যকে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে।

২. আরেকটি দৃশ্য দেখুন, যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে একটি ক্ষেত ও ফসলের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ -

তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা বলা হয়েছে যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়। তারপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং দৃঢ়ভাবে কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।

(সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ২৯)

এ আয়াতে যে ক্ষেতের কথা বলা হয়েছে সে ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে বাতাসে উড়ে যায় না। বরং তা অটল ও অনড় থাকে। এ ছবি চিরন্তনী। কখনো মন ও চিন্তা থেকে এটি বিলীন হয়ে যায় না। এটি এমন এক ছবি যা মন ও চিন্তার জগতে সুদীর্ঘ প্রভাব ফেলে।

এখানে একটি কথা চিন্তা করা প্রয়োজন, ছবিটি দীর্ঘ একটি ছবি বটে কিন্তু তার প্রাথমিক অংশগুলো দ্রুত সংঘটিত হয়ে যায়। যেমন একটি ক্ষেতে বীজ ফেলা মাত্র অংকুরোদ্গম হয়ে খুব তাড়াতাড়ি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। এতে বেশি বিলম্ব হয় না। তারপর এক পর্যায়ে গিয়ে তা আপন কাণ্ডের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ হচ্ছে মুসলমানদের প্রাথমিক অবস্থা। প্রথমতঃ তারা ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করেননি। দ্বিতীয়ত ঃ তারা ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রইলেন। তাদের অবস্থা পূর্ণতায় পৌঁছার পর আর সেখানে কোন পরিবর্তন সূচিত হলো না।

৩. আমরা এর আগে যে দৃশ্যের উল্লেখ করেছি, সেখানে মানুষের গোটা জিন্দেগীর (অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) এমন একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল যা চোখের পলকে শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার আমরা দেখবো আরেকটি দৃশ্য, গোটা জিন্দেগীর নয়। জীবনের একটি অংশ বিশেষের, কিন্তু দীর্ঘতার দিকে তা অনেক বেশি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ -

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আঁধারে স্থাপন করেছি। অতপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। এরপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সে মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতপর অস্থিতে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কতো কল্যাণময়।

দেখুন মানুষের জীবনের শুধু একটি অধ্যায়ের আলোচনা কতো দীর্ঘ। এখানে গর্ভধারণের পর থেকে প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের আলোকপাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে উপদেশ যা নসীহত করা হয়েছে তা প্রতিটি বিবেকের ওপর প্রভাব ফেলার জন্য যথেষ্ট। তাই বলা যায় এ দীর্ঘতা এখানে অপসন্দনীয় নয়।

৪. যে সমস্ত দৃশ্য দীর্ঘস্থায়ী করে চিত্রায়ণ করা হয়েছে, তার মধ্যে কিয়ামতের দিনের এবং জাহান্নামের শাস্তির দৃশ্যগুলো অন্যতম। যখন সেই কাজ নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তার চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে তা দীর্ঘস্থায়ী চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হয়। যেন সেই ছবি প্রতিটি মানুষের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তার ভয়াবহ পরিণতি যার ছাপ বিবেকের প্রভাব পড়তে পারে।

কিছু চিত্রকে দীর্ঘায়িত করার জন্য কতিপয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি। যদি পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশংকা না থাকতো তবে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র এক অধ্যায় সংযোজন করে দিতাম।

[৪.১] অনেক সময় কোন দৃশ্য দীর্ঘতার সাথে উপস্থাপনের জন্য এমন শব্দে এবং স্টাইলে তা পেশ করা হয়, যা থেকে পুনরাবৃত্তির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যেমনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۗ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ -

যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে তাদেরকে আমি অচিরেই আগুনে দগ্ধ করাবো। আগুন যখন তাদের চামড়াকে ঝলসে দেবে তখন আমরা তার পরিবর্তে নতুন চামড়া তৈরী করে দেব, যেন তারা শাস্তিকে পুরোপুরি অনুভব করতে পারে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৬)

এ আয়াতে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কল্পনার চোখ বার বার এ দৃশ্য অবলোকন করে এবং ভয়-ভীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। যখন পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় তখন বার বার তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। কারণ, যখন নফস সীমাতিক্রম করার প্রয়াস পায় তখন এ ভীতিকর চিত্র তাকে বাধা দান করে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে উৎসাহ প্রদান করে।

[৪.২] অনেক সময় শাব্দিক বিন্যাস ও তারতীবের মাধ্যমে দীর্ঘতা সৃষ্টি করা হয়। যেমন— একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তারপর তার অংশ বিশেষের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে না তাদের জন্য কঠিন আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে ছ্যাঁকা দেয়া হবে। আর বলা হবে ঃ এগুলো তোমরা জমা করে রেখেছিলে অতএব আজ এর পরিণতির স্বাদ-আস্বাদন করো। (তওবা ঃ ৩৪-৩৫)

প্রথমে فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ —'তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও' বলে শাস্তি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। সামান্য সময়ের জন্য

বর্ণনার ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যেন শ্রোতা আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তারপর সেই আযাবের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দ্বিবচন-এর পরিবর্তে বহুবচন-এর শব্দ নেয়া হয়েছে। এভাবে তাদের আধিক্য বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে يُحْمٰى عَلَيْهِمَا না বলে يُحْمٰى عَلَيْهَا বলা হয়েছে। দেখুন সোনা ও রূপাকে আগুনে গরম করার পর তা গলে গেল না, তা দিয়ে শুরু করা হলো এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব। প্রথমে তা দিয়ে কপালে ছ্যাঁকা দেয়া হচ্ছে। কপালে ছ্যাঁকা দেয়ার কাজ শেষ হলো। এবার দুই বাহুকে সামনে এনে ছ্যাঁকা দেয়া হলো। তারপর পিঠের ওপর ছ্যাঁকা দেয়া শুরু হলো। পিঠে ছ্যাঁকা দেয়াও শেষ হলো। মনে করছেন এখানেই শাস্তি শেষ হয়ে গেল। দাঁড়ান! এখানে এ দৃশ্য শেষ হয়নি। এবার কল্পনার জগতে ভেসে উঠে, একাধিক দলকে পর্যায়ক্রমে আযাবের আওতায় আনা হচ্ছে এবং বার বার তার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে ঃ

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

এগুলো তোমরা জমা করে রেখেছিলে। অতএব আজ এর পরিণতির স্বাদ-আস্বাদন করো। (সূরা আত্-তওবা ঃ ২৫)

[৪.৩] অনেক সময় ঘটনার তৎপরতার বিস্তারিত বর্ণনা ও সংখ্যার কারণে দৃশ্য দীর্ঘ হয়ে যায়। সেই সাথে যে সমস্ত শব্দ সেখানে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যেও পুনরুক্তির ধারণা সৃষ্টি হয়। যেমন এ আয়াতে কারীমা ঃ

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ - يُصْهَرُ بِهٖ مَافِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ - وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ - كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ -

এ দুই বাদী-বিবাদী তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফির তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আরো আছে লোহার হাতুড়ী। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাবে,

তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে— দহনের স্বাদ আস্বাদন করো। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ১৯-২২)

এ এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। শোরগোল ও পুনঃপৌনিকতায় ভরপুর। একদিকে আগুনের পোশাক, আরেক দিকে টগবগ করে ফোটা গরম পানি যা মাথায় ঢালা হবে। যার কারণে পেটের ভেতরের সবকিছু এবং চামড়া গলে পড়ে যাবে। অতিষ্ঠ হয়ে যদি কেউ পালাতে চেষ্টা করে, তখনই লোহার হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে তাকে পূর্বাবস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে দহনের স্বাদ আস্বাদন করো। এ চিত্রটি কল্পনার আয়নায় বার বার প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে কাফিররা বের হতে চাচ্ছে এবং তাদেরকে পিটিয়ে ঢুকান হয়েছে। এ দৃশ্যটি মনে হয় শ্রোতা ও পাঠকদের চোখের সামনেই ঘটে চলেছে।

[৪.৪] অনেক সময় কোন দৃশ্য দীর্ঘায়িত করার জন্য তার মধ্যস্থিত সমস্ত তৎপরতাকে থামিয়ে দেয়া হয়। যেমন ধরুন কিয়ামতের ময়দানে এক জালিম দাঁড়ানো। সম্পূর্ণ একা। বার বার লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশ করছে। মনে হয় আপনি তাকে দেখে একথা বলবেন যে, আরে ভাই ক্ষান্ত হও, এখন লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশ করে আর কী হবে ? দৃশ্য সংঘটিত হওয়ার সময় খুব কম কিন্তু আপনার মনে হবে তা অনেক দীর্ঘ। যেমন —

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا - لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَآءَنِىْ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا -

জালিম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে ঃ হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ চলতাম, আহা! আমি যদি অমুককে বন্ধু বানিয়ে না নিতাম! আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, শয়তান মানুষকে সময় বুঝে ধোঁকা দেয়।

(সূরা আল-ফুরকান ঃ ২৭-২৯)

উল্লেখিত আয়াতে অতীতকালের ক্রিয়াকর্মের ওপর একজন কাফিরের অনুতাপ প্রকাশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে ব্যথার এমন করুণ রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে, যা থেকে আপনা-আপনিই চিত্রের দীর্ঘতা ফুটে উঠে। তার শব্দ অল্প, বেশি নয়। তবু তা থেকে যখন ঘৃণা, ক্ষোভ ও দুঃখের অবস্থার দীর্ঘতা সৃষ্টি হয়েছে তাই কোন ব্যক্তিই তার প্রভাব বলয়ের বাইরে থাকতে পারে না। বস্তুত

এটিই ছিল এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। স্মর্তব্য যে, অপরাধীর অপরাধের স্বীকারোক্তির স্থান ও কাল, দুঃখ ও লজ্জার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চিন্তা করুন, অপরাধীদের এক দলকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ

مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ –

তোমরা কেন জাহান্নামে পড়ে গেলে ? (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪২)

তারা প্রতি উত্তরে বলবে ঃ

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ – وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ – وَكُنَّا
نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ – وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ – حَتّٰى اَتٰنَا
الْيَقِيْنُ –

তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না, অভাগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম, যতোক্ষণ না এ বিষয়ে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত)। (সূরা আল মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪৩-৪৭)

অপরাধীরা শুধু একথা বলে দিলেই পারতো যে, আমরা অবিশ্বাস করতাম এবং মিথ্যে মনে করতাম। কিন্তু তা করে অপরাধের স্বীকারোক্তির সময়কে দীর্ঘায়িত করার মধ্যেও এক ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

[৪.৫] অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কোন দৃশ্যকে দীর্ঘায়িত করার জন্য পূর্বোল্লেখিত যাবতীয় উপকরণের সাহায্য নেয়া হয়। যেমন শাব্দিক বিন্যাস ও মিলের সহযোগিতা নেয়া কিংবা ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা অথবা কখনো দৃশ্যকে স্থির করে দেয়া। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করুন ঃ

نَاذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ – وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً – فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ – وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ
فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ وَّالْمَلَكُ عَلٰى اَرْجَآئِهَا ط وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ
فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ
خَافِيَةٌ –

যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে একটি মাত্র ফুঁক। তখন পৃথিবী ও পর্বতমালাকে উত্তোলন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আটজন ফেরেশতা তোমার পালনকর্তার আরশকে উর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ১৩-১৮)

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاۤؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ - اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ -فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ - فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ - كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ -

অতপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও, তোমরা আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। অতপর সে সুখী জীবন যাপন করবে সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত হবে। (বলা হবে) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ - وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ - يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ - مَاۤ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ - خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ - ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ - ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ - اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ - فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ - وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ - لَا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ -

যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ হায়! আমার আমলনামা যদি না-ই দেয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!

হায় আমার মৃত্যুই যদি শেষ হতো। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারেই এলো না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদের বলা হবে ঃ ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। অতপর তাকে সত্তর গজ শিকল দিয়ে বেঁধে ফেল। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকিনকে খাদ্য প্রদানে উৎসাহিত করতো না। অতএব আজকের দিনে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই এবং তার জন্য কোন খাদ্যও নেই, ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ছাড়া। গুনাহ্‌গার ছাড়া আর কেউ তা খাবে না। (সূরা আল-হাক্কাহ্‌ ঃ ২৫-২৭)

উল্লেখিত দৃশ্য উপস্থাপন করতে কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে এখানে, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দীর্ঘায়িত করা হয়েছে, সুরের রেশও বেশ দীর্ঘ। দৃশ্যের কিছু অংশকে গতিশীল না করে স্থির করা হয়েছে। পুরো দৃশ্যের রঙের মধ্যেও সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। সত্তর গজ শিকলের বর্ণনা চিন্তাকে বিস্তৃত করে দেয়। বস্তুত এ সবকিছুই দীর্ঘতার দাবি রাখে।

৫. যেখানে বিপরীতধর্মী কোন বিষয়ে আলোচনা, যেমন পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সাথে তুলনা করা হয়েছে— সেই দৃশ্যগুলোকে দীর্ঘ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার উদাহরণ হচ্ছে নিচের আয়াত কটি ঃ

اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ - وَمَآ اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ - كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ - يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ - اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ - عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ - تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ - يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ - خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ - وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ - عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ -

নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যিনে। তুমি কি জান ইল্লিয়্যিন কি? এটি লিপিবদ্ধ খাতা। আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম সুখে, সিংহাসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরীর। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। তার মিশ্রণ হবে

তাসনীমের পানি। এটি একটি ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।
(সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১৮২৮)

إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يَضْحَكُوْنَ - وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ - وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلٰى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ - وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ - وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ - فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ -

যারা অপরাধী তারা বিশ্বাসীদের উপহাস করতো এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে যেত তখন পরস্পরে চোখটিপে ইশারা করতো। তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত তখন বলতো নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। আজ যারা বিশ্বাসী তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে দীর্ঘ দুটো দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এক দৃশ্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন নিয়ামত ভোগে লিপ্ত এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখানো হয়েছে কাফিররা মুমিনদের সাথে দুনিয়ায় কিরূপ আচরণ করতো। মুমিনদের সাথে হাসি-তামাশা করা কিভাবে তাদের নেশায় পরিণত হয়েছিল। দুটো দৃশ্যই দীর্ঘ। বিশেষ করে দ্বিতীয় দৃশ্যটি। তার শেষ অংশটি তো অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। আর এ জিনিসটি বুঝানোই এখানে আসল উদ্দেশ্য।

৬. কুরআনে কারীমের যে জায়গায় ঈমানদারগণ এবং তাদের সৎকাজের ছবি আঁকা হয়েছে সে দৃশ্য অনেক দীর্ঘ। সেই দীর্ঘতা বিবেককে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে। এ সমস্ত আয়াতে যারা দৃষ্টি প্রদান করে তাদেরকে আহ্বান জানান হয় যে, তারা যেন ঈমানদারদের সাথে ইবাদতে শরীক হয়ে যায়, যা দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে। এ রকম উদাহরণ আল-কুরআনে অনেক। এখানে আমরা মাত্র একটি উদাহরণ পেশ করলাম।

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ - الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ

سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ
اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ - رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا
مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ق رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ - رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا
وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ -

নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে ঃ) পরওয়ারদিগার! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি, সকল পবিত্রতা আপনার, আমাদেরকে আপনি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলেন তাকে অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়লেন। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে। (এই বলে যে) 'তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন' তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব্ব! অতএব আমাদের সকল অপরাধ মাফ করে দিন এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দিন নেক লোকদের সাথে। হে আমাদর পালনকর্তা! আমাদেরকে দিন, যা আপনি ওয়াদা করেছেন আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯০-১৯৫)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ -

অতপর তাদের পালনকর্তা তাদের এ দো'আ (এই বলে) কবুল করে নিলেন, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না। তা সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। তোমরা পরস্পর এক। তারপর যারা হিজরত করেছে, নিজেদের দেশ থেকে যাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে। আর যারা লড়াই করেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে অবশ্যই তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করবো এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। যার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহমান। এ হচ্ছে বিনিময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্র নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯৫)

কোন্ ব্যক্তি এমন আছে, যে খুশুখুজুতে ভরপুর এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী এ দৃশ্য দেখে তার মন বিগলিত হবে না এবং সে ঐ জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের মতো দরবারে বারী তা'আলায় হাত উঠিয়ে নিজেকে ঐ রকম বিনয় ও নম্রতার চরম শিখরে আরোহণ করাবে না। বিশেষ করে যখন ঈমানদারদের ত্যাগের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং পরকালের নেয়ামতের জন্য তাদের প্রতীক্ষায় থাকার কথা বলা হচ্ছে। মহান দয়ালু আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির দো'আকে কবুল না করেই পারেন না। অবশ্যই তাকে সেসব বস্তু প্রদান করবেন যা ঈমানদারদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

যখনই পুরোপুরি মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করা হবে তখনই এ ধরনের অগণিত জীবন্ত দৃশ্যসমূহ লক্ষ্য করা যাবে। আল-কুরআনের একজন পাঠক যখন চুলচেরা বিশ্লেষণসহ কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকে তখন তার সামনে জ্ঞান ও রহস্যের নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। শব্দ ও অর্থের সামঞ্জস্যতা, ছন্দ ও বিন্যাসের সৌন্দর্য, মনোহরী বর্ণনা এবং তার সম্মোহনী প্রভাব, বিষয়সমূহের যোগসূত্র ও সন্নিবেশিতা, বক্তব্য উপস্থাপনের সূক্ষ্মতা ও স্টাইল, ঘটনাবলীর শৈল্পিক চিত্র, মনমোহনী সুর, এক অংশের সাথে আরেক অংশের সম্পর্ক উপস্থাপনের নতুন নতুন ধরন ও পদ্ধতি ইত্যাদি। যেগুলোর সমন্বয়ে আল-কুরআনের অলৌকিকতা ও রহস্যময়তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনা করা আল-কুরআনের মূল উদ্দেশ্য নয়। যদিও এর মধ্যে সেই বিষয়বস্তু এবং স্টাইল অবলম্বন করা হয়, যা গল্প-উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্য। গল্প-উপন্যাস লেখার সেই শৈল্পিক দিকটি অনুসরণ করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটি কিছুটা ভিন্ন। আল-কুরআন দ্বীনি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আনুসাঙ্গিক যেসব উপকরণ গ্রহণ করেছে ঘটনাবলী সেসব উপকরণের অন্যতম একটি উপকরণ। কুরআনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দাওয়াতে দ্বীন এবং কাহিনী চিত্র হচ্ছে ঐ দাওয়াতকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মানুষের নিকট পৌঁছানোর একটি মাধ্যম মাত্র। কুরআন যে উদ্দেশ্যে কিয়ামত এবং আখিরাতে সওয়াবের চিত্র তুলে ধরেছে, যে উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের তথ্য পেশ করেছে, যে উদ্দেশ্যে শরীয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য উদাহরণ উপমা বর্ণনা করেছে, ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে কাহিনী চিত্রও উপস্থাপন করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনি দাওয়াতকে মানুষের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে পৌঁছে দেয়া।

সত্যি কথা বলতে কি, কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী ও তার বিষয়বস্তু নিজস্ব স্টাইলে এবং নিখুঁতভাবে দ্বীনি উদ্দেশ্যকে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। (সামনে আমরা তার ধরন ও নমুনা বর্ণনা করবো।) তাই বলে দ্বীনি উদ্দেশ্যের অধীন হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ঘটনাবলী উপস্থাপনের সময় শৈল্পিক দিকটির প্রতি লক্ষ্যই রাখা হবে না। বরং ঘটনাবলী দ্বীনি উদ্দেশ্যকে পুরো করার সাথে সাথে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যসমূহও ধারণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের বর্ণনা ও উপস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণই হচ্ছে চিত্রায়ণ। যা বর্ণনার অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ।

ইতোপূর্বে আমরা বলেছি আল-কুরআনের প্রতিটি নিয়ম দ্বীনি ও শৈল্পিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপূরক। আল-কুরআনে উপস্থাপিত প্রতিটি ছবি ও দৃশ্য উভয় গুণেই গুণান্বিত। আমরা আরও বলেছিলাম, আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য মানুষের মনোজগতের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

কারণ মনোজগতের সেই দ্বীনি অনুভূতিকে শৈল্পিক সৌন্দর্যের ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, দ্বীন এবং শৈল্পিকতা একে অপরের পরিপূরক এবং তার অবস্থান মানুষের মনের গভীরে। সে জন্য মানুষের বিবেক তখনই তা গ্রহণ করে যখন শৈল্পিক সৌন্দর্য সর্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে উপনীত হয় এবং তার সাথে সাথে মন ও মানস সেই সৌন্দর্য সুষমার আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

আমরা 'শৈল্পিক চিত্র' অধ্যায়ে কাহিনী চিত্রের দুটো উদাহরণ পেশ করেছি। সেখানে প্রকৃতি তার তুলি দিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছবি এঁকেছে। যা মানুষকে প্রভাবিত না করে পারে না। আমরা সেখানে এর বিস্তারিত আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এখন আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ্।

আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আমরা পূর্বে বলেছি, একমাত্র দ্বীনি উদ্দেশ্যকে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যেই আল-কুরআনে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দ্বীনি উদ্দেশ্যের গণ্ডি বড় বেশি প্রশস্ত। তাই আল-কুরআন সমস্ত দ্বীনি উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্যই ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছে। যেমন ওহী ও রিসালাতের স্বীকৃতি, তাওহীদ, বিভিন্ন নবীদের দ্বীন এক, সমস্ত নবীদের সাথে আচরণের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন, কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, ভাল ও মন্দের পরিণতি, ধৈর্য ও স্থৈর্য, শোকর ও কুফর এবং আরো অনেক উদ্দেশ্যকে তার লক্ষ্যে পৌছে দেয়ার জন্য কুরআন কাহিনী চিত্রের সাহায্য নিয়েছে।

১. ওহী ও রিসালাতের স্বীকৃতি ঃ আমরা আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করবো। তার পরিধি ও বিস্তৃতিকে করায়ত্ত করার জন্য নয়। আল-কুরআনে ঘটনাসমূহ বর্ণনা করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ওহী ও রিসালাতের স্বীকৃতি এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের যুক্তি উপস্থাপন করা।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম (স) প্রচলিত অর্থে কোন লেখাপড়া জানতেন না। এমনকি ইহুদী কিংবা খ্রীস্টান কোন আলিমের সাথেও তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। যাতে তিনি কুরআনের মাধ্যমে এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করতে পারেন। অনেক ঘটনাতো তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন আবার কোন কোনটি আংশিক যেমন, হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা। কুরআনে এসব ঘটনার আলোচনা একথাই প্রমাণ করে যে, এগুলো তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানান হয়েছে। কুরআন তো এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। যেমন সূরা ইউসুফের শুরুতেই বলা হয়েছে।

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ -

আমি এ কুরআনকে আরবীতে অবতীর্ণ করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার। (সরা ইউসুফ ঃ ২)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ق وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ -

আমি তোমার নিকট একটি উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, যেভাবে আমি এ কুরআনকে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। অবশ্য তুমি এর পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩)

সূরা কাসাসে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে ঃ

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَا مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

আমি তোমার কাছে মূসা ও ফিরাউনের ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা আল-কাসাস ঃ ৩)

যেখানে এ ঘটনা শেষ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ - وَلٰكِنَّا أَنْشَانَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ج وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا لا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ - وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ -

মূসাকে যখন আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে ছিলে না এবং তা প্রত্যক্ষও করনি। কিন্তু আমি অনেক জাতি সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিলে না, যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো। কিন্তু আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। আমি যখন মূসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম,

তখন তুমি তুর পর্বতের পাশে ছিলে না। কিন্তু এটি তোমার পালনকর্তার রহমত স্বরূপ। যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে ভীতি প্রদর্শন করতে পার, যাদের কাছে ইতোপূর্বে আর কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। যেন তারা স্মরণ রাখে (সূরা আল-কাসাস ঃ ৪৪-৪৬)

হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা আলে-ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ط وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ص وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ -

এ হলো গায়েবী সংবাদ যা আমি তোমাকে প্রদান করে থাকি। আর তুমিতো সে সময় ছিলে না যখন তারা প্রতিযোগিতা করছিল, কে মরিয়মের অভিভাবকত্ব লাভ করবে। আর তখনও তুমি ছিলে না যখন তারা ঝগড়া-বিবাদ করছিল। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৪)

হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার পূর্বে সূরা সা'দ-এ বলা হয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ نَبَؤٌ عَظِيْمٌ - اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ - مَاكَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ - اِنْ يُّوْحٰى اِلَىَّ اِلَّا اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَلِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ -

বলো, এটি এক মহাসংবাদ, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না, যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। আমার কাছে এ ওহী-ই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (সূরা সা'দ ঃ ৬৭-৭১)

সূরা হূদে নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ج مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَاقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا -

এটি গায়েবের খবর, আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। ইতোপূর্বে এটি তোমার ও তোমার জাতির জানা ছিল না। (সূরা হূদ ঃ ৪৯)

২. **এক ও অভিন্ন দ্বীন ঃ** আল-কুরআনে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে,

সকল দ্বীন-ই আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত। ঈমানদারগণ এক উম্মত বা দল। আর আল্লাহ্ সবার প্রতিপালক। আল-কুরআনের অনেক জায়গায় বিভিন্ন নবীদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত নবীদের দ্বীনও যে এক এবং অভিন্ন একথা বলাও ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য। এজন্য সামান্য রদবদল করে নবীদের কাহিনী আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বার বার বলা হয়েছে। যেন মানুষ বুঝতে পারে, সমস্ত নবী ও রাসূলগণ একই দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। নিচে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ -
الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ -

আমি মূসা ও হারুনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ আলো ও উপদেশ, আল্লাহ্ভীরুদের জন্য। যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কিয়ামতের ভয়ে শংকিত হয়। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৪৮-৪৯)

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ط اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ - وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ
اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ - اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ
مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ -

এটি কল্যাণকর নসীহত, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, তবু কি তোমরা তা অস্বীকার করবে ? আর আমি ইতোপূর্বে ইবরাহীমকে সত্যাশ্রয়ী করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। যখন সে তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ এ মূর্তিগুলো কী, তোমরা যাদের পূজারী হয়ে বসে আছ ? (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৫১-৫২)

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ -
وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ط وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ -
وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ
وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ -

আমি তাকে (ইবরাহীম) ও লুতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছে দিলাম,

যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি। আমি তাকে দান করলাম ইসহাক এবং পুরস্কার স্বরূপ দিলাম ইয়াকুবকে এবং প্রত্যেককেই সৎকর্মশীল বানালাম। আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী পথ প্রদর্শন করতো। আমি তাদের প্রতি ওহী নাযিল করতাম— সৎকাজ করার, নামায কায়েম করার ও যাকাত আদায়ের জন্য। তারা আমার ইবাদতে মশগুল ছিল। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭১-৭৩)

وَلُوطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ - وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ -

এবং আমি লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর তাকে এ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ - وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

এবং স্মরণ কর নূহকে, যখন সে এর পূর্বে দো'আ করেছিল এবং আমি তার দো'আ কবুল করেছিলাম। তারপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আমি তাকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়ই তারা ছিল দুষ্ট সম্প্রদায়; এজন্য তাদের সকলকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম।

(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৭৬-৭৭)

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ - فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ج وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط

وَكُنَّا فَعِلِيْنَ - وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ
بَأْسِكُمْ ج فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُوْنَ -

এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানকে, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল। সেখানে রাতে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল, তাদের বিচার আমার সামনে ছিল। অতপর আমি সুলাইমানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পাখীকূলকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। এ সমস্ত আমিই করেছিলাম। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে? (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৭৮-৮০)

وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا
فِيْهَا ط وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِمِيْنَ - وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهُ
وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ج وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ -

আর সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে। তা তার আদেশে প্রবাহিত হতো ঐ দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছিলাম। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি। আর অধীন করে দিয়েছিলাম শয়তানদের কতককে যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করতো। এছাড়া অন্য আরো অনেক কাজ করতো। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।
(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮১-৮২)

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادٰى رَبَّهُ أَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ -
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ
مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ -

স্মরণ করো আইউবের কথা যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বললোঃ 'আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান'। আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম। আর তার পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত। বস্তুত এটি ইবাদতকারীদের জন্য একটি স্মারক। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৩-৮৪)

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَاالْكِفْلِ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ - وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

আর ইসমাঈল, ইদ্রিশ ও যুলকিফ্‌লের কথা স্মরণ করো, তারা প্রত্যেকেই ছিল সবরকারী। আমি তাদেরকে আমার রহমত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা সবাই ছিল সৎকর্মশীল। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৫-৮৬)

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ لا وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ -

এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করো, সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল আর মনে করেছিল যে, আমি তাকে পাকড়াও করতে পারবো না। অতপর সে অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলো, 'তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তুমি নির্দোষ আমি গুনাহ্গার, তারপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।
(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৭-৮৮)

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করো, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখ না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিশ। অতপর আমি তার দো'আ কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়াকে এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে সন্তান ধারণের যোগ্য বানিয়ে দিয়েছিলাম, তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

এবং সেই নারীর (অর্থাৎ মারইয়ামের) কথা স্মরণ করো, যে তার কাম-প্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়েছিলাম। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৯১)

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ -

তারা সকলেই তোমাদের দ্বীনের— একই দ্বীনে বিশ্বাসী এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার ইবাদত করো।

আল-কুরআনে কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য এটিই। এছাড়া আর যতো উদ্দেশ্য আছে তা মুখ্য নয় গৌণ।

৩. আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান ঃ আল-কুরআনে কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য শুধু এই নয় যে, সমস্ত দ্বীন লা-শরীক এক আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে একথা প্রমাণ করা; বরং একথাও প্রমাণ করা যে, এ সবগুলো দ্বীনের ভিত্তিও এক। সব নবীদের কাহিনী একত্রিত করলে বুঝা যায়, তাদের সর্বপ্রথম দাওয়াত ছিল ঈমান বিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমানের। যেমন ঃ সূরা আল-আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছি। সে বললো ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৫৯)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ -

আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছি। সে বললো ঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি ভয় করবে না?

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ -

সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহ্কে। সে বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাষ্য (ইলাহ্) নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

আমি মাদইয়ানবাসীর জন্য তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছি, সে বললো ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৮৫)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে তওহীদ হচ্ছে মূল বা ভিত্তি। আর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামই তওহীদের মুবাল্লিগ ছিলেন। যেহেতু তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল এক তাই তাদের ঘটনাবলীর মধ্যেও সামঞ্জস্য দেখা যায়।

৪. সমস্ত নবী-রাসূল একই পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন ঃ ওপরে আলোচনা থেকেও একথা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল এক ও অভিন্ন। আর প্রত্যেক নবীর জাতি তাদের সাথে যে আচরণ করেছে তাও প্রায় একই রকম। কারণ, সকল নবীর দ্বীন মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং সকল দ্বীনের ভিত্তিও এক। এ কারণেই নবীদের কাহিনীগুলো অধিকাংশ জায়গায় একত্রে এসেছে এবং তাদের একই ধরনের কার্যকলাপের বিবরণ বার বার পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা হুদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ - فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ج وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ -

অবশ্যই আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম। (সে জাতিকে বললোঃ) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ্

ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। কেননা আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির ভয় করছি। তখন তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী গোত্রপতি ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বললো ঃ আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। আর আমাদের মধ্যে যারা নিঃস্ব ও নির্বোধ তারা ছাড়া আর কাউকে তোমার আনুগত্যও করতে দেখি না। তাছাড়া আমাদের ওপর তোমার কোন প্রাধান্যও নেই বরং তোমাকে আমরা মিথ্যেবাদী মনে করি।

নূহ (আ) বললেন ঃ

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ –

হে আমার জাতির লোকেরা! তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাই না। আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই আমার পারিশ্রমিক চাই। (সূরা হুদ ঃ ২৯)

নূহ (আ)-এর জাতি বললো ঃ

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ –

হে নূহ! আমাদের সাথে তুমি তর্ক করছ এবং অনেক ঝগড়া-বিবাদ করছ। এখন তুমি তোমার সেই আযাব নিয়ে এসো, যে সম্পর্কে তুমি আমাদেরকে সতর্ক করছ। যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (সূরা হুদ ঃ ৩২)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ – اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ – يٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ – وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ – قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ – اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ

أُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ
جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنَ -

আর আ'দ জাতির প্রতি তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছি, সে বললো ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই। তোমরা সবাই মিথ্যারোপ করছ। হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো তাঁর কাছেই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবু তোমরা কেন বুঝ না ? হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করো। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি উত্তর-উত্তর বৃদ্ধি করবেন। তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মতো হয়ো না। তারা বললো ঃ হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি, কাজেই আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না। আর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতেও পারি না। বরং আমরা মনে করি তোমার ওপর আমাদের কোন দেবতার মার পড়েছে। হূদ বললো ঃ আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, আমার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ। তাঁকে ছাড়া। তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতপর আমাকে কোন অবকাশ দিয়ো না। (হূদ ঃ ৫০-৫৫)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرُهٗ ط هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ
تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ - قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا
مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ
مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ -

আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বললোঃ হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তিনি জমিন থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যেই তোমাদেরকে বসবাস করাচ্ছেন। অতএব, তাঁর কাছে মাফ চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন সন্দেহ নেই। তারা বললো ঃ হে সালেহ! ইতোপূর্বে তোমার নিকট

আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূঁজা করতো, তুমি তা থেকে আমাদেরকে বারণ করছ ? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছ, তাতে আমাদের এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না। (সূরা হুদ ৬১-৬২)

৫. প্রত্যেক নবী-রাসূলদের দ্বীনের যোগসূত্র ঃ আল-কুরআনে কাহিনী বর্ণনার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী করীম (স)-এর দ্বীন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) সহ অতীতের সকল নবীর দ্বীন যে একই সূত্রে বাধা। বিশেষ করে বনী ইসরাঈল ও উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে দ্বীনের যোগসূত্র অন্যান্য নবীর দ্বীনের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী তা প্রমাণ করা। এজন্য আল-কুরআনের যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন —

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى - صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى -

এটি লিখিত আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, (বিশেষ করে) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবে। (সূরা আল-আ'লা ঃ ১৮-১৯)

اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى - وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى - اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

তাকে কি জানান হয়নি, যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল ? কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারো গুনাহ্ নিজে বহন করবে না। (নাজম ঃ ৩৬-৩৮)

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মানুষের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৮)

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ -

তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৮)

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ - وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ -

আমি তাদের পেছনে মারইয়াম তনয় ঈসাকে পাঠিয়েছি। সে পূর্ববর্তী তওরাত গ্রন্থের সত্যায়নকারী ছিল। আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ বাণী। ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা পাপাচারী। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ। যা পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।
(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪৬-৪৮)

৬. নবী-রাসূলদের সফলতা ও মিথ্যেবাদীদের ধ্বংস ঃ আল-কুরআনে কাহিনী বর্ণনার আরেক উদ্দেশ্য হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরামের সফলতা ও মিথ্যেবাদীদের ধ্বংসের কথা তুলে ধরা। যেন তা নবী করীম (স)-এর জন্য সান্ত্বনার কারণ হয় এবং তাদের জন্যও সান্ত্বনা এবং আদর্শ হয় যারা ঈমানের পথে লোকদেরকে আহ্বান করে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ -

আমি নবী-রাসূলদের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলেছি, যা দিয়ে তোমার অন্তরকে মজবুত করেছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মারক এসেছে। (সূরা হূদ ঃ ১২০)

কুরআন মজীদে যেখানেই নবীদের কথা ও তাদের সফলতার কথা বলা হয়েছে, তার পরপরই ঐ সমস্ত কাফির মুশরিকদের পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যারা নবীদেরকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করতো। যেমন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ط فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ - فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে সাড়ে নয়শ' বছর তাদের সাথে ছিল। তারপর তাদেরকে মহাপ্লাবন এসে ধ্বংস করে দিলো কেননা তারা ছিল পাপী। অতপর আমি নূহকে ও নৌকার আরোহীদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং নৌকাটিকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়ে রাখলাম।

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

স্মরণ করো ইবরাহীমকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাকে ভয় করো। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ১৬)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ز مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ - .... اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ - وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম। যখন সে তার জাতিকে বললো ঃ তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। তোমরা কি সমকামে লিপ্ত হচ্ছো, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ ? জবাবে তাঁর জাতি কেবল একথা বললো ঃ আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র আযাব আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।....... যখন প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে পৌঁছল তখন তাদের কারণে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বললো ঃ ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না, আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবোই, শুধু আপনার স্ত্রী ছাড়া। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলভুক্ত থাকবে। আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করবো তাদের পাপাচারের কারণে। আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ - فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ -

আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যেবাদী বললো। অতপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (আনকাবুত ঃ ৩৬-৩৭)

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ - وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ - وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ - فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ -

আমি আ'দ ও সামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের বাড়িঘর দেখেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, তারা ছিল হুশিয়ার। আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকে ধ্বংস করে দিয়েছি। মূসা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছিল কিন্তু তারা দম্ভ-অহংকারে লিপ্ত ছিল, তাই বলে তারা জিতে যায়নি। আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো কাছে পাঠিয়েছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। (সূরা আনকাবুত ঃ ৩৮-৪০)

৭. সুসংবাদ ও সতর্কীকরণের সত্যতা ঃ আল-কুরআনে ঘটনাবলী বর্ণনার আরেকটি কারণ হচ্ছে— ঈমানদারদেরকে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের সুসংবাদ ও তার সত্যতার প্রমাণ করা এবং অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নাম ও তার দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে সতর্ক করা এবং তার সত্যতা প্রমাণ করা। যেমন—

বলা হয়েছে ঃ

نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ
الْاَلِيْمُ -

(হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল-দয়ালু। আর আমার শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

(সূরা আল-হিজর ঃ ৪৯-৫০)

এ আয়াতের পরপরই ক্ষমা ও শাস্তির সত্যতা সংক্রান্ত এ ঘটনাটি বলা হয়েছে ঃ

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ - اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ
اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ - قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ -

তুমি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দাও। যখন তারা তার বাড়িতে আগমন করলো এবং বললো ঃ সালাম। সে বললো ঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত। তারা বললো ঃ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি। (হিজর ঃ ৫১-৫৩)

তারপরই আল্লাহ্‌র রহমতের ফল্গুধারা প্রকাশিত হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَ اٰلَ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلُوْنَ - قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ - قَالُوْا
بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ - وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ - فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ - وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ
الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ -

অতপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌছল, সে বললো ঃ তোমরা তো

অপরিচিত লোক। তারা বললো ঃ না বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করতো। আমরা আপনার নিকট সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। অতএব আপনি শেষ রাতে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যাবেন এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন না। আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে যাবার নির্দেশ পেয়েছেন সেখানে যাবেন। আমি লূতকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে।

(সূরা আল-হিজর ঃ ৬১-৬৬)

উল্লেখিত আয়াতে হযরত লূত (আ)-এর ওপর রহম এবং তাঁর জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। একটু সামনে অগ্রসর হয়ে এ সূরায়ই বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ - وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ - فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

নিশ্চয়ই হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করতো। অতপর একদিন সকাল বেলা তাদেরকে একটি শব্দ এসে আঘাত করলো, তখন কোন উপকারেই এল না, যা তারা উপার্জন করেছিল। (সূরা হিজর ঃ ৮০-৮৪)

এসব আয়াতে মিথ্যেবাদীদেরকে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ্র ওয়াদা সঠিক ও কার্যকরী তাও প্রমাণ করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ ঘটনাগুলো সেভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে যেভাবে তা সংঘটিত হয়েছে।

৮. নবী-রাসূলদেরকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের বর্ণনা ঃ নবী ও রাসূলদের ওপর যেসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে তা বর্ণনার জন্যও আল-কুরআনে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। যেমন হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান (আ), হযরত আইউব (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), মারইয়াম ও হযরত ঈসা (আ)-এর ঘটনাবলী। এ সমস্ত কাহিনী আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ও সূরায় আলোচিত হয়েছে। প্রথম লক্ষ্য

নিয়ামত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া, সেই সাথে অবশ্য তাদের কিছু কার্যাবলীর বর্ণনাও প্রাসঙ্গিকভাবে চলে এসেছে।

৯. আদম সন্তানকে শয়তানের শত্রুতা থেকে সতর্ক করা ঃ কুরআন মজীদে যেসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে— হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যতো লোক পৃথিবীতে এসেছে এবং আসবে শয়তান তাদের প্রত্যেকের শত্রু, এ কথাটি বুঝিয়ে দেয়া। প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। কস্মিনকালেও সে মানুষের মঙ্গল চায় না। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ হিসেবে হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় শয়তানের অপতৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. অন্যান্য আরও কতিপয় কারণ ঃ আল-কুরআনে উপরোক্ত কারণ ছাড়াও নিম্নোক্ত কতিপয় কারণে বিভিন্ন ঘটনাবলী ও কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ঃ

[১০.১] আল্লাহ্র কুদরতের প্রকাশ— যেমন আদম ও ঈসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা, হযরত ইবরাহীম (আ) ও পাখির ঘটনা, ঐ ব্যক্তির ঘটনা [হযরত উযাইর (আ)] যে মরার একশ' বছর পর জীবিত হয়েছিলেন। এ রকম আরও কিছু ঘটনাবলী।

[১০.২] ভাল ও কল্যাণকর কাজ এবং খারাপ ও অকল্যাণকর কাজের পরিণতি বর্ণনা, যেমন— আদম (আ)-এর দুই ছেলের ঘটনা, দুই বাগান মালিকের ঘটনা, বনী ইসরাঈলের ঘটনা, আসহাবে উখদুদের ঘটনা ইত্যাদি।

[১০.৩] মানুষের স্বভাব তাড়াহুড়া করা এবং তাড়াতাড়ি পাবার প্রচেষ্টা। এজন্য সে যা নগদ পায় অথবা যার বাস্তবতা আছে তার জন্য প্রচেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ্ তাদেরকে প্রকৃত কল্যাণের জন্য অপেক্ষা ও ধৈর্যের গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এজন্য মানুষের তাড়াহুড়া ও আল্লাহ্র ধীর-স্থিরতার পরিণতি সম্পর্কেও কুরআনে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন— হযরত মূসা (আ) ও আল্লাহ্র এক বান্দার (খাজা খিযিরের) ঘটনা। যে সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করবো। এ ধরনের বিষয়বস্তুর ওপর আল-কুরআন অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছে। যা তার উদ্দেশ্যকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে।

নবম অধ্যায়

আল-কুরআনের ঘটনাবলী দ্বীনি উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়ার প্রমাণ

১. আমরা ইতোপূর্বে বলেছি, যে সমস্ত ঘটনাবলী আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা দ্বীনি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপূরক। ঘটনাগুলো যে দ্বীনের অনুগামী তার প্রমাণ কাহিনীগুলোতেই বিদ্যমান। আমি নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। সেসব ঘটনাবলী দ্বীনি উদ্দেশ্যের পরিপূরক হওয়ার প্রথম প্রমাণ হচ্ছে— একই ঘটনা বিস্তারিত কিংবা সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েক জায়গায় তার পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু ভাবনার বিষয় হচ্ছে, সেখানে পুরো ঘটনা বর্ণিত হয়নি, বর্ণিত হয়েছে ঘটনার বিশেষ বিশেষ অংশ।— খাস করে ঐ অংশগুলো বর্ণিত হয়েছে যেখানে উপদেশ ও শিক্ষা বর্তমান— সম্পূর্ণ ঘটনা একই সাথে বর্ণিত হয়েছে কদাচিত এমন ঘটেছে। তা-ও করা হয়েছে বিশেষ কারণ, পরম্পরা ও উপযোগিতাকে সামনে রেখে। অবশ্য ঘটনা বর্ণনার সময় আমি এ ব্যাপারে আভাস দিয়েছি।

যখন পাঠক ঘটনার পুনরাবৃত্তির অংশগুলো পাঠ করেন এবং তার পূর্বাপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখন পুরো ঘটনাটিকেই সংগতিপূর্ণ বলে দেখতে পান। পাঠক মনে করেন যেখানে যে অংশ নেয়া হয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তা যথার্থ। তিনি বিস্মৃত হন না যে, আল-কুরআন মূলত একটি দাওয়াতী কিতাব। এজন্য ঘটনার যে অংশ যেখানে বর্ণিত হয়েছে তা দাওয়াতী বিষয়ের সাথে পুরোপুরি মিল রেখেই বর্ণিত হয়েছে। আর ঘটনার মিলটাও আল-কুরআনের অন্যতম লক্ষ্য। সবসময়ই এমন হয়। কিন্তু ঘটনার শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ তা থেকে প্রভাবিত হতে দেখেন না।

একই ঘটনার বিভিন্ন অংশ বার বার উপস্থাপনের জন্য গোছান একটি নীতিমালাও আছে। যে ক্রমানুসারে আল-কুরআনের সূরা অবতীর্ণ হয়েছে সেই ক্রমানুসারে সূরাগুলো এবং ঘটনার অংশগুলো মিলিয়ে পড়লেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে। পরে পর্যায়ক্রমে

তা পূর্ণত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেখানে বর্ণনা শেষ করা হয়েছে সেখানে পাঠক পৌঁছলেই পুরো চিত্রটি তার সামনে ভেসে উঠে।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বলতে পারি। কেননা আল-কুরআনে যে সমস্ত ঘটনা বার বার বলা হয়েছে তার মধ্যে এ ঘটনাটি অত্যাধিকবার বর্ণিত হয়েছে। তার সংখ্যা প্রায় ত্রিশের মতো হবে। আমরা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থান নিয়ে আলোচনা করবো এবং সে স্থানগুলোও চিহ্নিত করবো যেখানে শুধুমাত্র মূসা (আ)-এর ঘটনার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে কিন্তু বিস্তারিত কিছু বর্ণনা করা হয়নি। আমরা সূরাসমূহ অবতীর্ণের ক্রমানুসারে তার আলোচনা করবো।

[১.১] সূরা আল-আ'লা যার অবস্থান অবতীর্ণের ক্রমানুসারে ৮ম। সেখানে মূসা (আ)-এর ঘটনার সামান্য ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى - صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى -

এটি লিখিত আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, ইবরাহীম ও মূসার কিতাবে।

এরূপ সম্মিলিত ইঙ্গিত সূরা আন-নাজমেও দেয়া হয়েছে এবং তা অবতীর্ণের দিক দিয়ে ২৩তম সূরা।

[১.২] সূরা আল-ফজর, অবতীর্ণের ক্রমানুসারে ১০ম সূরা। এখানে ফিরাউনের কথা বর্ণিত হয়েছে কিন্তু মূসা (আ)-এর কথা নয়। অবশ্য আ'দ ও সামুদ জাতির কথাও বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ - الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ - فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ - فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ -

এবং বহু কীলকের অধিপতি ফিরাউনের সাথে। যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল, ফলে সেখানে সাংঘাতিক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। অতপর তোমার রব্ব তাদেরকে শাস্তির কষাঘাত করলেন।

এ ধরনের ইঙ্গিতসূচক বর্ণনা সূরা আল-বুরুজেও করা হয়েছে। যার অবতীর্ণের ক্রমধারা সাতাইশ।

[১.৩] সূরা আল-আ'রাফ, অবতীর্ণের ক্রমধারা উনচল্লিশ। এ সূরায় বেশ কিছু নবী-রাসূলদের আলোচনা এসেছে, তার মধ্যে মূসা (আ)-এর ঘটনাটিও মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেসব নবীদের কথা বর্ণিত হয়েছে যারা

তাদের জাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সবাই নিজেদের নবীকে মিথ্যেবাদী বলেছে এবং পরিণতিতে তারা আল্লাহ্‌র আযাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সূরা আল-আ'রাফে ঘটনার শুরু হয়েছে হযরত মূসা ও হারুন (আ)-কে নবী করে ফিরাউনের কাছে পাঠানোর প্রসঙ্গ নিয়ে। তারপর লাঠি ও হাত উজ্জ্বল হওয়ার মুজিযা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারপর যাদুকরদের জমায়েত ও মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে যাদু প্রদর্শন। মূসা (আ) তাদের মুকাবিলায় বিজয় লাভ করা, যাদুকরদের ঈমান গ্রহণ, তারপর ফিরাউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলকে নির্যাতনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে কি কি মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে টিড্ডি, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা ছিল অন্যতম। প্রতিবারই হযরত মূসা (আ)-কে দিয়ে দো'আ করিয়ে পরিত্রাণ লাভ। পুনরায় আবার বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন, তারপর মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ। তারপর তারা মূসা (আ)-কে বললো ঃ মিসরীয়দের যেমন অনেক মাবুদ তদ্রূপ আমাদেরও থাকা উচিত। অতপর মূসা (আ)-এর তুর পাহাড়ে গমন ত্রিশরাত পর আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত লাভ এবং মেয়াদ বাড়িয়ে চল্লিশ রাত করা এবং চল্লিশ রাত অতিবাহিত হওয়া, আল্লাহ্‌র দর্শনের জন্য হযরত মূসা (আ)-এর আবেদন, পাহাড় খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া, মূসা (আ)-এর বেহুঁশ হওয়া, তারপর জ্ঞান ফিরে পাওয়া। নিজের সম্প্রদায়ের কাছে এসে দেখেন তারা গো-শাবক বানিয়ে তার পূজা করছে, ভাইকে ভর্ৎসনা, পুনরায় আল্লাহ্ দর্শনের জন্য ৭০ জনের পরীক্ষা, যখন তারা তূর প্রান্তরে আল্লাহ্‌র দীদারের জন্য পীড়াপীড়ি করলো তখন তূর পাহাড়কে তাদের ওপর তুলে ধরা। তারপর তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত দানে ধন্য করা হলো এবং বলে দেয়া হলো, আল্লাহ্‌র রহমত তারাই পাবে যারা নবীর আনুগত্য করে।

[১.৪] তারপর অবতীর্ণের ক্রমানুসারে ৪২তম সূরা, সূরা আল-ফুরকান ও ৪৪তম সূরা, সূরা মারইয়ামে সম্মিলিত কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সে ঘটনাবলীতে নবীদের রিসালাত ও তাদেরকে যারা মিথ্যেবাদী বলেছে তাদের পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[১.৫] অবতীর্ণের ক্রমধারায় ৪৫তম সূরা, সূরা ত্বা-হা'র মধ্যেও মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। সূরা আ'রাফে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা শুরু হয়েছিল নবুওয়াত ও রিসালাতের কথা বলে। অর্থাৎ সে ঘটনাটি ছিল নবুওয়াতের পরের আর সূরা ত্বা-হা'য় নবুওয়াতের পূর্বের ঘটনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। তূর পাহাড়ের প্রান্ত থেকে আলো প্রদর্শনের কথা দিয়ে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى - اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْ
اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْاَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى -
فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى - اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج اِنَّكَ
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى - وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى -

তোমার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? সে যখন আগুন দেখলো, তখন পরিবারবর্গকে বললো : তোমরা এখানে অবস্থান করো, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারবো অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব। অতপর যখন সে আগুনের কাছে পৌছল তখন আওয়াজ এলো, হে মূসা! আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতো খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় অবস্থান করছ। আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, কাজেই যে প্রত্যাদেশ হয় শুনতে থাক। (সূরা ত্বা-হা : ৯-১৩)

যখন হযরত মূসা (আ) ফিরাউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্য আদিষ্ট হলেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করলেন— আমার ভাই হারুনকে আমার সহযোগী করে দিন যেন সে আমার জন্য সাহস ও শক্তির কারণ হয়। আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-কে যে নিয়ামত দিয়েছেন এবং তাঁর ওপর যে দয়া করেছেন তার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। শৈশবের ঘটনা এবং তাঁর মা'কে তার কাছে প্রত্যাবর্তন করানোর ঘটনা। পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সূরা আল-আ'রাফের মতো। তবে টিড্ডি, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্তের শাস্তির কথা বাদ দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে ফিরাউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলকে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং তা ভঙ্গের ঘটনাও বিবৃত করা হয়নি। তবে সূরা ত্বা-হা'য় অন্য একটি ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। তা হচ্ছে— সামেরী নামে এক ব্যক্তি যে বাছুর তৈরী করেছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা।

[১.৬] সূরা শু'আরা অবতীর্ণক্রম অনুযায়ী ৪৬তম সূরা। এ সূরায়ও হযরত মূসা (আ)-এর রিসালাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারপর বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগের ঘটনা বলা হয়েছে। তবে এ সূরায় দুটো কথা নতুন বলা হয়েছে।

এক : মূসা (আ) এক কিবতীকে হত্যা করেছিলেন। তারপর তিনি ধরা পড়ার ভয়ে মিসর ত্যাগ করেন। যখন পুনরায় ফিরাউনের কাছে তাকে পাঠানো হয় তখন ফিরাউন মূসা (আ)কে শৈশবে প্রতিপালনের কথা এবং কিবতীকে হত্যা করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুই ঃ সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে তলদেশে রাস্তা হয়ে যাওয়া এবং মূসা (আ) ও ফিরাউনের বিতর্কের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। মূসা (আ) কর্তৃক আল্লাহ্র গুণাবলী বর্ণনা এবং যাদুকরদের সাথে যে কথোপকথন হয়েছিল তা নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনা।

[১.৭] অবতীর্ণক্রমে ৪৮ম সূরা, সূরা আন-নামল। এ সূরায় নবী রাসূলদেরকে মিথ্যেবাদী বলা এবং যারা বলেছে তাদের পরিণতি সম্পর্কে কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

[১.৮] সূরা আল-কাসাস, অবতীর্ণের ক্রমানুসারে ৪৯তম সূরা। এখানে হযরত মূসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত থেকে শুরু করা হয়েছে। ফিরাউনের দোর্দণ্ড প্রতাপের সময় মূসা (আ)-এর জন্ম, সিন্দুকে ভরে নদীতে নজাতককে ভাসিয়ে দেয়া, ফিরাউনের ঘনিষ্ঠজন কর্তৃক সেই সিন্দুক উত্তোলন, মূসা (আ)-এর বোনের সংবাদ সংগ্রহ, তারপর ফিরাউনকে ধাত্রী মায়ের সন্ধান দেয়া, যার বদৌলতে মূসা (আ) মায়ের কাছে প্রতিপালিত হবার সুযোগ লাভ করেন।

হযরত মূসা (আ) যৌবনে পদার্পণ করে একদিন এক মিসরীকে হত্যা করেন। আরেকজনকে হত্যা করতে চাইলে আগের হত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হুমকি দেয়া, এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে তাকে সংবাদ দেয়া যে, শহরে আপনার হত্যাকাণ্ডের কথা ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি মিসর ছেড়ে মাদইয়ানের দিকে পাড়ি জমান। সেখানে শু'আইব (আ)-এর মেয়ের সাথে পরিচয় এবং তাঁর ছাগলকে পানি পান করানো, তাদের বাড়িতে ফিরে পিতাকে ঘটনা খুলে বলা, মূসা (আ) নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত শু'আইব (আ)-এর কাছে চাকুরী করা। তার শর্ত সাপেক্ষে তার কন্যার সাথে মূসা (আ)-এর বিয়ে এবং নিজের পরিবার নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন, পথিমধ্যে আগুনের সন্ধানে গিয়ে (এ সম্পর্কে সূরা ত্বা-হা'য় বলা হয়েছে) নবুওয়াত লাভ।

অবশ্য সূরা আল-কাসাসে নতুন একটি দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে ফিরাউনকে দাওয়াত দেয়ার পর তার হাসি-তামাশামূলক প্রতিক্রিয়া ঃ

فَاَوْقِدْلِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى -

ফিরাউন বললো ঃ হে হামান! তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো যেন আমি মূসার প্রতিপালককে উঁকি মেরে দেখতে পারি। (সূরা আ-কাসাস ঃ ৩৮)

[১.৯] সূরা আসরা (বনী ইসরাঈল) অবতীর্ণক্রম পঞ্চাশ। এখানে ফিরাউনের সলিল সমাধি এবং বনী ইসরাঈলের সমুদ্র পার হওয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[১.১০] সূরা ইউনুস, অবতীর্ণক্রম একান্ন। এখানে নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনাটিও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে যাদুকরদের কথা, বনী ইসরাঈলের সমুদ্র পারাপার এবং ফিরাউনের নিমজ্জিত হওয়ারও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারপর নিম্নোক্ত কথাটি অতিরিক্ত সংযোগ করা হয়েছে। যা আর কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

حَتّٰى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ - فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً -

যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করলো তখন বললো ঃ এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি কোন ইলাহ নেই তাকে ছাড়া যার ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। বস্তুত আমিও তাঁর অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতোপূর্বে নাফরমানি করছিলে! এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব আজকে আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করবো যা তোমার পশ্চাদযাত্রীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯০-৯২)

[১.১১] সূরা হুদ, অবতীর্ণক্রম বায়ান্ন। এ সূরায় মিথ্যেবাদীদের ধ্বংসের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে মূসা (আ)-এর ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে।

[১.১২] সূরা আল-মু'মিন, অবতীর্ণক্রম ষাট। এ সূরায়ও হযরত মূসা (আ) এবং ফিরাউনের মধ্যকার কথোপকথনের উল্লেখ আছে। তবে নিচের কথাটি অতিরিক্ত বলা হয়েছে। যা আর কোথাও বলা হয়নি।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ -

(বিতর্কের এক পর্যায়ে) ফিরাউন বললো ঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করবো, সে তার প্রতিপালককে ডাকুক। (সূরা মুমিন ঃ ২৬)

তারপর ফিরাউনের এমন এক সভাসদদের কথা বলা হয়েছে যে ঈমান এনেছিল ঠিকই কিন্তু সে তা গোপন করে রেখেছিল। সে লোকদেরকে বললো ঃ মূসা (আ)-কে হত্যা করো না, হতে পারে তার রাস্তাই সঠিক। এ কথাটিও শুধুমাত্র এ সূরায়ই বর্ণিত হয়েছে।

[১.১৩] সূরা ফুস্‌সিলাতে (সূরা হা-মীম আস-সিজদা) (অবতীর্ণক্রম একষট্টি) হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনার সামান্য ইঙ্গিত করা হয়েছে। তদ্রূপ সূরা যুখরুফেও (অবতীর্ণক্রম তেষট্টি) এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে। তবে সেখানে নিম্নোক্ত কথা কয়টি অতিরিক্ত বলা হয়েছে যা আর কোথাও বলা হয়নি একমাত্র সূরা যুখরুফ ছাড়া। ফিরাউন বললো ঃ

اَلَيۡسَ لِىۡ مُلۡكُ مِصۡرَ وَهٰذِهِ الۡاَنۡهٰرُ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِىۡ ۚ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ –
اَمۡ اَنَا خَيۡرٌ مِّنۡ هٰذَا الَّذِىۡ هُوَ مَهِيۡنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيۡنُ –

আমি কি মিসরের অধিপতি নই ? এ নদীগুলো আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় তোমরা কি দেখ না ? আমি শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নিচ এবং ভাল করে কথা বলতেও সক্ষম নয়। (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৫১-৫২)

[১.১৪] সূরা আয-যারিয়াতে (অবতীর্ণক্রম সাতষট্টি) হযরত মূসা (আ)-কে ফিরাউনের কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ, ফিরাউন কর্তৃক তাঁকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করা এবং ফিরাউনের ধ্বংস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

[১.১৫] সূরা আল-কাহাফে (অবতীর্ণক্রম উনসত্তর) বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আ) এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাত এবং সাহচর্য পেয়েছিলেন, যাকে আল্লাহ্ বিশেষ ইলম দান করেছিলেন। মূসা (আ) তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁকে যেন তাঁর সাহচর্যে রেখে একটু উপকৃত হবার সুযোগ দেন। তিনি উত্তর দিলেন, আপনি ধৈর্যের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হবেন। মূসা (আ) ধৈর্য ও স্থৈর্যের ওয়াদা করে তাঁর সঙ্গ নিলেন কিন্তু বেশিদিন ধৈর্যধরে তার সঙ্গে থাকতে পারলেন না। কারণ তিনি এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হতে দেখলেন যার সঠিক তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পারলেন না। ফলে দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ অবধারিত হয়ে গেল। আল-কুরআনে এ ঘটনাটি শুধুমাত্র এক জায়গায়ই বর্ণিত হয়েছে।

[১.১৬] সূরা ইবরাহীম (অবতীর্ণক্রম বাহাত্তর) ও সূরা আল-আম্বিয়া (অবতীর্ণক্রম তিয়াত্তর) নামক সূরা দুটোতে মাত্র দু' জায়গায় এ ঘটনার ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় সূরায় ইঙ্গিতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সেখানে তওরাতকে 'ফুরকান' (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) বলা হয়েছে।

[১.১৭] সূরা আল-বাকারায় (অবতীর্ণক্রম সাতাশি) বনী ইসরাঈলের ওপর প্রদত্ত আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ এবং তাঁর অবজ্ঞা প্রদর্শন সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সেখানে মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরায় মূসা (আ)-এর ঘটনা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। একপর্যায়ে তাদেরকে যে 'মান্না' ও 'সালওয়া' প্রদান করা হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈল তার বিনিময়ে অন্য খাদ্য সামগ্রী চেয়েছিল তার কথাও এসেছে। আবার অন্য জায়গায় গাভী যবেহ করার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সোজা নির্দেশ ছিল একটি গাভী যবেহ করার কিন্তু তারা তাকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জটিল করে ছাড়ল। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ –

অতপর তারা সেটি যবেহ করলো অথচ যবেহ করবে বলে মনে হচ্ছিল না।
(সূরা আল-বাকারা ঃ ৭১)

গাভী যবেহ করার ঘটনাটি এ সূরায় সম্পূর্ণ নতুন, যা ইতোপূর্বে কোন সূরায় বর্ণিত হয়নি।

[১.১৮] সূরা আন-নিসায় (অবতীর্ণক্রম বিরানব্বই) বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল বিনা অন্তরালে আল্লাহ্কে দেখার জন্য গো ধরেছিল।

[১.১৯] সূরা আল-মায়িদায় (অবতীর্ণক্রম একশ' বার) বনী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ق وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ –

তারা বললো ঃ হে মূসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনো সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে অবশ্যই আমরা সেখানে প্রবেশ করবো। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ২২)

একটু অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে ঃ

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّادَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ - قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ - قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ج يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ -

তারা বললো ঃ হে মূসা! আমরা জীবনে কখনো সেখানে যাব না, যতোক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, তুমি ও তোমার প্রতিপালক সেখানে যাও এবং যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসলাম। মূসা বললো ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি শুধু নিজের ওপর ও ভাইয়ের ওপর ক্ষমতা রাখি। কাজেই আপনি আমাদের মধ্যে এবং এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ এ দেশ তাদের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হলো। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্তের মতো ফিরবে। অতএব, তুমি বাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না।

তারপর তাদেরকে এক মরুপ্রান্তরে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সেখানেই তাদের বসতি গড়ে উঠে। এরপর মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আর কিছু বলা হয়নি। অবশ্য বনী ইসরাঈল ঈসা (আ)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করতো সে কথা বলা হয়েছে।

একমাত্র হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনাটিই আল-কুরআনে সর্বাধিক বর্ণিত হয়েছে। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, পুনরাবৃত্তির ধরনটি কেমন। ছয় জায়গা ছাড়া আর সবগুলো জায়গায় খুব সংক্ষেপে কিংবা শুধুমাত্র ইঙ্গিতে ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত জায়গায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেখানে কোন না কোন নতুন বক্তব্য অবশ্যই বলা হয়েছে। এখন যদি কোন পাঠক কুরআন পাঠ করার সময় ঘটনার নতুনত্ব খুঁজে না পান তবে তাতে আল-কুরআনের দোষ কী ?

২. আল-কুরআনের ঘটনাগুলো দ্বীনি উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে— যেখানে যতোটুকু ঘটনা (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) বর্ণিত হয়েছে সেখানে ঠিক ততোটুকুই উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট। শুধু সেই অংশেরই বর্ণনা করা হয়েছে

বিষয়বস্তুর সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন কখনো ঘটনার প্রথম অংশ আলোচনা করা হয়েছে আবার কোথাও ঘটনার শেষাংশ আলোচনা করা হয়েছে আবার কখনো শুধু ততোটুকু আলোচনা করা হয়েছে যতোটুকু শিক্ষা ও উপদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ ইতিহাস বর্ণনা করা কুরআনের উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিহাসের আলোকে শিক্ষা প্রদান করা। কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ করা হলো—

[২.১] অনেক সময় কোন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে দেখা গেছে ঘটনার নায়কের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ সে জন্ম বৃত্তান্তের মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক ঘটনা বিদ্যমান থাকে। যেমন— হযরত আদম (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত। হযরত আদম (আ)-এর জন্মের ঘটনাটিতে আল্লাহ্‌র কুদরত এবং দয়া-অনুগ্রহের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। সাথে সাথে ইবলিসের যে ঘটনা বলা হয়েছে তার পেছনেও দ্বীনি উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

তেমনিভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্তের কথা উল্লেখ করা যায়। এ ঘটনাটি কুরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ঈসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা, যা এক বিরাট মুজিযা। তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত এমন ছিল, যা সমস্ত যুক্তি-তর্কের বিপরীত। ইসলাম প্রকাশ হওয়ার আগে এবং পরে ঈসা (আ) সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক সমস্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আবার হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। তাকে আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। হযরত মারইয়াম (আ) হযরত জাকারিয়া (আ)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন, শৈশবেই তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে উত্তম রিযিক পেতেন। একবার তিনি দেখতে পেলেন মারইয়াম (আ)-এর নিকট অনেক উত্তম ফল-মূল। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ -

যখনই জাকারিয়া মিহরাবে প্রবেশ করতেন তখনই তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে মারইয়াম! তুমি এগুলো কোথায় পেলে ? সে উত্তর দিলো ঃ এগুলো আল্লাহ্ দিয়েছেন।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)

এ ঘটনার সবটুকু তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্তের কথাও এসেছে। হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশের বর্ণনা এখানে করা হয়েছে। এমনিভাবে হযরত মূসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্তও আল-কুরআনে বলা হয়েছে। তার কয়েকটি দিক ও কারণ আছে—

ক. হযরত মূসা (আ)-এর জন্ম ঐ সময়ে হয়েছিল, যখন ফিরাউন বনী ইসরাঈলের ওপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছিল।

খ. ফিরাউন বনী ইসরাঈলের কোন পুত্র সন্তানকে জীবিত রাখত না।

গ. আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকভাবে মূসা (আ)-কে বাঁচিয়ে দিলেন এবং ফিরাউনের ঘরে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলেন।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুঝা যায় মূসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে ঃ আল্লাহ্ দেখিয়ে দিলেন, যাকে নবুওয়াতের জন্য সৃষ্টি করা হলো তাকে সে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া হলো। কেউ কোন ক্ষতি করতে পারলো না। জন্ম বৃত্তান্ত ছাড়াও জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্তও কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ তাদের জন্মের সাথেও নসীহত ও শিক্ষা জড়িয়ে আছে। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম ঐ সময় হয়েছিল যখন হযরত ইবরাহীম (আ) বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সহায়তায় তিনি কা'বা ঘর নির্মাণ করেছেন। বার্ধক্য যখন পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত তখন হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্ম। তেমনিভাবে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্মও হয়েছিল হযরত জাকারিয়া (আ)-এর বৃদ্ধ বয়সে। তখন তার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল।

[২.২] আমরা কুরআনে এমন কিছু ঘটনাও পাই যেখানে জন্মের পরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। জন্ম বৃত্তান্ত বলা হয়নি। যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা। যার শুরু হয়েছে শৈশবের ঘটনাবলী দিয়ে। তিনি শৈশবে এমন এক স্বপ্ন দেখলেন যা অবশিষ্ট জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এগারোটি তারা, চাঁদ ও সুরুজ। বিজ্ঞ পিতা এ স্বপ্নের মর্মার্থ বুঝে ফেললেন এবং তাকে আগের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখাশুনা করতে লাগলেন। তার ভাইয়েরা হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলো। তারপর ঘটনা আপন গতিতে চললো।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনাও শৈশব থেকে শুরু হয়েছে।

শৈশবে একদিন তিনি আকাশের দিকে চেয়ে এক তারকা দেখে মনে করলেন হয়তো এটিই তাঁর প্রতিপালক। যখন তা ডুবে গেল তখন বললেন— যা ডুবে যায় তা আমি পসন্দ করি না। চন্দ্র উদিত হলো তখন মনে করলেন এটি অনেক বড় কাজেই এটিই আমার প্রতিপালক। রাত্রি শেষে যখন চাঁদ অস্তমিত হয়ে গেল এবং গোটা পৃথিবী আলোকিত করে সূর্য উদিত হলো, তখন তিনি বললেন ঃ এটি

যখন সবচেয়ে বড় এবং উজ্জ্বল কাজেই এটি ইলাহ না হয়ে যায় না। কিন্তু দিবাবসানে যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি প্রকৃত আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। যাকে দেখা যায় না শুধু অনুভব করা যায়। তারপর তিনি নিজের কাওম ও পিতাকে সেই ইলাহ্র দিকে আহ্বান জানালেন কিন্তু তারা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো।

হযরত ইবরাহীম (আ) একদিন তাদের অসতর্কতার সুযোগে তাদের পূজ্য মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিলেন। লোকজন বললো ঃ এ কাজ ইবরাহীম নামক যুবক ছাড়া আর কেউ করেনি। তখন তারা তাঁকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ-

আমি নির্দেশ দিলাম, হে আগুন তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও, যে রূপ ঠাণ্ডা ইবরাহীমের জন্য উপযোগী হয়। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৯)

হযরত দাঊদ (আ)-এর ঘটনাও তাঁর শৈশব থেকে শুরু করা হয়েছে। তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন জালূত নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ্কে হত্যা করে। যা ছিল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র এক কুদরত। ব্যস! এভাবেই হযরত দাঊদ (আ)-এর ঘটনা শুরু করা হয়েছে। হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে তার যৌবনকাল থেকে। যখন তাঁর পিতা দাঊদ (আ)-এর এক ফয়সালার মুকাবিলায় তিনি নতুন ফয়সালা দিয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ -

যখন তাতে কিছু মেষ ঢুকে পড়েছিল, তাদের বিচার আমার সামনে ছিল। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৭৮)

এ হচ্ছে হযরত সুলাইমান (আ)-এর প্রথম ফয়সালা। এতেই প্রমাণিত হয় আল্লাহ্ তাঁকে বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্যই তৈরী করেছিলেন।

[২.৩] কুরআনে কারীমে এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র শেষ কিস্তি বর্ণিত হয়েছে। যেমন— হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত লূত (আ), হযরত শু'আইব (আ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কিরাম। এদের ব্যাপারে উল্লেখিত অংশের বাইরে অতিরিক্ত আর কোন আলোচনা করা হয়নি। কারণ তাদের ঘটনার সেই অংশটুকুই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত।

কাহিনীর সংক্ষেপ ও বিস্তৃতি

এতোক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম, সে কাহিনী কোথা থেকে শুরু করা হয়েছে সে সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আমরা আলোচনা করবো, আল-কুরআনের অনেক ঘটনা দীর্ঘ ও বিস্তারিত এবং অনেক ঘটনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার শিক্ষণীয় দিকটি কী পরিমাণ বিস্তৃত। নিচে আমরা তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১. হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এজন্য আল-কুরআনে তা আদ্যপ্রান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। কাহিনীর শুরু মূসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত দিয়ে এবং শেষ পবিত্র ভূমির কাছে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের মাধ্যমে। সেখানে তাঁর জাতি চল্লিশ বৎসর অবস্থান করার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়। যা ছিল বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ির প্রতিফল। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে এজন্য বলা হয়েছে যে, তার প্রতিটি অংশেই দ্বীনি শিক্ষা ও উপদেশের প্রকাশ ঘটেছে। উপরন্তু তা কুরআনী দাওয়াত এবং উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

ঈসা (আ)-এর ঘটনাটিও বিস্তারিত, তবে মাঝের কিছু অংশ সংপেক্ষ করা হয়েছে। তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত ও মুজিযাসমূহ বিস্তারিত বলা হয়েছে, হাওয়ারীগণ কর্তৃক সহযোগিতা এবং ইহুদী কর্তৃক তাঁকে মিথ্যেবাদী আখ্যায়িত করে শূলে চড়ানোর প্রচেষ্টা, তারপর আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া। তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার পর বনী ইসরাঈলের দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাও কুরআন বর্ণনা করেছে। কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে কেন তাঁকে ও মারইয়ামকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানান হয়েছে? হযরত ঈসা (আ) উত্তর দেবেন ঃ

আমিতো তাদেরকে নির্ভেজাল তওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলাম। তারপর গোটা জাতিকে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে বলবেন ঃ আপনি ইচ্ছে করলে তাদের মাফ করে দিন কিংবা শাস্তি দিন।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা একই সাথে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভাইদের ষড়যন্ত্র, মিসরে তাঁকে দাস হিসেবে বিক্রি, মিসরের গভর্নর আজীজের হস্তগত হওয়া, তার স্ত্রী কর্তৃক ফুসলানো, কারাগারের অসহনীয় যন্ত্রণা, দু' কয়েদীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান, বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান এবং কারাগার থেকে মুক্তি লাভ, মিসরের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন, ভাইদের মিসরে আগমন, বিন ইয়ামিনের সাথে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাত, বিন ইয়ামিনকে আটক করে পিতা-মাতাকে মিসরে হাজির করা এবং মিসরে

সপরিবারে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর কাহিনীর যবনিকা। এ ঘটনা বর্ণনার পেছনে দু'টো উদ্দেশ্য আছে— এক ঃ ওহী ও রিসালাতের স্বীকৃতি। দুইঃ গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি শিক্ষা।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা শুরু করা হয়েছে শৈশবে তাঁর ঈমান গ্রহণের ঘটনা দিয়ে। তারপর পিতা ও জাতির সাথে বিতর্ক, মূর্তি ভাঙ্গা, দেশান্তর, ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্ম, স্বপ্নে পুত্র কুরবানীর নির্দেশ প্রাপ্তি, কা'বা ঘর নির্মাণ এবং হজ্জ অনুষ্ঠানের ঘোষণা প্রদান, অন্তরের প্রশান্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মৃত ও জীবন দানের ঘটনা প্রত্যক্ষের আবেদন, আল্লাহ্‌র নির্দেশে চারটি পাখী যবেহ করে তাদের গোশ্‌তগুলো মিলিয়ে রাখার পর সেসব পাখীদের জীবিত হওয়া।

হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনাও বিস্তারিতভাবে কুরআনে বলা হয়েছে। ক্ষেত সংক্রান্ত ফয়সালা, সাম্রাজ্য পরিচালনা, উত্তম ঘোড়ার মাধ্যমে পরীক্ষা, জ্বিন ও বাতাসকে তাঁর অধীনস্ত করে দেয়া, হুদহুদ, পিপিলিকা ও রাণী বিলকিসের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ, সর্বশেষ মৃত্যুর পর লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং এ ব্যাপারে জ্বিনদের বেখবর থাকার ঘটনা বর্ণনা করে কাহিনীর ইতি টানা হয়েছে। গোটা কাহিনী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশে ভরপুর।

২. আল-কুরআনের কিছু ঘটনা এমন, যা জীবনের একটি অংশের তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন— হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা। শুধুমাত্র নবুওয়াত ও রিসালাতের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বীনের দাওয়াত প্রদান, জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, নৌকা তৈরী, প্লাবন, নূহ (আ)-এর ছেলের সলিল সমাধি (আমলে সালেহ ছাড়া নবী তনয়ও আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা পায়নি)। এমনিভাবে হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠান, তওবা কবুল ইত্যাদি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আবার মারইয়াম (আ) ও ঈসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্তও বলা হয়েছে। তবে এ ঘটনাগুলো পূর্বে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মতো বিস্তারিত নয়। তবু একে বিস্তারিত ঘটনা বলা চলে। হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনাও মোটামুটি উল্লেখযোগ্য। তবে তা হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনার মতো এতো বিস্তারিত নয়। তবু হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনাটি বেশ কয়েকটি অংশে বর্ণিত হয়েছে।

৩. আল-কুরআনে কিছু ঘটনাকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন— হযরত হুদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত লুত (আ), হযরত শু'আইব (আ) প্রমুখ নবীদের ঘটনা। শুধুমাত্র রিসালাত ও নবুওয়াত সংক্রান্ত ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম, কুরবানী এবং

পিতা-পুত্র মিলে কা'বা ঘর তৈরীর কথা সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কিছু বর্ণনা এসেছে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায়। তাছাড়া অন্যত্র ইয়াকুব (আ)-এর অন্তিম মুহূর্তের ওসীয়তের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ অংশটি এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে তওহীদের কথা বিবৃত হয়েছে, যে কথা তিনি অন্তিম মুহূর্তে ওসীয়ত হিসেবে বলে গেছেন।

৪. কোন কোন ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। যেমন— হযরত জাকারিয়া (আ)-এর কাহিনী, ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্ম ও মারইয়াম (আ)-এর অভিভাবকত্বের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। হযরত আইউব (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে রোগগ্রস্ত হওয়া, আল্লাহ্র দরবারে ধর্ণা এবং পরিত্রাণ লাভ সংক্রান্ত অধ্যায়টুকু। হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে জাতিকে দাওয়াত দেয়ার পর জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেশান্তর হওয়ার প্রচেষ্টা, মাছে গিলে ফেলা, বিজন ভূমিতে মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ এবং তার জাতি কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ।

৫. কিছু কিছু ঘটনা বিস্তারিত না বলে শুধুমাত্র ইঙ্গিত দেয়াকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিংবা শুধু নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— হযরত ইদ্রিস (আ), হযরত আল-ইসাআ', যুলকিফল প্রমুখ। এরা নবীদের অন্তর্ভুক্ত শুধু এ কথার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এর বেশি কিছু নয়।

৬. এমন কিছু কাহিনী বলা হয়েছে, যা পৃথক অন্য কোন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন— আসহাবে উখদুদ, আসহাবে কাহ্ফ, আদম (আ)-এর দু' ছেলের ঘটনা, দুই বাগান মালিকের ঘটনা, বাগান মালিকদের ঘটনা ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু ঘটনার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে এবং সামনেও কিছু ঘটনার আলোচনা করা হবে। এখন আমরা এখানেই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু একথা বলা— আল-কুরআন কোন ঘটনার শুধু ঐ অংশটুকুই আলোচনা করেছে যা দ্বীনি উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমাদের সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে।

উপসংহার ও পরিণতি বর্ণনা

আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনীগুলো দ্বীনি উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে— ঘটনা বর্ণনার সাথেই কিছু দ্বীনি হেদায়েত এবং সেই কাহিনীর পরিণতিও বর্ণনা করা হয়েছে। তা কখনো কাহিনীর প্রথমে, কখনো শেষে বা কখনো মূল কাহিনীর সাথেই বর্ণিত হয়েছে।

শুরুতে শিক্ষণীয় ঘটনা বলে পরে কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এমন দুটো উদাহরণ নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। অবশ্য তার দুটো দিক রয়েছে ঃ

১. ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ওহী ও রিসালাতের প্রমাণ উপস্থাপন করা। অর্থাৎ বলে দেয়া হয়েছে, এ ঘটনা ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। যেমন ঃ হযরত ইউসুফ (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর ঘটনাবলী। যেখানেই তা বলা হয়েছে সেখানেই প্রথমে ওহীর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

২. প্রথমে ঘটনার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, তারপর ঘটনা বর্ণনা করে তার সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -- وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ -

আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। আবার আমার শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। (সূরা আল-হিজর ঃ ৪৯-৫০)

এ আয়াতে রহম ও আযাবের কথা বলে তারপর রহম ও আযাবের প্রমাণ স্বরূপ পুরো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

আবার ঘটনা বর্ণনা শেষে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে এমন দুটো ঘটনাও আমরা উল্লেখ করেছি। তারও দুটো কারণ আছে ঃ

১. সমস্ত ঘটনা ওহীর মাধ্যমে জানান হয়েছে একথার প্রমাণ করা এবং ঘটনাটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, স্বয়ং ঘটনাই সে কথার প্রমাণ করে দেয়। যেমন— সূরা আল-কাসাসে মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পর মূল বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। তেমনিভাবে সূরা হূদে হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার পর আসল বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. আল্লাহ্ (নাউযুবিল্লাহ) জালিম নন এবং কোন সম্প্রদায়ের কাছে নবী রাসূল না পাঠিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেননি এ কথার প্রমাণ করা। যেমন— সূরা আল-আনকাবুতে নবী-রাসূলদের কথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَصِبًا ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ج وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ -

আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের ওপর জুলুমকারী ছিলেন না, কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৪০)

সত্যি কথা বলতে কি, যে ব্যক্তি কুরআনের এ কাহিনীগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সেই এর রহস্য অনুধাবন করতে পারবে এবং বুঝতে সক্ষম হবে যে, কুরআন প্রত্যেকটি ঘটনার সাথেই তার পরিণতি ও শিক্ষা বর্ণনা করেছে।

এবার আমরা এমন কয়েকটি উদাহরণ বা ঘটনা আলোচনা করবো, যেখানে ঘটনা বলার সাথে সাথে শিক্ষণীয় দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

১. আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ط قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

(তুমি কি সে লোককে দেখনি ?) যে এমন এক জনপদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যার বাড়ি-ঘরগুলো ভেঙ্গে ভিত্তির ওপর পড়েছিল। সে বললো ঃ কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন ? তখন আল্লাহ্ তাকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন, তারপর তাকে উঠালেন। বললেন ঃ তুমি কতোদিন এভাবে ছিলে ? সে উত্তর দিলো ঃ একদিন কিংবা তার চেয়ে কম সময়। আল্লাহ্ বললেন ঃ তা নয়, তুমি একশ' বছর মৃত ছিলে। এবার তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে চেয়ে দেখ, তা অবিকৃত আছে। গাধার দিকে চেয়ে দেখ— আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি— তার হাড়গুলো আমি কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর ওপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। যখন তা ঘটে গেল তখন সে বললো ঃ আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারাহ ঃ ২৫৯)

দেখুন আল্লাহ্ তা'আলা ঘটনার মধ্যেই وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ — "আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চাই" আয়াতটি দিয়ে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছেন এবং ঘটনার শেষে اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ — "আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বিষয়েই সর্বশক্তিমান" বলে প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

২. হযরত সুলাইমান (আ) এবং রানী বিলকিসের ঘটনায় হুদহুদের কণ্ঠে বলা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ - وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ - اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ - اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

আমি এক নারীকে সাবা জাতির ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটি বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখলাম, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কাছে তাদের কাজকর্মকে আকর্ষণীয় করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। কাজেই তারা সৎপথে নেই। তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে না কেন, যিনি আকশ ও পৃথিবীর গোপন

বিষয়ের খবর রাখেন এবং তোমরা যা প্রকাশ করো এবং গোপান রাখ তাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি বিশাল আরশের মালিক। (সূরা আন-নম্‌ল ঃ ২৩-২৬)

ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এ সমস্ত কথা হুদহুদের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ হুদহুদের কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে যাবে।

৩. হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় যখন হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহ্‌র দু' অনুচরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তখন তিনি বলেন ঃ

ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ ط اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ -

এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালের প্রতিও কোন বিশ্বাস রাখে না। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৭)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ط ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ -

আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্মের অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করি। এটি আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক সে অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৮)

মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাহিনী বর্ণনার সাথে সাথে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষামূলক উপদেশ বর্ণনা করা। তবে তা এমনভাবে কাহিনীর সাথে একাকার করে দেয়া হয়েছে, মনে হয় এ কথাগুলোও মূল কাহিনীর অংশ। কাহিনীর পাঠকগণ ঘটনার মধ্যে সর্বত্রই এ ধরনের বর্ণনা পেয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তার স্টাইল এ রকমই হোক কিংবা কিছুটা ব্যতিক্রম তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু একটি কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, এ বিষয়টি কাহিনী বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। সত্যি কথা বলতে কি দ্বীনি কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়া আল-কুরআনে কাহিনী বর্ণনার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।

—১৫

কাহিনী বর্ণনায় দ্বীনি ও শৈল্পিক সংমিশ্রণ

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, কাহিনী দ্বীনি উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তা শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তরায়। আমরা এখন বলতে চাই, দ্বীনি উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়ার ফলে, ঐ বৈশিষ্ট্যকে শৈল্পিক জগতে গল্পের মূল ভিত্তি গণ্য করা হয়। এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা যে কথা বলেছিলাম, সেখানেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। তা হচ্ছে ঃ

আল-কুরআন বিবেকের ওপর প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে শৈল্পিক সৌন্দর্যকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ আল-কুরআন দ্বীনি চেতনা প্রভাবিত করার জন্য শৈল্পিক সৌন্দর্যের উপকরণ ব্যবহার করেছে। নিচে আমরা ঘটনাবলীর শৈল্পিক বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা কররো, 'কাহিনীর শৈল্পিক রূপ' শিরোনামে।

কাহিনীর শৈল্পিক রূপ

১. কুরআনে হাকীমে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার অন্যতম উদ্দেশ্য— দ্বীন, নবী-রাসূল এবং তাঁদের দাওয়াতের অভিন্নতা এবং প্রতিটি নবী-রাসূলের সাথে কাফির-মুশরিকদের এক ও অভিন্ন আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা। অবশ্য এ সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনের ঘটনাবলীতে যে বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হচ্ছে— প্রত্যেক নবী ও রাসূলের দ্বীন ছিল এক এবং তাঁরা প্রত্যেকে একই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আবার প্রত্যেক নবীর জাতি যারা একমাত্র দ্বীনকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছে মনে হয় তা একই সুতোয় গাঁথা। নবীগণ যখনই এসেছেন তখনই সেই গোষ্ঠীর মুকাবিলা করতে হয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু সেই পুনরাবৃত্তির মধ্যেও এক ধরনের শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় এরা ভিন্ন ভিন্ন নবী নয় বরং একজন নবী এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি নয় বরং একই জাতি। তদ্রূপ মিথ্যে প্রতিপন্নকারীরাও দীর্ঘ সময় ও অবস্থার ব্যবধানেও মনে হয় সকলে একই মানসিকতার অধিকারী। প্রত্যেক নবী এসেছেন এবং কালিমার দাওয়াত দিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আর গুমরাহ মানুষগুলো সবসময়ই তাদেরকে

মিথ্যেবাদী বলেছে এবং তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। নিচের আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ - قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ - اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ -

আমি নূহকে তার জাতির নিকট পাঠিয়েছি। সে বললো ঃ হে আমার জাতির লোকরা! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি। তার জাতির সর্দাররা বললো ঃ আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সে বললো ঃ হে আমার জাতি! আমি কখনো গোমরাহ্ নই, আমি তো রাব্বুল আলামীনের রাসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দেই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেসব জিনিস জানি, যা তোমরা জান না। তোমরা কি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ এ কারণে যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই এক ব্যক্তি উপদেশ নিয়ে এসেছে— যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত হও এবং অনুগৃহীত হও। অতপর তারা তাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করলো। আমি তাকে এবং জাহাজের আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম, আর যারা মিথ্যে প্রতিপন্ন করছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ।

(সূরা আরাফ ঃ ৫৯-৬৪)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰ

لَكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ - قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ
سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ
وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ - اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ط وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ
بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ج فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ج فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ - قَالَ قَدْ
وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ط اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْٓ اَسْمَآءٍ
سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط فَانْتَظِرُوْٓا
اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ - فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ -

আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছি। সে বললো ঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তার জাতির নেতৃবৃন্দ বললো ঃ আমরা দেখছি, তুমি একজন নির্বোধ, আর আমরা তোমাকে মিথ্যেবাদী মনে করি। সে বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পয়গাম্বর। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদের হিতাকাংখী-বিশ্বস্ত। তোমরা কি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ এ কারণে যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং তোমাদেরই এক ব্যক্তি উপদেশ নিয়ে এসেছে যেন সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহের জাতির পর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দেহাকৃতিও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ করো যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।

তারা বললো ঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ, আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করতো আমরা

তাদেরকে ছেড়ে দেই ? তাহলে তুমি যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো। যদি তুমি সত্যবাদী হও। সে বললো ঃ অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের ওপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছো যেগুলো তোমার ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। আল্লাহ্ এদের কোন মন্দ অবতীর্ণ করেননি। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম। অতপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করতো তাদের মূল কেটে দিলাম। কারণ তারা বিশ্বাসী ছিল না। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৬৫-৭২)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرُهٗ ط قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً
فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْۤءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ - وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ج فَاذْكُرُوْۤا
اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ - قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ
اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ - قَالَ
الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا بِالَّذِيْۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ - فَعَقَرُوا النَّاقَةَ
وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ - فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ -

সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালেহ্কে পাঠিয়েছি। সে বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহ্র উটনী। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্র জমিনে চরে বেড়াবে। অসৎ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শও করবে না। নইলে

তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। স্মরণ করো, তোমাদেরকে আ'দ জাতির পরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ করো এবং পর্বত-গা খোদাই করে প্রকোষ্ট নির্মাণ করো। অতএব তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্বীকার করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতৃবৃন্দ দরিদ্র ঈমানদারদেরকে জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমরা কি বিশ্বাস করো, সালেহ্কে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন ? তারা বললো ঃ আমরা তো তার আনিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। অহংকারীরা বললো ঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করছো আমরা তা বিশ্বাস করি না। তারপর তারা উটনীকে হত্যা করে ফেললো এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করলো। তারা আরও বললো ঃ হে সালেহ! নিয়ে এসো তোমার সেই শাস্তি যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক। অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ভূমিকম্প। ফলে সকালবেলায় নিজ নিজ গৃহে তারা মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৭৩-৭৮)

আল-কুরআনের যেখানেই এ ধরনের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেখানেই সকল নবী-রাসূলের সাথে মিলে যায়। এ অবস্থা প্রত্যেক নবীর সময়ই চলেছে। চলতে চলতে অবশেষে মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত এসে পৌছেছে। কল্পনার চোখে আমাদের সামনে ভেসে উঠে সেই দৃশ্য— কাফিরদের সামনে তিনি কালিমার দাওয়াত পেশ করছেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে অতীতের নবী-রাসূলগণ পেশ করেছেন। এদিকে কাফিররা তাঁর সাথে ঠিক সেই আচরণই করছে যে আচরণ পূর্ব থেকে চলে আসছিল। নবী-রাসূলদের এ সমস্ত ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে এর মধ্যে অবারিত সৌন্দর্য ও সুষমা দৃষ্টিগোচর হয়।

২. কাহিনী দ্বীনি উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়ার আরেকটি পরিণতি এটিও ছিল যে, ঘটনার ঠিক ততোটুকুই উপস্থাপন করা হয় যতোটুকু উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ ব্যাপারে আল-কুরআন এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যা একটি বিশেষ নিয়ম হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। যেমন সূরা অবতীর্ণের ক্রমানুসারে ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর যে সূরায় গিয়ে শেষ কিস্তি বর্ণিত হয়েছে সেখানে দ্বীনি উদ্দেশ্যের সাথে সাথে শৈল্পিক দিকটিও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আবার এমনও দৃষ্টিগোচর হয়, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাহিনী শেষ করা হয়েছে কিন্তু সেখানে দ্বীনি উদ্দেশ্যের বর্ণনা নেই।

আমরা হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনায় দেখেছি, সূরা আল-মায়িদায় যার

শেষ কিস্তি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বনী ইসরাঈলের ওপর বিভিন্ন অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে, যেসব অনুগ্রহ আল্লাহ্ বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে করেছিলেন। কিন্তু এতো অনুগ্রহ প্রাপ্তির পরও তাদের সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধও ছিল না। তাদেরকে আল্লাহ্ নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে রাজী হয়নি। তাই তাদেরকে তীহ্ প্রান্তরে নির্বাসন দিয়ে এমন শাস্তির সম্মুখীন করা হয়েছিল, একমাত্র মৃত্যুই ছিল সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায়।

এখানে একটি দ্বীনি উদ্দেশ্য ছিল। তীহ্ প্রান্তরের দৃশ্যে ঘটনার যবনিকাপাতের মাধ্যমে শৈল্পিক সৌন্দর্যের উচ্চতর বিকাশ ঘটান হয়েছে। তীহ্ প্রান্তরের দৃশ্য ছাড়া অন্য কোথাও এ কাহিনী শেষ করলে তা এতো চমকপ্রদ হতো না।

আসুন আমরা আরও কতিপয় ঘটনাবলীতে উপরিউক্ত সূত্রটির সন্ধান করি।

[২.১] হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনাবলী আল-কুরআনে প্রায় বিশ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ কিস্তি বর্ণনা করা হয়েছে সূরা আল-হাজ্জে। এ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে এভাবে ঃ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ -

যখন আমি ইবরাহীমকে বাইতুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম ঃ আমার সাথে আর কাউকে শরীক করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারী, নামাযে দণ্ডায়মান এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য। আর মানুষের মধ্যে হাজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উঠের পিঠে চড়ে আসবে দূর-দূরান্ত থেকে।

(সূরা হজ্জ ঃ ২৬-২৭)

দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বীনে হাজ্জের রুকন (শর্তাবলী) তাই ছিল যা নবী করীম (স)-এর শরীয়তে ফরয করা হয়েছে। তারই উল্লেখ করা এখানে উদ্দেশ্য। তদ্রূপ সূরা আল-হাজ্জের শেষ দিকে (অবতীর্ণক্রম একশত তিন) হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰهِيمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۙ مِنْ قَبْلُ -

তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বে (এবং এ কুরআনেও)। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)

যদি নির্ভেজাল শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তবে দেখা যাবে— যে জায়গায় এবং যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা শেষ করা হয়েছে, এর চেয়ে ভাল কোন দৃশ্য আর ছিল না। যেখানে এ ঘটনা শেষ করা যেত এবং দ্বীনি উদ্দেশ্যও পূর্ণমাত্রায় সফল হতো। অবশ্য সেখানেও এ ঘটনা শেষ করা যেত যেখানে কা'বা নির্মাণের পর হাজ্জের জন্য লোকদেরকে আহ্বান কিংবা কা'বা নির্মাণের আগে কলিজার টুকরা শিশু ইসমাঈল (আ)-কে এক নির্জন উপত্যকায় রেখে আসা হচ্ছিল। কিন্তু তাতে দ্বীনি উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হতো না।

[২.২] হযরত ঈসা (আ)-এর ঘটনা দেখুন যা আল-কুরআনে আট জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ কিস্তি বর্ণিত হয়েছে সূরা আল-মায়িদায়। (অবতীর্ণের ক্রমধারা— ১১২)। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَأُمِّىَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ ط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ط إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ - إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমাকে এবং আমার মাকে উপাস্য বানিয়ে নাও? ঈসা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, আমার শোভা পায় না যে, আমি একথা বলি আর তা বলার অধিকারও আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি তবে আপিন অবশ্যই তা অবহিত। আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং

আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমিতো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু তা-ই বলেছি যা আপনি বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতোদিন তাদের সাথে ছিলাম। যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত; যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে মাফ করে দেন তবে আপনিই প্রবল পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

(সূরা আল-মায়িদা ঃ ১১৬-১১৮)

দেখুন, হযরত ঈসা (আ)-এর ঘটনার উপসংহারও টানা হয়েছে দ্বীনি ও শৈল্পিক উভয়টির সমন্বয়ে।

একদিকে দ্বীনি উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে, অন্যদিকে শৈল্পিক সৌন্দর্যও পূর্ণতা লাভ করেছে। ঈসা (আ)-এর জন্মের ব্যাপারটিই ব্যতিক্রম— অলৌকিক। সেই অলৌকিকতার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে উলুহিয়াতের সন্দেহ। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক জটিলতার। শেষ মুহূর্তে তিনি সৃষ্টিকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দাসত্বের স্বীকারোক্তি এবং জাতিকে যে কথা বলা হয়েছে তার সাক্ষ্য প্রদান এবং সর্বশেষ এ ব্যাপারটি পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করা।

যেখানে এ কাহিনী শেষ করা হয়েছে শৈল্পিক দাবিও ছিল কাহিনীটি সেখানেই শেষ হোক। এ কাহিনী শেষ করার জন্য এর চেয়ে ভাল কোন জায়গা আর ছিল না।

[২.৩] হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা কুরআনের সব ক'টি জায়গায়ই তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানোর বর্ণনার মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। তার সাথে শুধু এতোটুকুন বর্ধিত করা হয়েছে, তিনি অপরাধের মা'ফ চেয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাকে মা'ফ করে দিয়েছেন। তারপর আল-কুরআন নীরব— (যদিও তওরাতে আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে) তার কারণ— হযরত আদম (আ) তাঁর পুরনো দুশমন শয়তানের পরামর্শ গ্রহণ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার পরিণতিতে পৃথিবীতে প্রেরণ। এখানেই দ্বীনি উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।

শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে, প্রতিটি সমাপ্তি বিন্দুতে সেই জিনিস বর্তমান, যার অনুসন্ধান একজন শিল্পী করে থাকে। একজন শিল্পীর জন্য শুধু এ কথাই যথেষ্ট, হযরত আদম (আ) নিজের অপরাধের কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তারপর মানুষের চিন্তা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি চিন্তা করতে পারেন— হযরত আদম ও হাওয়া আনাড়ীভাবে কোথায় কোথায়

ঘুরেছেন ? তাদের জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিক লেনদেন কেমন ছিল ? এরূপ নানা প্রকার খেয়ালী প্রশ্ন। এ ঘটনার সাথে এসব বিষয় আলোচনায় এলে শৈল্পিক সৌন্দর্যে ভাটা পড়তো। তাই যেখানে শেষ করা হয়েছে সেখানে শৈল্পিক সৌন্দর্যে কোন ভাটা পড়েনি।

[২.৪] হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনা আল-কুরআনে মোট তিন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ যে সূরায় এ ঘটনার বিবৃত হয়েছে তা সূরা আল-আম্বিয়া (অবতীর্ণক্রম তিয়াত্তর)। এ সূরায় ঘটনার শেষ কিস্তি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ - فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ج وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ - وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ج فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ - وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ - وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ج وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ -

এবং স্মরণ করো, দাউদ ও সুলাইমানকে, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল। তাতে রাতে কিছু মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সামনে ছিল। অতপর আমি সুলাইমানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। আমি পর্বত ও পাখীকূলকে দাউদের অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতো। এগুলো আমিই করেছিলাম। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে ? আর বায়ুকে সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম, তা তার নির্দেশে প্রবাহিত হতো ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি। আর শয়তানের কতককে তার অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা তার

জন্য ডুবুরীর কাজ করতো এবং এছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করতো। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৮-৮২)

হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনায় বেশি বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। সেখানে দ্বীনি হিকমত এবং প্রজ্ঞাও বিদ্যমান! কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় ঘটনার সমাপ্তিতে দ্বীনি উদ্দেশ্য ও শৈল্পিক বিষয়ের মধ্যে কোন সংগতি নেই। শৈল্পিক দাবি ছিল হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনা ঐ দৃশ্যে সমাপ্তি টানা যেখানে তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তিনি মৃত্যুর পরও লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে এ দৃশ্য কাহিনী শেষ করার জন্য যথার্থ ছিল। হযরত সুলাইমান (আ)-এর জীবনে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসন ও প্রজ্ঞা উভয়ই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। হযরত সুলাইমান (আ) যেমন একজন বিচারক ঠিক তেমনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্তে যেমন আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকাশ ঘটেছে। অপরদিকে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনের দিকটিও এসেছে। বস্তুত কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে এমন এক উপসংহারের মাধ্যমে যেখানে গোটা জিন্দেগীর ওপর সার-সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের তৎপরতার বর্ণনা এসেছে এবং সবকিছুকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়েই ঘটনার সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

[২.৫] আল-কুরআনের অনেক জায়গায় বিভিন্ন নবী-রাসূলের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সমাপ্তিও হয়েছে শৈল্পিক দাবি অনুযায়ী এবং সেখানে দ্বীনি উদ্দেশ্যও প্রকাশিত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ - وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ - وَأَصْحَٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَٰفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ -

তারা যদি তোমাকে মিথ্যেবাদী বলে বলুক, তাদের পূর্বেও মিথ্যেবাদী বলেছে নূহ, আদ, সামুদ, ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মূসার সম্প্রদায়ও তাদেরকে মিথ্যেবাদী বলেছে। তারপরও আমি কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম। পরে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। দেখ, কী ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম। (সূরা হজ্জ ঃ ৪২-৪৩)

এতে কোন সন্দেহ নেই, এ সমাপ্তিতে দ্বীনি উদ্দেশ্য ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের পূর্ণমাত্রায় বিকাশ ঘটেছে এবং তা সঠিক জায়গায় সমাপ্ত হয়েছে।

[২.৬] হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছে। যার শুরু হয়েছে ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে স্বপ্নকে পূর্ণতা দিয়ে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের লজ্জাবনত মস্তকে উপস্থিতি এবং পিতা-মাতার প্রত্যাবর্তন ও মিলনের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টানা হয়েছে। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। কারণ ঘটনা বর্ণনার যে দ্বীনি উদ্দেশ্য ছিল তা পুরা হয়ে যাওয়ায় অন্যত্র এ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়নি।

৩. কাহিনী বর্ণনার দ্বীনি উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আরেকটি দাবি ছিল, তা স্থান, কাল ও পাত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে, যেখানেই তা বর্ণনা করা হোক না কেন। এদিক থেকে এটি একই রঙ ও শিল্পের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে, যে প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে আমরা আলাদা এক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সেই অধ্যায়ে আমরা কুরআনী চিত্রের বিভিন্ন রঙ ও অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

ঘটনায় বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে যে পরিমাণ মিল ও সামঞ্জস্য পাওয়া যেতে পারে আমরা তা 'কুরআনী কাহিনী দ্বীনি উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়ার নিদর্শন' শিরোনামে আলোচনা করেছি এবং সেখানে নিম্নোক্ত আয়াতটি দিয়ে উদাহরণও দিয়েছি ঃ

نَبِّىءْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ – وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ –

তুমি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু এবং আমার শাস্তিও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা হিজর ঃ ৪৯-৫০)

তারপর এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এখন আমরা আরও কিছু উদাহরণ বর্ণনা করবো যেখানে দ্বীনি উদ্দেশ্য এবং শৈল্পিক বিন্যাস একটি আরেকটির পরিপূরক।

[৩.১] সূরা আল-আ'রাফে হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ – قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ

وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ - قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ - قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ - قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ - قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ - ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ - قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ - وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ - لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَانَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ - وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ - فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا - وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ - قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ - قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ -

আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরী করেছি। পরে আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই

সিজদা করেছে কিন্তু ইবলিস সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন কিসে তোকে সিজদা থেকে বিরত রাখল? সে বললো ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। আল্লাহ্ বললেন ঃ তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নেই, বেরিয়ে যাও। তুই নীচু ও হীনদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললো ঃ আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে সময় দেয়া হলো। সে বললো ঃ আপনি আমাকে যে উদ্ভ্রান্ত করেছেন আমিও অবশ্য তাদের জন্য আপনার সরল পথের ওপর বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে এবং বাম থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ্ বললেন ঃ বেরিয়ে যাও এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে-কেউ তোর পথে চলবে, অবশ্যই আমি তাদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো। হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো। অতপর সেখান থেকে যা ইচ্ছে খাও। তবে ঐ বৃক্ষের কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তারপর শয়তান তাদের উভয়কে প্ররোচিত করলো, যাতে তাদের অঙ্গ— যা গোপন ছিল— তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললো ঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি, তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও। কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললো ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী। অতপর প্রতারণার দ্বারা তাদেরকে সম্মত করে ফেললো। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের ওপর জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা উভয়ে বললো ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সেখানে থাকতে হবে। আরও বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবন ধারণ করবে, মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখানেই পুনরুত্থিত হবে।

(সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১১-২৫)

এরপর ধারাবাহিকভাবে প্রসঙ্গ অব্যাহত রাখা হয়েছে। আদম সন্তানকে শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার নসিহত করে বলা হয়েছে ঃ 'হে আদম! তোমরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ো না, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া) পড়েছিল। ফলে তারা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।'

মানুষকে বলা হয়েছে যে, মুবাহ্ জিনিস থেকেও সতর্ক থাক এবং আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম করে নিও না। যেসব নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাঠান হয়েছিল তাঁদের আনুগত্য করো। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 'আমরা শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি যারা ঈমান গ্রহণ করে না।' তারপর কিয়ামতের চিত্র পেশ করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্র পাঠানো হেদায়েত অনুযায়ী চলেছিল তারা আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত। এমনিভাবে যারা শয়তানের অনুসরণ করেছিল তারাও জবাবদিহির জন্য আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান। এর শেষ হয়েছে এভাবে, একদল জান্নাতে প্রবেশ করলো এবং আরেক দল জাহান্নামে। আরও সামনে অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে আরাফবাসীগণ অন্যদেরকে ডেকে বলবে ঃ 'ভয়-ভীতি ছাড়া সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করে যাও।' অন্যদিক থেকে ফেরেশতাগণ ডেকে বলবে ঃ 'এটি ঐ জান্নাত যা তোমাদের নেক আমলের বিনিময়ে তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।' যে সম্পর্কে আমরা 'শৈল্পিক চিত্র' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

আসল কথা হচ্ছে, শয়তানের অনুসরণ করার কারণেই তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আবার শয়তানের অনুসরণ না করার কারণেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তাদের প্রত্যাবর্তন ঐ ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের মতো যে নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এবং কিছুদিন পর পুনরায় নিজের বাড়ি চলে এলো। এখানে 'বের হওয়া এবং প্রবেশ করার' মধ্যেই শৈল্পিক সৌন্দর্য নিহিত। এ প্রসঙ্গে আলোচনার আসল জায়গা সেইটি যেখানে আমরা 'শৈল্পিক বিন্যাস' সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

আমরা এ আলোচনা এখানে শেষ করলাম এ আশায়, পাঠকগণ এরই আলোকে অন্যান্য ঘটনাবলী যাচাই করতে পারবেন।

দশম অধ্যায়

কাহিনীর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য

এখন আমি এমন সাধারণ শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে চাই, যা পাওয়া গেলে কোন ঘটনার দ্বীনি উদ্দেশ্য, শৈল্পিক সৌন্দর্য সুষমার পথ ধরে পুরো হয়ে যায় এবং শৈল্পিক সৌন্দর্য-সুষমা সেই কাহিনীকে মন-মস্তিষ্ক এবং চিন্তা-চেতনার ওপর বেশি প্রভাব বিস্তারকারী বানিয়ে দেয়। যার ফলে মানুষের মন অতি সহজেই তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এ ধরনের বর্ণনার জন্য চারটি শৈল্পিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যথা ঃ

১. বর্ণনা বিভিন্নতা ঃ শৈল্পিক বিশেষত্বের মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে কাহিনী বর্ণনার পদ্ধতিগত পার্থক্য। কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী আমরা বর্ণনা করতে গিয়ে তার চারটি ধরন সম্পর্কে অবহিত হই। নিচে পর্যায়ক্রমে তা আলোচনা করা হলো।

[১.১] যেমন আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা আল-কুরআনে শুরু করা হয়েছে এভাবে ঃ

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا - اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا - فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا - ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا -

তুমি কি মনে করো, গুহা ও গুহার অধিবাসীরা আমার নির্দশনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল ? যখন যুবকগণ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দো'আ করেছিল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের কাজকে আমাদের জন্য সহজ করে দিন। তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের ওপর (নিদ্রার)

পর্দা ফেলে দিলাম। তারপর আমি তাদেরকে পুনরুত্থিত করি একথা জানার জন্য, দুই দলের মধ্যে কে তাদের অবস্থান সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।
(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৯-১২)

এ হচ্ছে ঘটনার সার-সংক্ষেপ। এরপর ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। যেমন— গুহায় প্রবেশ করার পূর্বে পরস্পর পরামর্শ, গুহায় প্রবেশের অবস্থা, তাদের ঘুম ও জাগ্রত হওয়া, তাদের একজনকে খাদ্য ক্রয়ের জন্য পাঠানো, শহরে তাকে নিয়ে আলোচনা ও কানা-ঘুষা, তার প্রত্যাবর্তন, আসহাবে কাহ্ফের মৃত্যু। তাদের কবরের ওপর সৌধ নির্মাণ, এ সম্পর্কে লোকদের মতান্তর ইত্যাদির বর্ণনা। ঘটনার শুরুতে এমনভাবে সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে পাঠক তা পড়ামাত্র পরের ঘটনা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে।

[১.২] অনেক সময় কোন ঘটনার উপসংহার বা পরিণতি বর্ণনা করা হয়, তারপর পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলা হয়। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা, যা সূরা কাসাসে বর্ণিত হয়েছে। তার শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ - نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَا مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ - اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَ هُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ - وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ - وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَ هُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ -

আমি তোমার কাছে মূসা ও ফিরাউনের ঘটনা সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছে হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা, দেশের উত্তরাধিকারী এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার। যেন

ফিরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে দেখিয়ে দেয়, যা তারা দুর্বল দলের পক্ষ থেকে আশংকা করতো। (সূরা কাসাস ঃ ২-৬)

এরপর হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন—জন্ম, প্রতিপালন, দুধপান করানো, যৌবনে পদার্পণ, এক কিতবীকে হত্যা করে দেশান্তর হওয়া ইত্যাদি। তারপর শুরু হয়েছে পরবর্তী ঘটনাবলী যা শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনার শুরু এমনভাবে করা হয়েছে যে, পাঠকের ব্যাকুলতা বেড়ে যায়। আগ্রহের অতিশয্যে তাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়— এমতাবস্থায় মূসা (আ) কী করলেন ?

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাও একই রূপ। ঘটনার শুরু হয়েছে স্বপ্নদর্শন থেকে। স্বপ্ন দেখে তিনি তার পিতার নিকট বর্ণনা করছেন। পিতা বুঝতে পারছেন এ স্বপ্ন পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠিত ও সুনাম অর্জনের ইঙ্গিত। ঘটনার শুরু এভাবে ঃ

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ - قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

যখন ইউসুফ পিতাকে বললো ঃ আব্বাজান! আমি স্বপ্নে দেখলাম এগারটি নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্য আমাকে সিজদা করছে। তার পিতা বললো ঃ বেটা! তুমি তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্নের কথা বলো না। তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তাঁর বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবারের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন। যেমন ইতোপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইউসুফ ঃ ৪-৬)

তারপরই ঘটনা শুরু হয়ে গেছে। ঘটনা আর কিছু নয়, তাঁর স্বপ্নের প্রতিফলন মাত্র। যে সম্পর্কে পিতা ইয়াকুব (আ) আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ঘটনা শেষ হয়েছে স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সুন্দর পরিসমাপ্তির পর আল-কুরআন নীরব। ঐসব বক্তব্য সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি যা তওরাতে বর্ণিত।

[১.৩] অনেক সময় ঘটনাসমূহ বিনা ভূমিকায় কিংবা সার-সংক্ষেপ বর্ণনা ছাড়াই সরাসরি শুরু করা হয়েছে। আবার হঠাৎ করেই তা শেষ করা হয়েছে। যেমন— হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বিনা ভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে। তেমনিভাবে হযরত সুলাইমান (আ) ও সম্রাজ্ঞী বিলকিসের ঘটনার মধ্যে হঠাৎ করে হুদহুদ ও পিপিলিকার বর্ণনা চলে এসেছে।

[১.৪] আবার এমনও দেখা যায়, ঘটনা বর্ণনায় কল্পনার রঙ দেয়া হয়েছে। ঘটনা শুরু হলো, ঘটনার বিবরণ চলছে এমনি সময় নায়কের মুখ দিয়ে কতিপয় আবেদন করানো হলো। যেমন— আমরা 'শৈল্পিক চিত্র' অধ্যায়ে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ঘটনার দৃশ্যাবলী তুলে ধরেছি। যেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

স্মরণ করো যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিল, (তখন বললোঃ) পরওয়ারদিগার! আমাদের থেকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১২৭)

এটি অনেক বড় দৃশ্য। আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীতে এ ধরনের অনেক উপমা-উদাহরণ পাওয়া যায়।

২. হঠাৎ রহস্যের জট খোলা ঃ দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, হঠাৎ কোন ঘটনার রহস্যের জট খুলে যাওয়া।

[২.১] অনেক সময় ঘটনার রহস্য পাঠক কিংবা নায়ক উভয়ের কাছেই অজানা থাকে। কিন্তু ঘটনার কোন এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ তা পাঠকের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠে। এর উদাহরণ হচ্ছে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা, যখন তিনি একজন সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট গিয়েছিলেন। যা সূরা আল-কাহ্ফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَآاَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْمَحْرَيْنِ اَوْ
اَمْضِىَ حُقُبًا - فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا
فَتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِىْ الْبَحْرِ سَرَبًا - فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا
غَدَآءَنَا ز لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا - قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ
اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَآاَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ
اَذْكُرَهٗ ج وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِىْ الْبَحْرِ ق عَجَبًا - قَالَ ذٰلِكَ مَاكُنَّا
نَبْغِ ق فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا - فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ
اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا - قَالَ لَهٗ مُوْسٰى
لَنْ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا - قَالَ اِنَّكَ
تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا - وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا -
قَالَ سَتَجِدُ نِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا - قَالَ فَاِنِ
اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا -
فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَافِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ط قَالَ اَخَرَ قْتَهَا
لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ج لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرً - قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا - قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْحِقْنِىْ
مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا- فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ لا قَالَ
اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا - قَالَ
اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا - قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ
شَىْءٍ بَعْدَ هَافَلَا تُصٰحِبْنِىْ ج قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا -

فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ نِ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا - قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ج سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا -

যখন মূসা তার যুবক (সঙ্গী)-কে বললো ঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি থামবো না, যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো। অতপর যখন তারা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছল, তখন তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল। মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। সে স্থানটি অতিক্রম করে গিয়ে মূসা সঙ্গীকে বললো ঃ আমাদের নাস্তা আনো। আমরা এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সে বললো ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তর খণ্ডে বিশ্রাম নিয়েছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখা থেকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। মূসা বললো ঃ আমরা তো সেই স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতপর তারা নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললো। তারপর তারা আমাদের বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। মূসা তাকে বললো ঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি, সত্য পথের যে জ্ঞান আমাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন ? সে বললো ঃ আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় (বুঝা) আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্য ধরবেন কেমন করে ? মূসা বললো ঃ আল্লাহ্ চাহেতো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করবো না। সে বললো ঃ যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। অতপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলো তখন সে তাতে ছিদ্র করে দিলো। মূসা বললো ঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে মারার জন্য এতে ছিদ্র করে দিলেন ? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর অপরাধ করলেন। সে বললো ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা বললো ঃ আমাকে আমার ভুলের জন্য

অপরাধী করবেন না। তারপর তারা আবার চলতে লাগল। অবশেষে একটি বালকের সাক্ষাৎ পেল, সে তাকে হত্যা করে ফেললো। মূসা বললো ঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই ? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। সে বললো ঃ আমি কি বলিনি আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা বললো ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগমুক্ত হয়ে গেছেন। অতপর তারা চলতে লাগলো। অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে খাবার চাইল, তারা আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করলো। অতপর তারা সেখানে একটি পতনুম্খ প্রাচীর দেখতে পেল, সেটি সে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলো। মূসা বললো ঃ আপনি ইচ্ছে করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। সে বললো এখানেই আমার ও আপনার বিচ্ছেদ ঘটল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি।

(সূরা কাহ্ফ ঃ ৬০-৭৮)

উল্লেখিত আয়াতে ধারণকৃত উপাদান যা আমাদের জন্য রহস্যের সৃষ্টি করেছে, তার কোন কুলকিনারা আমরা পাই না। সেই রহস্যের সামনে আমরা তেমনি লা-জবাব যেমন ঘটনার নায়ক হযরত মূসা (আ)। আমরা এটিও জানি না অত্যাশ্চর্যজনক ঘটনা যিনি ঘটালেন তিনিইবা কে। এমনকি আল-কুরআন তার নাম প্রকাশেরও প্রয়োজনবোধ করেনি। আর নাম প্রকাশের প্রয়োজনই বা কি ? ঐ ব্যক্তিতো আল্লাহ্র কুদরতে এবং তাঁরই নির্দেশে সমস্ত কাজ আনজাম দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ সেই মামলার পরিণতি সেই রকম করবেন না। যা আমাদের সামনে ঘটে গেল, আমরা দেখলাম। কারণ, তাঁর দৃষ্টিতো সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য পানে নিবদ্ধ। যেখানে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছে না। তদ্রূপ তার নাম উল্লেখ না করার ব্যাপারটিও ঘটনার রহস্যময়তার সাথে পুরো সামঞ্জস্যশীল।

এতে কোন সন্দেহ নেই, ঘটনার শুরু থেকেই অজানার এক অদৃশ্য পর্দা ছিল। মূসা (আ) সৎ বান্দাকে দেখার উৎসুক্য, তাঁর সন্ধানে পথ চলা, মূসা (আ)-এর যুবক সাথী কর্তৃক পাথরের নিকট মাছ চলে যাওয়ার ব্যাপারটি ভুলে যাওয়া, ভুলের মাসুল আদায়ের জন্য পুনরায় পাথরের নিকট চলে আসা, সৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ। যদি ফিরে না আসতেন তবে আর কখনো তাঁর সাক্ষাৎ তিনি পেতেন না। যে ঘটনা সংঘটিত হলো তাও রহস্যাচ্ছন্ন। যিনি এ ঘটনা ঘটালেন তার নাম পর্যন্ত জানা গেল না।

সবেমাত্র রহস্যের জট খুলছে। এখন মূসা (আ) জানতে পারবেন কেন এ

ঘটনাগুলোর অবতারণা করা হলো। সাথে সাথে আমাদের কাছেও তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا - وَأَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ أَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ أَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا - فَأَرَدْنَآ أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا - وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا ج فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ق رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ج وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ط ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَالَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا -

নৌকাটির ব্যাপার— সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো, আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে ইচ্ছে করলাম, কারণ তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ, সে বল প্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। বালকটির ব্যাপার— তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম, সে অবাধ্যতা ও কুফুরী দিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতপর আমি ইচ্ছে কলাম, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চেয়ে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার— সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্ত ধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াপরবশ ইচ্ছে করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটি করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অক্ষম ছিলেন, এই হলো তার ব্যাখ্যা।
(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৭৯-৮২)

উল্লেখিত ঘটনায় যে রহস্যের সৃষ্টি করা হয়েছে তা সৎ ব্যক্তি কাশ্ফ কিরামতের রহস্য উন্মোচন হওয়ার পর পাঠক কিছুটা সম্বিত ফিরে পান। জিজ্ঞেস করেন— তিনি কে ? উত্তর পাওয়া যায় না। রহস্য রহস্যই থেকে যায়। তিনি

প্রথমও যেমন রহস্যাচ্ছন্ন ছিলেন এখনও তাই। এ ঘটনায় অত্যন্ত শক্তিশালী হিকমতের প্রকাশ ঘটেছে। যার সামান্য এক ঝিলিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো, অতপর তা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির আড়ালে।

[২.২] অনেক সময় এমনও দেখা যায়, ঘটনার রহস্য দর্শকদের নিকট পরিষ্কার কিন্তু তখনও তা নায়কের কাছে অজানা। তবু সে তার কাজ করেই যায়। অবশ্য দর্শক জেনে যান তা কিভাবে ঘটছে, কেন ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে তখন, যখন কাউকে উপহাস বা হাসিঠাট্টার ছলে কিছু বলা হয়। দর্শকগণ শুরু থেকেই তাদের তৎপরতা দেখেন, তা নিয়ে হাসাহাসিও করেন। ইতোপূর্বে আমরা বাগান মালিকদের ঘটনা বলেছি। সে ঘটনা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِ مُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ - وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ - فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ - فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ -

যখন তারা শপথ করেছিল, সকালে বাগানের ফল সংগ্রহ করবে। কিন্তু তারা 'ইনশাআল্লাহ্' বললো না। অতপর তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো, তখন তারা নিদ্রিত ছিল। ফলে সকাল পর্যন্ত তা হয়ে গেল ছিন্নভিন্ন তৃণসম।

আমরা তো ঘটনা জানলাম কিন্তু এখনো বাগান মালিকগণ বেখবর। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ - اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ - فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ - اَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ - وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ -

সকালে তারা একে-অপরকে ডেকে বললো ঃ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। অতপর তারা চললো ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে ঃ আজ যেন কোন মিসকিন তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হলো। (সূরা আল-কলম ঃ ২১-২৫)

আমরা দর্শকগণ যখন মুচকি মুচকি হাসি, যখন তারা ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে বাগানের দিকে রওয়ানা দেয়। ওদিকে বাগানকে তছনছ করে

দেয়া হয়েছে। যখন আমরা হাসিতে লুটিপুটি খাই, তখন কেবল তাদের কাছে রহস্যের জট খুলতে শুরু করে।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ -

অতপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বললো ঃ আমরা পথ ভুল করেছি, না হয় আমরা বঞ্চিত হলাম। (সূরা আল-কলম ঃ ২৬-২৭)

অবশ্যই যারা মিসকিনদেরকে বঞ্চিত রাখতে চায় তাদের জন্য এটি যথার্থ শাস্তি।

[২.৩] অনেক সময় এমনও হয়, দর্শকদেরকে ঘটনার আংশিক অবগত করানো হয় কিন্তু ঘটনার মূল অবস্থা তখনও দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় এবং এ ঘটনার একটি অংশ এমন থাকে, যা দর্শক এবং নায়ক কেউই ওয়াকিফহাল নয়। তার উদাহরণ সম্রাজ্ঞী বিলকিসের সিংহাসন। যা চোখের পলকে হাজির করা হয়েছিল। আমরা এও জানি, তা হযরত সুলাইমান (আ)-এর সামনেই সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে রানী বিলকিস মোটেও অবহিত ছিলেন না। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এটি কি আপনার সিংহাসন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটি যেন সেইটি-ই। এটি এমন এক রহস্য যা আমরা প্রথম থেকেই অবগত আছি। কিন্তু কাঁচের প্রাসাদের ব্যাপারটি বিলকিসের মতো আমরাও অন্ধকারে ছিলাম। বিলকিসের সাথে সাথে আমরাও ঠিক তখনই ব্যাপারটি বুঝতে পারলাম যখন বিলকিস পানির হাউস অতিক্রম করার জন্য পায়ের গোছার ওপর কাপড় তুলে ধরেছেন। হযরত সুলাইমান (আ) তা দেখে বললেন ঃ এটি পানির হাউজ নয়। এটি প্রাসাদ, যার নিচে কাঁচের দ্বারা এরূপ করা হয়েছে। [পরবর্তীতে আমরা তা সবিস্তারে বর্ণনা করবো।]

[২.৪] অনেক সময় দেখা যায়, রহস্যের কোন ঘটনা নয়, সাদাসিদা ঘটনা, প্রথমে তা সুস্পষ্ট থাকে না কিন্তু হঠাৎ করে তা পাঠক ও নায়ককে হতচকিত করে দিয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে। যেমন হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা। হযরত মারইয়াম (আ) পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী যাচ্ছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আ) মানবরূপে আবির্ভূত হন। হযরত মারইয়াম (আ) বলেন ঃ যদি আপনি সৎলোক হয়ে থাকেন তবে আমি আপনার কাছ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি। আমরা ঘটনা শুনেই বুঝতে পারি, তিনি জিবরাঈল (আ)। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন ঃ আমি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। তোমার জন্য একজন সৎ পুত্রের সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। তারপর হঠাৎ এ ঘটনা আমাদের সামনে চলে আসে, প্রসব

বেদনায় কাহিল হয়ে মারইয়াম (আ) একটি খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নেন এবং বলেন ঃ হায়! যদি আমি এর পূর্বেই মরে যেতাম। আমাকে সবাই ভুলে যেত। তখন নিচ থেকে ফেরেশতা আওয়াজ দিয়ে বললেন ঃ 'দুশ্চিন্তা করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার নিচ দিকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন।' আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

৩. দৃশ্যান্তরে বিরতি ঃ কাহিনীর তৃতীয় শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— বর্ণিত ঘটনার মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম বিরতি। যেমন আজকাল থিয়েটারে ও সিনেমায় বিরতির সময় পর্দা ফেলে দেয়া হয়, এভাবেই এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যের পার্থক্য করা হয়। আল-কুরআনে যতো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সকল ঘটনার মধ্যেই এ ধরনের বিরতি বিদ্যমান। ইতোপূর্বে আমরা যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছি সেখানে সহজভাবেই তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এখন আমরা উদাহরণ স্বরূপ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবো। সর্বমোট ২৮টি দৃশ্যে এ ঘটনা শেষ করা হয়েছে। তবে আমরা সবগুলো দৃশ্য নিয়ে আলোচনা না করে বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে আলোচনা করবো।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা রেশন সংগ্রহের জন্য দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর কাছে যান। তিনি তখন খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি ভাইদেরকে পুনরায় এলে তার আপন ভাইকে সাথে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও তারা বিন ইয়ামিনকে নিয়ে মিসরে যায় রেশনের জন্য। হযরত ইউসুফ (আ) শস্য পরিমাপের সময় একটি পেয়ালা তার ভাইয়ের পাত্রে লুকিয়ে রাখেন। তারপর তাকে চোর সাব্যস্ত করে কৌশলে নিজের নিকট রেখে দেন। তখন ভাইয়েরা পরামর্শ করে অন্য কাউকে আটকে রাখার আবেদন করে কিন্তু তিনি তা বলিষ্ঠভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ط قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا
اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ
فِىْ يُوْسُفَ ج فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْٓ اَبِىْٓ اَوْ يَحْكُمَ
اللّٰهُ لِىْ ج وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ - اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا
يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ج وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا

لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ - وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ط وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ -

অতপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন পরামর্শের জন্য এক জায়গায় বসলো। তাদের বড় ভাই বললো ঃ তোমরা কি জান না পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করছো ? অতএব, আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করবো না, যে পর্যন্ত পিতা আমাকে আদেশ দেন কিংবা আল্লাহ্ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বলো ঃ আব্বাজান, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম যা আমাদের জানা ছিল এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। অবশ্যই আমরা সত্য কথা বলছি।

(সূরা ইউসুফ ঃ ৮০-৮২)

পর্দা পড়ে গেল। এখন আমরা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের সাথে অন্য এক দৃশ্যে মিলবো। তবে তা মিসরে কিংবা মিসরের কোন শহরে নয়। আমরা মিলবো, যখন তারা পিতার সামনে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত দানে ব্যস্ত। পর্দা উঠে গেল। আমরা সেখানে তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করতে দেখি।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

ইয়াকুব বললো ঃ এসব কিছুই নয়। তোমরা শুধু মনগড়া একটি কথা নিয়ে এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একই সাথে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি সুবিজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

(সূরা ইউসূফ ঃ ৮৩)

পর্দা পড়ে গেল। এখন আমরা হযরত ইয়াকুব (আ) ও তাঁর ছেলেদেরকে অন্য একটি দৃশ্যে দেখবো। সেখানে দেখা যাবে ইয়াকুব (আ) গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। ছেলেরা পিতার অবস্থা দেখে পেরেশান। পর্দা উঠে গেল।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ - قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ - قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ - يٰبَنِىَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَايَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ -

সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললো ঃ হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! দুঃখে তার চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল। অসহনীয় মনস্তাপে সে ছিল ক্লিষ্ট। তারা বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র কসম! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না। যে পর্যন্ত মরণাপন্ন হয়ে যান কিংবা না মৃত্যুবরণ করেন। সে বললো ঃ আমিতো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্র সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি যা জানি তা তোমরা জান না। বেটারা! যাও ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে তালাশ করো এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। একমাত্র অবিশ্বাসী ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয় না। (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৪-৮৭)

এখন আবার পর্দা পড়ে যাবে। ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা রওয়ানা দিলো। এরপর আর কিছু আমাদের জানা নেই। যখন পুনরায় পর্দা উঠলো তখন আমরা মিসরে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট তাদেরকে উপস্থিত হয়ে বলতে শুনি ঃ

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ط اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ -

অতপর যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌছল তখন বললো ঃ হে আমীর! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৮)

আসহাবে কাহ্ফ, হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা এবং হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনাবলীও একই স্টাইলে বর্ণিত। আমরা সামনে আরও আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ্।

৪. ঘটনার মাধ্যমে দৃশ্যাংকন ঃ আমরা ইতোপূর্বে কাহিনীর তিনটি শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আলোচনা করবো কিভাবে ঘটনার মাধ্যমে দৃশ্যাংকন করা হয়েছে। এই প্রকারটি আলোচ্য পুস্তকের 'শৈল্পিক চিত্র' অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে আমরা বলেছি, আল-কুরআনে যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যদিও তা অতীতকালের কিন্তু পাঠকগণ যখন তা পাঠ করেন কিংবা শ্রোতাগণ তা শ্রবণ করেন তখন তাদের নিকট সমস্ত চিত্রটি মূর্তমান হয়ে উপস্থিত হয়। মনে হয় ঘটনাটি বর্তমানে তার চোখের সামনেই সংঘটিত হচ্ছে।

এখন আমরা যা বলতে চাই তা হচ্ছে, ঘটনাবলীর মাধ্যমে যে দৃশ্য বা ছবি আঁকা হয় তা বিভিন্ন স্টাইলের হয়ে থাকে। যেমন ঘটনার মাধ্যমে কোন ছবি জীবন্ত হয়ে প্রতিভাত হওয়া। কিংবা সেই ছবিতে আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ হওয়া, অথবা ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিলক্ষিত হওয়া। কোন কোন সময় ঘটনা বা কাহিনীতে দু' ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকলেও একটি অন্যটির চেয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে। ফলে ঐ ঘটনাটিকে সেই নামেই আখ্যায়িত করা হয়। সমস্ত কাহিনীর দৃশ্যেই এসব শৈল্পিক সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আমরা এগুলোর শুধুমাত্র শব্দের মাধ্যমে আলোচনা না করে উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চাই।

আমরা এর আগে বাগান মালিকদের ঘটনা বর্ণনা করেছি। এমনকি আমরা সে ঘটনার চিত্রায়ণও দেখেছি। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কা'বা ঘরের সামনে দাঁড়ান দেখেছি। হযরত নূহ (আ) ও তাঁর পুত্রকে দেখেছি প্লাবনের মুহূর্তে। এ চিত্রগুলো সর্বদা জীবন্ত, চিরন্তনী। এসব ঘটনার পাঠক কিংবা শ্রোতা মনে করেন ঘটনাটি তার চোখের সামনেই সংঘটিত হচ্ছে। এখন আমরা আরও কিছু উদাহরণ বর্ণনা করছি।

যখন আসহাবে কাহ্ফ (গুহার অধিবাসীগণ) মুশরিকদের দল থেকে বেরিয়ে তওহীদের পথে এলেন, তখন তারা পরস্পর একটি পরামর্শ করেছিলেন। যা কুরআন আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। যখনই আমরা তা পাঠ করি কিংবা শুনি মনে হয়, তারা যেন আমাদের চোখের সামনেই পরামর্শ করছে এমনকি তাদের কথাবার্তা পর্যন্ত আমরা শুনছি।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنٰهُمْ هُدًى - وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا – هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا – وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا –

আমি তোমার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাদের মনকে দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারা বলবে ঃ আমাদের প্রতিপালক আসমান ও জমিনের পালনকর্তা, আমরা কখনো তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করবো না। যদি করি তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এরা আমাদেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে না কেন ? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যে উদ্ভাবন করে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে ? তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর রহম করবেন এবং তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসু করার ব্যবস্থা করবেন। (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ১৩-১৬)

এখানে এ দৃশ্য শেষ, পর্দা পড়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর সিনেমা-থিয়েটারের মতোই এখানে দৃশ্যান্তরে বিরতি। যখন পর্দা সরে যাবে তখন আমরা দেখতে পাব, পরামর্শ শেষে তারা পরস্পর গুহায় ঢুকে পড়েছে। আমরা নিজের চোখে তাদেরকে গুহায় প্রবেশ করতে দেখছি। এতে কোন সন্দেহ নেই। এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। আল-কুরআনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দাবিও তাই।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ –

তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডানে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায় তাদের থেকে পাশ কেটে বামে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত।

একেই বলে কোন কিছুকে চোখের সামনে হাজির করে দেয়া। বর্তমানে থিয়েটারে যেভাবে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে দৃশ্যকে স্পষ্ট করা হয় এখানেও সূর্যের আলোর মাধ্যমে তাই করা হয়েছে। সূর্যের চলমানতা এ দৃশ্যকে সচল করে তুলেছে। কিন্তু যখন সূর্য উঠে কিংবা যখন তা ডুবে, কোন সময়ই তার আলো গুহার ভেতর প্রবেশ করে না। দিনের সারাক্ষণ সেখানে চলে আলো-আঁধারীর খেলা। 'তাযাওয়ারু' (تَزَاوَرُ) শব্দ দিয়ে সে কথাই বুঝানো হয়েছে। কতো সহজভাবে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে, এ দৃশ্যটি সিনেমার পর্দায় দেখাতে কতো কষ্টই না করা হতো।

আসুন, আসহাবে কাহ্ফকে দেখুন। বলা হয়েছে ঃ هُمْ فِىْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ —'তারা গুহার প্রশস্ত জায়গার মধ্যে অবস্থিত' একথাটি একটি অনুপম সংযোজন। যা মুজিযা'র চেয়ে কোন অংশে কম নয়। একথা কয়টি আমাদের সামনে গোটা চিত্রটিকে জীবন্ত ও সচল করে তুলছে। মনে হয় তারা আমাদের চোখের সামনেই নড়াচড়া করছে।

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ق وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا -

তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দুটো গুহামুখে প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পালাতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ১৮)

এ কয়টি শব্দের মাধ্যমে আঁকা ছবিটি একেবারেই জীবন্ত, চলমান।

হঠাৎ আসহাবে কাহ্ফের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ঘটলো। আসুন দেখা যাক এবার কি ঘটে ঃ

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ ط قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ط فَابْعَثُوْآ اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ

اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا - اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِىْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا -

আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো ঃ তোমরা কতোদিন অবস্থান করেছ ? তাদের কেউ বললো ঃ একদিন কিংবা তারচে' কিছু কম। কেউ কেউ বললো ঃ তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন, তোমরা কতোকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে এ মুদ্রাসহ শহরে পাঠাও, সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য পবিত্র, তারপর তা থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য। সে যেন নম্রতার সাথে যায় আর কিছুতেই তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে আর তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে না।

(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ১৯-২০)

এ হলো তৃতীয় দৃশ্য অথবা দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষাংশ। এখন তারা সবাই জাগ্রত। সর্বপ্রথম তাদের জিজ্ঞাসা, কতোদিন তারা ঘুমিয়েছিলেন ? উত্তর পাওয়া গেল, একদিন কিংবা তার চেয়ে কম। অথচ আমরা জানি তাঁরা দীর্ঘ সময় গুহায় অবস্থান করেছেন। ঘটনার সার-সংক্ষেপ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। তারা ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই তারা ব্যাপারটি নিয়ে এতো মাথা ঘামাননি। এখন ঐ মুমিন ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন ঃ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ —"তোমাদের প্রতিপালক জানেন, তোমরা কতোদিন ঘুমিয়েছিলে"। তিনি কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করে একজনকে খাদ্য কেনার নির্দেশ দিলেন। তিনি সতর্ক করে বললেন ঃ অত্যন্ত নম্রতার সাথে শহরে যেতে হবে, কাউকে এ জায়গার কথা ফাঁস করে দেয়া যাবে না, খাদ্য ভাল ও পবিত্র দেখে কিনতে হবে। যদি কেউ খবর জেনে ফেলে তবে তারা হয়তো তাদেরকে মেরে ফেলবে কিংবা পিতৃপুরুষের ধর্মে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এ কথাগুলো তো গুহাবাসী (আসহাবে কাহ্ফ) বললেন। আমরা জানি কয়েকশ' বছর অতিবাহিত হয়েছে। এমন কেউ আর এখন অবশিষ্ট নেই যে, তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দেবে কিংবা পৈতৃক ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। কারণ, তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আসুন পরের দৃশ্যে আমরা তাদের প্রতিনিধির কার্যাবলী দেখি।

এর পরের দৃশ্য কোথায় ? এখানে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি, তাদের কথা লোকেরা জেনে ফেলেছিল। কিন্তু তাঁরা যে কাফিরদের ভয় করছিলেন প্রকৃতপক্ষে তখন সেসব কাফির-মুশরিক ছিল না। ঐ সময় সবাই ঈমানদার হয়ে গিয়েছিল।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيْهَا -

এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ২১)

এখানে পৌঁছে ঘটনার দ্বীনি উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাথে সাথে শৈল্পিক দিকটিও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন আমাদের চিন্তার জগতে যে প্রশ্নটি ঘুরপাক খায় তা হচ্ছে— যাকে শহরে পাঠান হলো তাঁর অবস্থা কি হলো ? যখন লোকজন তার রহস্য জেনে ফেললেন, তখনই বা তিনি কি করলেন ?

এখানেও এক সূক্ষ্ম বিরতি। তারপর বুঝা যায়, তখন তাদেরকে মৃত্যু গ্রাস করে নিল্। তখন লোকজন গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে বিতর্ক শুরু করে দিলো যে, তারা কোন্ দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ط رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا -

যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল, তখন তারা বললো ঃ তাদের ওপর সৌধ নির্মাণ করো। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো, তারা বললো ঃ আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করবো।

(সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ২১)

আবার বিরতি। এখন যদি কেউ চায় তবে সে কল্পনায় তাদের মাযারের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। এদিকে লোকদের অবস্থা ছিল— তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক শুরু করলো। কারো বিতর্ক তারা সংখ্যায় কতোজন ছিল, আবার কারো বিতর্কের বিষয় হচ্ছে— তারা কতোদিন ঘুমিয়েছিল ?

—১৭

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ج وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ج وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ –

অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে ঃ তারা ছিল তিনজন চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। আবার কেউ বলবে ঃ তারা ছিল পাঁচজন, তাদের কুকুর ছিল ষষ্ঠ। আবার এমন বলবে ঃ তারা ছিল সাতজন, অষ্টম ছিল তাদের কুকুরটি। (সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ২২)

যখন আসহাবে কাহ্‌ফকে জীবিত করার পর দ্বীনি উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল তখন পুনরায় তাদেরকে রহস্যের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো ঃ

قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ
اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ص وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا –

বলো ঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে। আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবে না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেসও করবে না।

ঘটনা পূর্ণতা প্রাপ্তির পর কুরআন তার দ্বীনি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছে। আসহাবে কাহ্‌ফকে পুনর্জীবন দান করার পর আল্লাহ্‌র যে কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার দিকে ইঙ্গিত করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে ঃ

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا – اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ز وَاذْكُرْ
رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا –

তুমি কোন কাজের বিষয়ে বলবে না যে, সেটি আমি 'আগামীকাল করবো'। ইনশাআল্লাহ্ ('আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে') একথা বলা ছাড়া। যখন ভুলে যাও, তখন তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ করো এবং বলো ঃ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চেয়েও নিকটতম সত্যের পথ-নির্দেশ করবেন। (সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ২৩-২৪)

এখানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে একটি বিশেষ কথা বলা হয়েছে। আমাদের সে আলোচনায় গিয়ে কাজ নেই। এতোটুকুনতো বুঝি কুরআন যেভাবে ঘটনা বর্ণনার সাথে সাথে দ্বীনি উদ্দেশ্যকে

সুস্পষ্ট করে দেয়, এখানেও তেমন দিয়েছে। শিক্ষামূলক উপদেশের জন্য এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কী ছিল?

সর্বশেষ তাদের গুহায় অবস্থানকালের সঠিক তথ্য দেয়া হয়েছে, যা এ ঘটনায় আমাদেরও বক্তব্য। অবশিষ্ট থাকে তাদের সংখ্যা। তা আজও— স্বয়ং আসহাবে কাহ্ফের মতো— এক রহস্য।

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوا تِسْعًا -

গুহায় তাদের উপর তিনশ' বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ২৫)

এ ঘটনার অন্তরালে যে দ্বীনি শিক্ষা নিহিত তা নিম্নের শব্দমালায় প্রকাশ ঘটেছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ط مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ز وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا - وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا -

বলো ঃ তারা কতোকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কতো চমৎকার দেখেন ও শুনেন। তিনি ছাড়া তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। তোমার প্রতি তোমার প্রভুর যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করো। তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ছাড়া তোমার কোন আশ্রয়স্থলও নেই।

(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ২৬-২৭)

আমি কাহিনীর সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি, তারপর তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। একটি কথায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল-কুরআনে ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পাঠ করা মাত্র পাঠকের চোখের সামনে ছবির মতো সবকিছু ভেসে উঠে। এটিই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আর কোন বৈশিষ্ট্যই এর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না। সর্বদা এ বৈশিষ্ট্যই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

আবেগ অনুভূতির চিত্র

এখন আমরা কাহিনীর দৃশ্যায়নের আরেকটি দিকে দৃষ্টি দেবো। তা হচ্ছে—আবেগ ও মনের ঝোঁক প্রবণতার ছবির বহিঃপ্রকাশ।

আগে আমরা দু' বাগান মালিক এবং তার সাথীর কথোপকথনের ঘটনা বর্ণনা করেছি। তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ) ও একজন সৎলোকের ঘটনাও আমরা বর্ণনা করেছি। এ দুটো ঘটনায় আবেগ ও অনুভূতির ছবিতো আছেই সেই সাথে ব্যক্তিত্বের ছবিও উপস্থাপন করে সেই সকল দৃশ্যাবলীকে মূর্তমান করে চোখের সামনে তুলে ধরে। এখন আমি এ রকম আরেকটি ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। হযরত মারইয়াম (আ) যখন হযরত ঈসা (আ)-কে প্রসব করেন তখনকার ঘটনা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ م اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا -
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا -

এ কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করো, যখন সে তার পরিবারের সদস্যদের থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল। তখন তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করলো।

(সূরা মারইয়াম ঃ ১৬-১৭)

হযরত মারইয়াম একাকী নির্জনবাসে সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ একদিন তিনি মগ্নচিত্তে গোসলখানার দিকে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় সেখানে এক যুবককে দেখলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন, কল্পনার জগৎ নিমিষে বদলে গেল।

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا - قَالَتْ اِنِّىْٓ
اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا -

অতপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম। সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো। মারইয়াম বললো ঃ আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও।

(সূরা মারইয়াম ঃ ১৭-১৮)

এ কথাগুলো হচ্ছে ঐ রকম, যেমন কোন কুমারী নিরালায় একাকী বসে আছে, অকাস্মাৎ সেখানে এক ব্যক্তি এসে ধমকে উঠলো, তখন সে কোন উপায়ান্তর না দেখে তার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত করার চেষ্টা করলো।

যদিও আমরা বুঝতে পারি, সে আগন্তুক যুবক নয় স্বয়ং ফেরেশতা জিবরাঈল আমীন। কিন্তু মারইয়াম (আ) মনে করেছিলেন, সে একজন অপরিচিত যুবক। চিন্তা করে দেখুন, এক অপরিচিতি যুবক এমন এক পবিত্রা কুমারী মেয়ের কাছে কেন আসবে, যে অত্যন্ত উঁচু পরিবারের মেয়ে। যার সমস্ত আচার-আচরণ দ্বীনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। যার অভিভাবক স্বয়ং হযরত জাকারিয়া (আ)। যার মা তাকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এটি প্রথম অংশ।

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا -

সে বললো ঃ আমি তোমার প্রতিপালকের দূত। তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (সূরা মারইয়াম ঃ ১৯)

লজ্জাবনত কোন কুমারীকে তার একাকীত্বের সুযোগে কেউ এসে ভড়কে দিলে তার মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি কেমন হয়, তা চিন্তাশক্তি সহজেই অনুমান করতে পারে। যদিও সে নিজেকে আল্লাহ্‌র দূত (অর্থাৎ ফেরেশতা) হওয়ার কথা বলে। তবু তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। শুধু একটি কথাই বারবার তার চিন্তার জগতে ঘুরপাক খেতে থাকে যে, তার সরলতার সুযোগ নিয়ে হয়তো সে তার কুমারীত্বকে নষ্ট করতে চায়। নইলে সে তাকে একটি সন্তানের সংবাদ দিচ্ছে এমন এক পদ্ধতিতে আজ পর্যন্ত যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। এটি দ্বিতীয় অংশ।

এবার মারইয়াম (আ) এমন এক সাহসী মেয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, যে বিপদে না ঘাবড়ে সাহসিকতার সাথে তার মুকাবিলা করে।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا -

তিনি বলে উঠলেন ঃ কিভাবে আমার পুত্র হবে অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি ? আর আমি কখনো ব্যভিচারিণীও ছিলাম না ?

(সূরা মারইয়াম ঃ ২০)

মারইয়াম (আ) বড় ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কথা কয়টি বললেন। এখনো মারইয়াম (আ) এবং উল্লেখিত যুবক একাকী দাঁড়িয়ে। অবশ্য ইতোমধ্যে মারইয়াম (আ) আগন্তুকের আগমনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, কিভাবে তা সম্ভবপর হতে পারে ? তার সান্ত্বনার কথা একটিই, তা হচ্ছে ভদ্রলোকের বক্তব্য— আমি তোমার প্রতিপালকের দূত। তবু মনে হয় এতে কোন ধোঁকাবাজের ধোঁকাও হতে পারে।

যে প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে আলাপ করেছি। এটি কোন লজ্জা-শরমের কাজ নয়। কথা আরো সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। তাই জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ

قَالَ كَذٰلِكِ ج قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ج وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ج وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا -

সে বললো ঃ এমনি করেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন ঃ এটি আমার জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে একে রহমত স্বরূপ করতে চাই। এটি একটি স্থিরকৃত ব্যাপার। (সূরা মারইয়াম ঃ ২১)

তার কি হলো ? এখানে দীর্ঘ এক শৈল্পিক বিরতি। কিন্তু এ বিরতির মুহূর্তে পাঠকদের চিন্তার জগতে একটি কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়, মারইয়াম (আ)-এর কি হলো ? আবার কাহিনীর পট পরিবর্তন। এবারও আমরা মারইয়াম (আ)-কে আরেক ব্যাপারে উদ্বিগ্ন দেখতে পাই। যা আগের চেয়েও বেশি।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا - فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ج قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا -

অতপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন। তারপর তিনি দূরবর্তী এক জায়গায় চলে গেলেন। প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর গাছের পাদদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো। তিনি বললেন ঃ হায়! আমি যদি এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতাম। (সূরা মারইয়াম ঃ ২৩)

এটি তৃতীয় অংশ।

প্রথমাবস্থায় হযরত মারইয়াম (আ)-এর সামনে শুধু নিজ স্বত্ত্বা ছিল। পাক-পবিত্র পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক অবস্থার মুখোমুখি হলেন। বর্তমান আচারণও ভিন্নতর। তিনি এখন জাতির কাছে লাঞ্ছিত-অপমানিত, শুধু মানসিক দিকেই নয় শারীরিক দিকেও তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। কেননা প্রসব বেদনার দরুন তিনি একটি খেজুর গাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে তিনি একা। দ্বিতীয় কোন লোক তার কাছে নেই। তাছাড়া প্রথম সন্তান সম্ভবা নারীর যে সমস্ত অসুবিধা হয়ে থাকে হযরত মারইয়াম (আ)-এরও সেসব অসুবিধা হচ্ছে, এমন অবস্থায় কি

করতে হবে সেই ধারণাটুকু নেই। সামান্য একটু সহযোগিতা করবে এমন একজন লোকও নেই। তাই তিনি আক্ষেপ করে বললেন ঃ "হায় এ অবস্থার পূর্বে আমি কেন মরে গেলাম না এবং মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেলাম না।" একথা থেকে তার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা এবং তাঁর দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি কতো বড় বিপদে নিমজ্জিত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا - وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا - فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا -

অতপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়াজ দিলো, তুমি দুঃখ করো না। তোমার রব্ব তোমার পায়ের তলায় একটি নহর প্রবাহিত করেছেন। আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড নাড়া দাও, তোমার ওপর পাকা খেজুর পতিত হবে। তা থেকে খাও, পান করো এবং চোখ জুড়িয়ে নাও। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না। (সূরা মারইয়াম ঃ ২৪-২৬)

এটি চতুর্থ অংশ।

এ ঘটনা এমন আশ্চর্য ও পেরেশানীর যে, ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা [মারইয়াম (আ) নয়] দৌড়ে পালাতে প্রস্তুত। হঠাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া, নিচ থেকে ফেরেশতার আওয়াজ, এমন সন্তান যা মারইয়াম (আ)-এর জন্য যন্ত্রণা ও তিরস্কারের উৎস। তৎক্ষণাৎ খাদ্য ও পানীয়ের সুবন্দোবস্ত, নিঃসন্দেহে এটি এক আজব ঘটনা।

আমাদের ধারণা, হযরত মারইয়াম (আ)-ও আশ্চার্যান্বিত হয়েছেন। দুর্বল শরীরে খেজুরের ডাল নাড়ানো, সেখান থেকে তরতাজা পাকা খেজুর সংগ্রহ করে খাওয়া। তারপর একটু শক্তি সঞ্চয় করে বাড়ির দিকে যাত্রা। কিন্তু চিন্তার আরেকটি সেতু এখানে অতিক্রম করতে বাকী।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ -

অতপর সে তার সন্তানকে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলো। (সূরা মারইয়াম ঃ ২৭)

এবার মারইয়াম (আ) মানসিক তৃপ্তি লাভ করার পর তার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত।

قَالُوا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا - يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوكِ امْرَاَسَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا -

তারা বললো ঃ হে মারইয়াম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারূনের বোন! তোমার পিতা অসৎ এবং মাতা ব্যভিচারিণী ছিলেন না। (সূরা মারইয়াম ঃ ২৭-২৮)

গোত্রের লোকজন তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। উপহাস করে তাকে 'হারূনের বোন' হিসেবে সম্বোধন করছে এবং বলছে— তুমি এমন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে, যে বংশে ইতোপূর্বে এ রকম কোন ঘটনা ঘটেনি। তাছাড়া তোমার পিতা-মাতাও এমন ছিলেন না। তুমি কি করে বংশের মুখে কালিমা লেপন করলে ?

মারইয়াম (আ) ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিরুত্তর থেকে, সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন ঃ আমাকে জিজ্ঞেস না করে একে জিজ্ঞেস করো জবাব পাবে। মনে হয় মারইয়াম (আ)-এর এ বিশ্বাস ছিল, তার সন্তানের দ্বারা কোন মুজিযা সংঘটিত হবে। এ জন্যই তিনি সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। লোকজন শুনে আশ্চর্য হয়ে আরো বেশি তিরস্কার করতে লাগলো। কেননা লোকজন তো হতবাক। কুমারী মেয়ে সন্তান ধারণ করেছে এবং সে এ সন্তানের প্রতি খুশী। তারপর গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে লোকদেরকে তাচ্ছিল্যভাবে সন্তানকে দেখিয়ে দেয়া ইত্যাদি লোকদেরকে আশ্চর্যের শেষ প্রান্তে উপনীত করলো।

قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا -

তারা বললো ঃ কোলের শিশু তার সাথে আমরা কিভাবে কথা বললো ?

তখন অলৌকিকভাবে হযরত ঈসা (আ) বলে উঠলেন ঃ

قَالَ اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ ط اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا - وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَاَوْصٰنِى بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا - وَّبَرًّا ۢبِوَالِدَتِىْ ز وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا - وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا -

শিশু বলে উঠলো ঃ আমি আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতোদিন জীবিত থাকি ততোদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে এবং মায়ের আনুগত্য করতে। আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবো। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩০-৩৩)

আমরা কিছুক্ষণ আগে এ ঘটনা যদি না শুনতাম, তাহলে এ ঘটনা শুনে ঘাবড়ে ভেগে যেতাম। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমুতে পারতাম না। আমাদের মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে যেতো। কিন্তু আমরা ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাই দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে যেমন চোখের পানি টপ টপ করে ঝরে পড়ে, আবার আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিতেও ইচ্ছে করে। এমন সময় পর্দা পড়ে গেল। অবস্থা এমন হয়ে গেল ঘটনার মর্মান্তিকতায় চোখ থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে আবার আনন্দে হাততালি দেয়া হচ্ছে। হৃদয়ের তন্ময়তায় নাড়া দিয়ে এক আওয়াজ শোনা গেল। ঘোষক ঘোষনা করছে ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ - مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لا سُبْحٰنَهٗ ط اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ - وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্য কথা, যে সম্পর্কে লোকেরা সতর্ক করে। আল্লাহ্ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন বলেন ঃ 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়। (সে শিশু আরো বললো ঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত করো, এটিই সরল-সোজা পথ। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩৪-৩৬)

এখানে পৌঁছে দ্বীনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেই সাথে ঘটনার দৃশ্য ও ছবি দুটোই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে যে কথাটি বলা যায়, তা হচ্ছে এটি আবেগ-অনুভূতির সর্বোত্তম একটি চিত্র। সমস্ত ঘটনায় এ রঙ ছেয়ে আছে। যার কারণে অন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ম্লান হয়ে গেছে।

কাহিনীতে ব্যক্তিত্বের ছাপ

এবার আমরা আল-কুরআনের দৃশ্যায়নের তৃতীয় প্রকার নিয়ে আলোচনা করছি। এটি চিত্রায়ণের অন্যান্য প্রকারের মধ্যে একটি, তবু এটিকে পৃথক করে বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। এটি ব্যক্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ইতোপূর্বে বর্ণিত দুই বাগান মালিক ও তার সাথী এবং হযরত মূসা (আ) ও একজন সৎলোকের কাহিনী দুটোতেও ব্যক্তিত্বের ছাপ পুরোপুরি পরিলক্ষিত হয়। ঘটনা ব্যক্তির সাথে জড়িত। তাই ঘটনা বর্ণনায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অত্যন্ত উঁচুমানের শিল্প। পুরো কাহিনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। চাই সে ঘটনা— কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা শিল্পকলার সাথে।

যদিও কুরআনে শুধুমাত্র দ্বীনের দাওয়াতের প্রয়োজনেই বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই যে কোন ঘটনা বা কাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দাওয়াতে দ্বীন। তবু ব্যক্তিত্ব চিত্রণকে তা থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। এ বৈশিষ্ট্যটি কুরআনের সমস্ত কাহিনীতেই বিদ্যমান। ব্যক্তিকে মানবিক উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআনে এমন কিছু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যারা ব্যক্তিত্বের সীমা ছাড়িয়ে 'উপমার মানুষ' হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। আমরা এ প্রসঙ্গে নিচে কয়েকটি ঘটনার পর্যালোচনা করবো।

১. চঞ্চল প্রকৃতির নেতা

উদাহরণ স্বরূপ আমরা হযরত মূসা (আ)-এর কথা বলতে পারি। তিনি ছিলেন একজন চঞ্চল প্রকৃতির নেতা।

হযরত মূসা (আ) ফিরাউনের প্রাসাদে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুঠাম ও সবল দেহের অধিকারী।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ
شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ –

একদিন সে শহরে প্রবেশ করলো, তখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। সেখানে দুই ব্যক্তিকে লড়াই করতে দেখল। এদের একজন ছিল তার নিজ দলের এবং অন্যজন তার শত্রুদলের। অতপর যে তার নিজ দলের সে তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল, তাতেই লোকটি অক্কা পেল। (সূরা আল-কাসাস ঃ ১৫)

এ ঘটনায় দুটো কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক ঃ হযরত মূসা (আ)-এর জাতিপ্রীতি। দুই ঃ চঞ্চল প্রকৃতির স্বভাব। কারণ তার জাতির একজন লোক তাঁর সাহায্য চাইল আর অমনি তিনি তাঁর পক্ষ নিয়ে ঘুষি মেরে তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। অতপর তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন ঃ

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ - قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ -

মূসা বললো ঃ এটি শয়তানের কাজ। নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। সে আরো বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমিতো নিজের ওপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। সে বললো ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। (সূরা কাসাস ঃ ১৫-১৮)

তারপর বলা হয়েছে ঃ

فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ -

অতপর সে প্রভাতে সেই শহরে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলো।

(সূরা কাসাস ঃ ১৮)

এ আয়াতে অতি পরিচিত এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যখন মানুষ ঘাবড়ে যায় তখন সে এদিক-ওদিক তাকায় এবং পথ চলে। কারণ সে আর পুনরায় এ অবস্থার মুখোমুখি হতে চায় না। চঞ্চল প্রকৃতির মানুষের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।

হযরত মূসা (আ) ওয়াদা করেছিলেন আর কাউকে তিনি বিপদে সাহায্য করবেন না। আসুন আমরা দেখি, তিনি কতোটুকু স্থির ছিলেন তাঁর এ সিদ্ধান্তে। হঠাৎ তিনি দেখলেন ঃ

فَاِذَا الَّذِیْ اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰۤی اِنَّكَ لَغَوِیٌّ مُّبِیْنٌ -

হঠাৎ সে দেখলো, গতকাল যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে চিৎকার করে তার সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললো ঃ তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (সূরা আল-কাসাস ঃ ১৮)

কিন্তু তিনি ভুলে গেলেন তার প্রতিশ্রুতি। তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাইলেন। কারণ তিনি ছিলেন চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। এজন্য তিনি ভুলে গেলেন যে, এ ধরনের কাজ থেকে তিনি লজ্জিত হয়ে দরবারে ইলাহীতে মাফ চেয়েছেন। যখন তাঁকে অতীতের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন।

فَلَمَّاۤ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِیْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰۤی اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِیْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِی الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ -

অতপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইল, তখন সে বললোঃ গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে তেমন আমাকেও কি তুমি হত্যা করতে চাও ? তুমিতো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চলছো, তুমি সংশোধনকারী হতে চাও না। (সূরা.কাসাস ঃ ১৯)

এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে শহর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য পরামর্শ দিলো। আমরা জানি তিনি এ পরামর্শ অনুযায়ী দেশান্তর হলেন। আপাতত তাকে ছেড়ে দিন। আসুন, দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা তাঁর সাথে মিলিত হই। এ দীর্ঘ সময়ে কি তাঁর স্বভাবে কোন স্থিতিশীলতা এসেছিল ? তিনি কি শান্ত ও স্থিরচিত্তের অধিকার হতে পেরেছিলেন ?

নিশ্চয়ই নয়। তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিতে মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। যখন তুর পাহাড়ের ডান প্রান্ত থেকে আওয়াজ হলো ঃ তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। তিনি তা নিক্ষেপ করলেন কিন্তু যখন লাঠি চলমান সাপে রূপান্তর হয়ে গেল, তা দেখে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলেন। একবারও তিনি পেছন ফিরে দেখলেন না। পরিণত বয়সেও তিনি পূর্বের অভ্যাস তাগ করতে পারলেন না।— অবশ্য ঐ অবস্থায় সবাই দৌড়াবে— কিন্তু তিনি সবার আগে দৌড়ালেন। এক মুহূর্তের জন্য থেমে তিনি দেখার চেষ্টার করলেন না, সেখানে কি ঘটছে।

যাদুকরদের ওপর বিজয়ী হলেন, বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের নির্যাতনের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। তাদেরকে সমুদ্র পার করে দিলেন, তারপর নির্দিষ্ট সময়ে তুর পাহাড়ে পৌঁছলেন নবুওয়াতের কল্যাণ লাভের জন্য। কিন্তু তবু তিনি তুর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট এক আযব বায়না ধরলেন ঃ

قَالَ رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰنِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰنِىْ –

মূসা বললো ঃ প্রভু আমার! আমাকে দেখা দাও। আমি তোমাকে দেখবো। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। তুমি পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাক, যদি তা স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৪৩)

তারপর যা ঘটলো তা শুধু মূসা (আ) কেন, পৃথিবীর কোন মানুষই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ –

অতপর যখন তার রব্ব পাহাড়ের ওপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন সাথে সাথে তা বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। যখন জ্ঞান ফিরে পেল তখন বললো ঃ হে পরওয়ারদিগার! তোমার সত্তা পবিত্র, আমি তোমার কাছে তওবা করছি এবং আমিই সবার আগে বিশ্বাস করলাম। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৪৩)

মূসা (আ) তাই করলেন, যা একজন চঞ্চল প্রকৃতির লোক করে থাকে।

এখানেই শেষ নয়। যখন তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন, তাঁর কওম একটি বাছুরের পূজা করছে, হাতে তওরাতের তখতী ছিল, যা প্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন, তিনি কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তা সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করে ভাইয়ের দাড়ি ধরে তাকে টানা-হেঁচড়া করতে লাগলেন। তাঁর কথা পর্যন্ত তিনি শুনতে রাজী হলেন না। তাই বলতে লাগলেন ঃ

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَاْسِىْ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ –

হে আমার জননী তনয়! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টানাটানি করো না, আমি ভয় করেছিলাম, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছো এবং আমার কথা স্মরণ রাখনি। (সূরা ত্ব-হা ঃ ৯৪)

যখন তিনি জানতে পারলেন, বাছুর পূজার ব্যবস্থা করেছে সামেরী নামক এক ব্যক্তি, তখন তাঁর সমস্ত আক্রোশ তার দিকে পতিত হলো। তিনি সামেরীকে লক্ষ্য করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ ص وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ج وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ط لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا -

মূসা বললো ঃ দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তি রইলো, তুই বলবি আমাকে স্পর্শ করো না। তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহ্র প্রতি লক্ষ্য কর যাকে তুই আগলে থাকতি। আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেবো এবং বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবো। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৯৭)

হযরত মূসা (আ) এসব কিছুই করেছিলেন রাগের বশবর্তী হয়ে। আসুন আমরা তাঁকে আরও ক'বছরের অবকাশ দেই।

মূসা (আ)-এর জাতি তীহ প্রান্তরে অবস্থান করছে। আমাদের ধারণা যখন তিনি তাঁর জাতি থেকে পৃথক হন তখন তিনি পৌঢ়ত্বে পা দিয়েছিলেন। এক সৎ ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাঁর সাহচর্যে থেকে উপকৃত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। আমরা জানি সেখানেও তিনি ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারেননি। যা হোক অবশেষে সৎব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ তাঁকে পৃথক করে দেন।

এ ছিল হযরত মূসা (আ)-এর ব্যক্তিত্ব। যা কাহিনীর পরতে পরতে উপমার মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. কোমল হৃদয়— সহনশীল ব্যক্তিত্ব

হযরত মূসা (আ)-এর চরিত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর। হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন কোমল হৃদয় ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ -

নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয় সহনশীল ব্যক্তি।
(সূরা তওবা ঃ ১১৪)

তিনি শৈশবেই আল্লাহ্‌র সন্ধান লাভের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এভাবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ج قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ج فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ - فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ - فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ ج فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ط قَالَ اَتُحَآجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ط وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْئًا ط وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ -

যখন রাতের আঁধার তাকে আচ্ছন্ন করে নিল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বললো ঃ এ আমার প্রতিপালক। অতপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন বললো ঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। তারপর যখন ঝলমলে চাঁদ দেখল, তখন বললো ঃ এটিই আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বললো ঃ যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি অবশ্যই বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। তারপর যখন আরও উজ্জ্বল সূর্যকে দেখল, বললো ঃ এ-ই আমার প্রতিপালক, এ সবচেয়ে বড়। যখন তা-ও অস্তমিত হয়ে গেল, তখন বললোঃ হে আমার জাতি, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক করো আমি সেসব থেকে মুক্ত। আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্ত্বার দিকে ফিরালাম যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই। তাঁর সাথে তাঁর জাতির লোকেরা বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে বললো ঃ তোমরা আমার সাথে আল্লাহ্‌র

একত্ববাদ নিয়ে বিতর্ক করছো ? অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক করো আমি তাদেরকে ভয় করি না তবে যদি আমার পালনকর্তা কোন কষ্ট দিতে চান তা ভিন্ন কথা। আমার পালনকর্তা প্রত্যেক বস্তুকেই স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না ? (সূরা আল-আনআ.ন ঃ ৭৬-৮১)

যখন হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন, তখন অত্যন্ত নরম সুরে ও মহব্বতের সাথে তিনি সর্বপ্রথম পিতাকে তওহীদের দিকে আহ্বান জানালেন ঃ

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا - يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا - يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ - اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا -

যখন সে তাঁর পিতাকে বললো ঃ হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না তার ইবাদত করো কেন ? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। পিতা! শয়তানের অনুসরণ করো না, শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৪২-৪৫)

• কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর পিতা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এবং ধমকের সুরে বললোঃ

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا -

বললো ঃ হে ইবরাহীম! তুমি আমার ইলাহ্‌দের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমাকে হত্যা করবো। তুমি চিরতরে আমার কাছ হতে দূর হয়ে যাও।

কিন্তু পিতার এ শক্ত আচরণেও তাঁকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সীমা পরিহার করতে দেখা যায়নি এবং তাঁকে উদ্ধ্যত প্রকাশ করতেও দেখা যায়নি। বরং ভদ্র ও নম্রভাবে উত্তর দিলেন ঃ

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ج سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّيْ ط اِنَّه كَانَ بِيْ حَفِيًّا - وَاَعْتَزِ لُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ عَسٰى اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا -

ইবরাহীম বললো ঃ তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার রব্বের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদত করো তাদেরকে, আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করবো। আশা করি আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করে বঞ্চিত হবো না।
(সূরা মারইয়াম ঃ ৪৭-৪৮)

তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দিলেন। সম্ভবত এটিই একমাত্র কাজ যা তিনি কঠোর মনোভাব নিয়ে সম্পাদন করেছিলেন। আল্লাহ্র অপার মহিমার বদৌলতেই তিনি মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করতে পেরেছিলেন। আর এ ধারণা করেছিলেন, যখন তাঁর জাতি মূর্তিগুলো বিধ্বস্ত-বিক্ষিপ্ত দেখবে তখন তারা একথা মনে করতে বাধ্য হবে, মূর্তি তো কখনো নিজেদের দুঃখ-কষ্টের কারণে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। অতএব অবশ্যই কেউ তাদেরকে ধ্বংস করেছে। তিনি মনে করেছিলেন এভাবে তাঁর জাতি ঈমান আনবে। অবশ্য তারা মনে মনে বললো ঃ

فَرَجَعُوْٓا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

অতপর তারা মনে মনে চিন্তা করলো এবং বললো ঃ লোক সকল! তোমরাই জালিম। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৪)

যখন তাঁর জাতি তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিল তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ -

আমি বললাম ঃ হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের ওপর ঠাণ্ডা নিরাপদ হয়ে যাও।
(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৯)

অতপর হযরত ইবরাহীম (আ) ঈমানদারদেরকে নিয়ে হিজরত করলেন। ঈমানদারদের মধ্যে তাঁর ভাতিজা হযরত লূত (আ)-ও ছিলেন। তারপর বার্ধক্যে আল্লাহ্ হযরত ইসমাঈল নামক এক পুত্র সন্তান দান করেন। কিন্তু ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়, তিনি স্ত্রী ও ছেলেকে অন্যত্র রেখে আসতে বাধ্য হন। আল-কুরআন তার কারণ সম্পর্কে নিরব। শুধুমাত্র আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে তাদেরকে এক নির্জন ভূমিতে রেখে আসেন। তখন অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় ও কাতরকণ্ঠে আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّیْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِیْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমার পালনকর্তা! যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূল দিয়ে রিযিক প্রদান করুন। সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭)

হযরত ইসমাঈল (আ) তখনও যৌবনে পদার্পণ করেননি,সবেমাত্র কিশোর। এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখেন, তিনি ইসমাঈল (আ)-কে যবেহ করছেন। স্বপ্ন ভঙ্গের পর তিনি ঈমানের পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ্ তাঁর ওপর দয়াপরবশ ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে 'যবহে আযীম' বা বড় কুরবানী প্রদান করেন।

বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে যতো ঘটনা বা উপাখ্যান পাওয়া যায়, তা থেকে একটি কথাই প্রতীয়মান হয়, তিনি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের এবং সহনশীল প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন সার্টিফিকেট দিচ্ছে ঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ -

নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিল— বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় ও আল্লাহ্পন্থী (সূরা হূদ ঃ ৭৫)

৩. হযরত ইউসুফ (আ)

হযরত ইউসুফ (আ) একজন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের প্রতিভূ ছিলেন।

দেখুন আজীজের স্ত্রী তাকে কুকর্ম করার জন্য ফুসলাচ্ছিল এবং তার কথা না শোনার জন্য তাকে ভয়ও দেখাচ্ছিল। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আজীজের বাড়ীতে থাকতেন তাই তিনি সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাই এমন কোন কথা যেন না হয় যাতে তার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে পারে সর্বদা তিনি সেই প্রচেষ্টা করতেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا ۚ لَوْ لَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ -

নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সে-ও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করতো, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন দেখত এভাবে, আমি তার থেকে মন্দ নির্লজ্জ বিষয়সমূহ সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৪)

একটু আগে বেড়ে দেখুন মহিলার আসল চেহারা।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ -

তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন থেকে ছিঁড়ে ফেললো। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৫)

হঠাৎ ঐ আওয়াজ পেল, যে আওয়াজে স্ত্রী ভয় পেত।

وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ -

এবং তারা উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল।

এখানে মহিলা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি ইউসুফ (আ)-এর ওপর অপবাদ দিলেন ঃ

قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءً -

মহিলা বললো ঃ যে তোমার পরিজনের সাথে কুকর্ম করার ইচ্ছে পোষণ করে

যেহেতু মহিলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর জন্য প্রেম উন্মাদিনী ছিলেন তাই তিনি চাইতেন না, এজন্য ইউসুফ (আ)-এর কঠিন কোন শাস্তি হয়ে যাক। এজন্য নিজেই একটু হাল্কা শাস্তির আভাস দিয়ে বললেন ঃ

اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

তাকে কারাগারে পাঠান কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া (আর কি শাস্তি দেয়া যায়)। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৫)

ভদ্রভাবে সত্য কথাটি বলে দিলেন।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ –

সে বললো ঃ সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে।
(সূরা ইউসুফ ঃ ২৬)

প্রমাণ করলেন। মজার ব্যাপার হলো স্বয়ং ঐ মহিলার নিকটতম এক লোক সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালেন।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ – وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ –

মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো ঃ যদি তার জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হয় তবে মহিলা সত্যবাদী এবং সে মিথ্যাবাদী। আর যদি জামা পেছন দিকে ছেঁড়া হয় তবে মহিলা মিথ্যেবাদী এবং সে সত্যবাদী।
(সূরা ইউসুফ ঃ ২৬-২৭)

এতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সত্যবাদিতা প্রমাণিত হলো।

গোটা শহরের সমস্ত মহিলার মধ্যে এ ঘটনা ছড়িয়ে গেল। আজীজের স্ত্রীর লজ্জায় মাথা কেটে যেতে লাগলো। তিনি একদিন শহরের সমস্ত মহিলাকে দাওয়াত দিলেন। মহিলাগণ যখন খানা খাওয়ার জন্য ছুরি হাতে নিলেন। (উল্লেখ্য যে, তখন মিসরে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে মেহমান খাবে, এ রেওয়াজ ছিল) তখন ইউসুফ (আ)-কে তাদের সামনে হাজির করা হলো। মহিলাগণ তন্ময় হয়ে তাকে দেখতে লাগলেন। এমনকি তার দিকে তাকিয়ে ছুরি দিয়ে খাবার কাটতে গিয়ে প্রত্যেকে নিজের হাত জখম করে ফেললেন।

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ -

যখন তারা তাঁকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেললো। তারা বললো ঃ কখনও এ মানুষ হতে পারে না! এতো মহান কোন ফেরেশতা। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩১)

তারা সবাই ছিলেন মহিলা। তার মধ্যে আজীজের স্ত্রীও একজন। তিনি ভালই জানতেন, মহিলাগণ কেমন জব্দ হয়েছে।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ -

অতপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাঁকে কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করলো। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৫)

এরপর আমরা দেখি, হযরত ইউসুফ (আ) জেলখানায় বাদশাহর দু'জন অনুচরের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলে দেয়, তাদের মধ্যে একজন যার ব্যাপারে তিনি মনে করলেন সে মুক্তি পেয়ে পুনরায় বাদশাহর সাথী হিসেবে নিয়োজিত হবে, তখন তিনি তাকে বললেন ঃ বাদশাহর কাছে গিয়ে আমার কথা বলবে। কিন্তু সে বাইরে বেরিয়ে ভুলে গেল। ফলে হযরত ইউসুফ (আ) আরও ক'বছর জেলের কষ্ট ভোগ করলেন। যখন বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখে তার ব্যাখ্যা জানতে পেরেশান হয়ে গেলেন। কেউ তার সঠিক তা'বীর (তাৎপর্য) বলতে পারলেন না। তখন সেই লোকটির হযরত ইউসুফ (আ)-এর কথা মনে পড়ে গেল। সে বাদশাহর কাছে সব ঘটনা খুলে বললো। পরে বাদশাহ তাঁকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেয়ার জন্য জেল থেকে ডেকে পাঠালেন।

এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রকাশ হচ্ছে। তাঁকে বিনা দোষে জেলের নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। আজ মুক্তির আহ্বান শোনেও তাঁর ভয় হচ্ছে যদি পুনরায় সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁকে জেলে পাঠান হয়। এজন্য তিনি সুযোগের সন্ধান করছিলেন, কথাটি বলিয়ে নেবার জন্য। তাই দূতকে তিনি বলে পাঠালেন।

قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ -

সে বললো ঃ ফিরে যাও তোমার প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস করো। ঃ ঐ মহিলাদের অবস্থা কি যারা হাত কেটে ফেলেছিল ? আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫০)

বাদশাহ ঐ সমস্ত মহিলার কাছে সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। তারা সব বলেন। স্বয়ং আজীজ পত্নীই তাঁর সচ্চরিত্রতার কথা স্বীকার করলেন। স্বভাবতই বুঝা যায়, তখন ঐ মহিলা বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের ধারণা এ ঘটনা যখন সংঘটিত হয়েছিল তখন ঐ মহিলার বয়স ৪০ কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি ছিল। তিনি তখন প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছিলেন, কাজেই তখন তার দ্বারা আর কোন অপকর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সে অকপটে স্বীকার করলো ঃ

قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰـنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ –

আজীজ পত্নী বললো ঃ এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাঁকে ফুসলিয়েছিলাম। সে সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫১)

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, হযরত ইউসুফ (আ) অত্যন্ত বিজ্ঞ ও যুক্তিবাদী ছিলেন। প্রতিটি পদক্ষেপ সর্তকতার সাথে ফেলাই ছিল তার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এজন্য বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ – وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ج اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ –

এটি এজন্য যে, আজীজ যেন জানতে পারেন, গোপনে আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। তাছাড়া আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না। আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন খারাপ কাজের দিকে প্রবল। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫২-৫৩)

হযরত ইউসুফ (আ) যখন দেখলেন, বাদশাহ তার কথায় প্রভাবিত হয়েছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পেরে খুশী হয়েছেন। এমনকি তিনি বলেই ফেললেন।

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ –

নিশ্চয়ই তুমি আজ থেকে আমার কাছে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদা লাভ করছো। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫৪)

এ সুযোগ তিনি হাতছাড়া না করে বাদশাহকে বললেন ঃ

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ لْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ -

আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫)

এভাবে তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। সচ্ছল ও দুর্ভিক্ষ উভয় অবস্থায় তিনি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে তার যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। চৌদ্দ বছর তিনি দায়িত্ব পালন করলেন। এ সময় তিনি শুধু মিসরের খাদ্য মন্ত্রীই নন বরং নিজেকে আশেপাশের রাষ্ট্র ও এলাকার জিম্মাদারও মনে করতেন। কেননা সেগুলোও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিল। তাই তারা সাত বছর পর্যন্ত মিসর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছিল।

তাঁর ভাইয়েরা যখন রেশন নেয়ার জন্য মিসর এলেন তখন তিনি তাদেরকে চিনে ফেলেন কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেননি। তিনি তাদেরকে শর্তারোপ করেন, পরের বার যদি তাদের ভাইকে না নিয়ে আসে তাহলে রেশন দেয়া হবে না। পরের কিস্তিতে যখন ভাই বিন ইয়ামিনকে নিয়ে এলেন তখন তাকে পৃথক করার জন্য তার মালামালের মধ্যে একটি রাজকীয় পেয়ালা ঢুকিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন, রাজ প্রাসাদ থেকে একটি পেয়ালা চুরি হয়ে গেছে। হে কাফেলার লোকজন! তোমরা চুরি করেছ। তারা চুরির কথা অস্বীকার করলেন এবং মাল-সামানা তল্লাশী করার জন্য চ্যালেঞ্জ করলেন। তারা একথাও বললেন, যার কাছে হারান পেয়ালা পাওয়া যাবে তাকে আপনারা গ্রেফতার করে রাখুন। এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ -

অতপর ইউসুফ আপন ভাইয়ের থলের পরিবর্তে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলে থেকে বের করলেন। (সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬)

ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা বিন ইয়ামিনকে রেখেই দেশে চলে গেলেন এবং পুনরায় ফিরে এলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ) নিজের পরিচয় দিলেন। তার আগে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে একটু শিক্ষা দিলেন।

এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ঠাণ্ডা মেজাজে চিন্তা-ভাবনা, যুক্তিবাদিতা ইত্যাদি ছিল তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

৪. হযরত আদম (আ)

আমরা হযরত আদম ও ইবলিসের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা না করে সংক্ষিপ্তাকারে একত্রে বর্ণনা করছি। কারণ আমি অন্যত্র এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার আশা রাখি।

সত্যি কথা বলতে কি, হযরত আদম (আ)-কে কুরআনে এমন একজন মানুষের নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে মানবিক সমস্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। মানবিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য হযরত আদম (আ)-এর জীবনের প্রথম দিকে পাওয়া যায়, যা আজও মানুষের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তা হচ্ছে মানবিক দুর্বলতা। আর এ মানবিক দুর্বলতার সুযোগই ইবলিস গ্রহণ করেছিল। এজন্য আদম এবং হাওয়া উভয়েই ইবলিসের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

قَالَ يَآدَمُ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى -

ইবলিস বললো ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব না অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষ ও অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? (সূরা ত্ব-হা ঃ ১২০)

এজন্য মানুষ চিরদিনই এমন একটি জীবনের প্রত্যাশী যে জীবনের শেষ নেই। যখন শয়তানের পরামর্শ মুতাবেক তা অর্জনের চেষ্টা করা হয় তখন বৈধ-অবৈধ কথাটি তার কাছে গৌণ হয়ে যায়। মানুষ কখনো নিজের উত্তরসূরীর মাধ্যমে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়, আবার কখনো নিজের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার মানসপুত্র সৃষ্টি করে তাদের মাঝে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু বেঁচে থাকার সত্যিকার পথটি দেখিয়েছে ইসলাম। এজন্য মানুষকে মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনের কথা বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম একটি অনন্ত জীবনের জিম্মাদার। রইলো ইবলিসের ব্যক্তিত্ব। তার ব্যক্তিত্ব হচ্ছে শয়তানের ব্যক্তিত্ব। ব্যস! ইবলিসের জন্য একথাই যথেষ্ট।

৫. হযরত সুলাইমান (আ)-এর ঘটনা

এখন আমি এমন একটি ঘটনার কথা বলবো, যে ঘটনায় পুরো মাত্রায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে। সেই বিকাশ আমাদের ধারণারও অতীত। সেই সাথে শৈল্পিক সৌন্দর্য এবং দ্বীনি উদ্দেশ্যও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তা হচ্ছে হযরত সুলাইমান (আ) ও বিলকিসের ঘটনা।

এ ঘটনায় উভয়ের ব্যক্তিত্ব-ই উজ্জ্বল। একজন পুরুষের ব্যক্তিত্ব এবং পাশাপাশি একজন স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব সেই সাথে একজন বাদশাহর এবং একজন সম্রাজ্ঞীর ব্যক্তিত্বও আমরা দেখতে পাই। আসুন এবার দেখা যাক তাদের কার ব্যক্তিত্বকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ز اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ - لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْلَاَ اذْبَحَنَّهٗٓ اَوْلَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ -

সুলাইমান পাখীদের খোঁজ-খবর নিল, অতপর বললো ঃ কি ব্যাপার হুদহুদকে তো দেখছি না ? নাকি সে অনুপস্থিত ? আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেবো কিংবা মৃত্যুদণ্ড, না হয় সে উপযুক্ত কারণ দর্শাবে।

(সূরা আন-নামল ঃ ২০-২১)

এটি প্রথম দৃশ্য। এখানে একজন বিজ্ঞ শাসক, তদুপরি নবী সেই সাথে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও প্রকাশ পাচ্ছে। বাদশাহ তাঁর প্রজাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, একজন প্রজাকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত দেখতে পেয়ে রেগে যাচ্ছেন। কিন্তু তবু তিনি অত্যাচারী বাদশাহ নন। অনেক সময় অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে কোন সঙ্গত কারণে যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে কথা নেই। অন্যথায় এটি অপরাধ। এজন্য তাকে আমি শাস্তি দেবো বা মৃত্যুদণ্ড।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ - اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ - وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَايَهْتَدُوْنَ - اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَلْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ - اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

কিছুক্ষণ পর হুদহুদ এসে বললো ঃ আপনি যা অবগত নন এমন একটি বিষয় আমি অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে

এসেছি। আমি এক নারীকে সাবা জাতির ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটি বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে এবং তার জাতিকে দেখলাম আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের নিকট এ কাজকে আকর্ষণীয় করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, তাই তারা সৎপথ পাচ্ছে না। তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি বিশাল আরশের মালিক। (আন-নামল ঃ ২২-২৬)

হুদহুদ অনুপস্থিত ছিল এখন তার আগমনে দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো। সে জানত বাদশাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং তাঁর শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। তাই সে বক্তব্য এমন ভাষায় শুরু করেছে যে, তাঁর বিশ্বাস এভাবে বক্তব্য শুরু করলে বাদশাহর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং তাকে অনুপস্থিতির দণ্ড গ্রহণ করতে হবে না। বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এই বলে ঃ

اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ –

আমি এমন একটি খবর নিয়ে এসেছি যে সম্পর্কে আপনি অবহিত নন। সে খবরটি হচ্ছে 'সাবা'র সম্পর্কে নিশ্চিত খবর।

যদি কোন এক সাধারণ প্রজা বাদশাহর কাছে বলে, 'আমি এমন একটি খবর জানি যা আপনি অবগত নন।' তাহলে এমন কোন বাদশাহ আছে, যে তার কথা না শুনে পারে ? হুদহুদ দেখল, বাদশাহ তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে তখন সে ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করছে। তারপর সে বিলকিসের জাতির আচরণে আশ্চর্য হয়ে বলছে ঃ

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –

(আমি বুঝতে পারি না) যে আল্লাহ্ আসমান এবং জমিনের সমস্ত গোপনীয় জিনিসের খবর রাখেন তাঁকে কেন তারা সিজদা করছে না ?

(সূরা নমল ঃ ২৫)

এখনো হুদহুদ অপরাধী। বাদশাহ তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। তাই হুদহুদ সুকৌশলে বাদশাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো যে, আরশে আযীমের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। সুলাইমান (আ) বললেন ঃ

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ - اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا
فَاَلْقِهِ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ -

এখন আমি দেখবো তুমি সত্য বলছো না মিথ্যে। তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটি তাদের নিকট নিক্ষেপ করবে। তারপর তুমি দূরে সরে থাকবে এবং দেখবে তারা কি জবাব দেয়। (সূরা নামল ঃ ২৭-২৮)

এ হচ্ছে দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ পর্ব। এ পর্বে বিজ্ঞ ও ন্যায়বিচারক একজন বাদশাহ উপস্থিত। যিনি এতো বড় সংবাদ প্রদানের পরও সেনাবাহিনী থেকে অনুপস্থিত থাকার অপরাধ মার্জনা করেননি। তাই তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছেন। একজন পয়গাম্বর ও একজন ন্যায়বিচারক বাদশাহর উপযুক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। আমরা এ দৃশ্যের সাধারণ দর্শক মাত্র। আমরা এখনো বুঝতে পারিনি তিনি চিঠির মধ্যে কি লিখেছেন। সম্রাজ্ঞীর হাতে চিঠি পৌছার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের জানার কোন উপায় নেই। যখন সম্রাজ্ঞী চিঠি পেলেন তখন তা প্রকাশ করছেন। এখান থেকে তৃতীয় দৃশ্যের অবতারণা।

قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ - اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ
وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ
مُسْلِمِيْنَ -

সম্রাজ্ঞী বললো ঃ হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। সে পত্র সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং তা এই ঃ অসীম দাতা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু। আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। (সূরা নমল ঃ ২৯-৩১)

সম্রাজ্ঞী চিঠিটি নিয়ে পরামর্শ করার জন্য সভাষদবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ

قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْ اَمْرِىْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى
تَشْهَدُوْنِ -

সম্রাজ্ঞী বললো ঃ হে সভাষদবর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি তো আর কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। (সূরা আন-নামল ঃ ৩২)

সবসময় এবং সব জায়গায় সেনাবাহিনীর লোকদের একটি অভ্যাস হচ্ছে তারা সর্বদা নিজেদের শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে থাকে। কেননা তাদের শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ছাড়া তাদের রুটি-রুজির কোন ব্যবস্থা নেই। সেই সাথে তারা এ কথাও বলে যে, সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার বাদশাহর কাছে। যা আদেশ হয় আমরা মানতে প্রস্তুত। তারা তাদের সেই চিরাচরিত অভ্যাস মতো বলে উঠলেন ঃ

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ -

তারা বললো ঃ আমরা শক্তিশালী এবং বীর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি নির্দেশ দেবেন।

(সূরা আন-নামল ঃ ৩৩)

এখানে পৌছে বিলকিসের নারীত্বের প্রকাশ পেল। নারীরা সাধারণত হৈ-হাঙ্গামা ও দাঙ্গা-ফাসাদ এড়িয়ে চলতে চায়, পছন্দ করে না। মেয়েদের স্বভাব হচ্ছে, শক্তি প্রয়োগ না করে কৌশলে কাজ আদায়ের চেষ্টা করা। আবার এটিও তাদের বৈশিষ্ট্য, বিনা ঝগড়া-বিবাদেও তারা পুরুষকে প্রতিপক্ষ ভেবে বসে থাকে।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ - وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ -

সে বললো ঃ রাজা-বাদশাহগণ যে জনপদে প্রবেশ করে, তাকে তছনছ করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করে। তারা এরূপই করবে। আমি তার কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখি প্রেরিত লোকেরা কি জবাব আনে। (সূরা আন-নামল ঃ ৩৪-৩৫)

এখানে দৃশ্যের যবনিকা। দূত সুলাইমান (আ)-এর কাছে প্রবেশের পর পুনরায় পর্দা উঠল।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰنِ ۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ - اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْ

تِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ -

অতপর যখন দূত সুলাইমানের কাছে আগমন করলো, তখন সুলাইমান বললো ঃ তোমরা কি ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। ফিরে যাও তাদের কাছে, আমি এখনই তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে আসবো, যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্ত করে সেখান থেকে বের করে দেবো, তারা লাঞ্ছিত হবে। (সূঃ নমল ঃ ৩৬ - ৩৭)

যে উপহার উপঢৌকন নিয়ে তাঁর কাছে দূত এসেছিল সেগুলোসহ তিনি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আসুন, আমরা তাকে ফেরত যেতে দেই।

সুলাইমান (আ) শুধু একজন নবী কিংবা বাদশাহই নন, একজন বীর পুরুষও বটে। বাদশাহী অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে দাপটের সাথে সম্রাজ্ঞীর উপহার ফেরত দেয়া হলো তাতে সম্রাজ্ঞীর সাথে চূড়ান্ত বুঝাপড়া হয়ে যাবে।

সম্রাজ্ঞীর উপহার পাঠানো থেকে বুঝা যায় তিনি শত্রুতাকে পরিহার করে চলতে সচেষ্ট। এজন্য তিনি উপহার পাঠিয়েছিলেন যাতে সন্ধি হতে পারে। এদিকে বাদশাহর (সুলাইমানের) বিশ্বাস তিনি দাওয়াত কবুল করবেন। এখানে হযরত সুলাইমান (আ)-এর ভেতর সেই পৌরুষ জেগে উঠল, যা স্বীয় শক্তি ও কৌশলে নারীর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়।

হযরত সুলাইমান (আ) চেয়েছিলেন সম্রাজ্ঞীর আগমনের পূর্বেই তার সিংহাসনটি নিয়ে আসবেন এবং তার জন্য কাঁচের একটি প্রাসাদ বানাতে চাইলেন কিন্তু ঘটনায় তার সুস্পষ্ট বর্ণনা আসেনি। আমাদের মতো দর্শকদের জন্য তা রহস্য হয়ে রইলো। যখন সম্রাজ্ঞী হযরত সুলাইমান (আ)-এর কাছে পৌঁছলেন আমরা মহলের দ্বিতীয় দৃশ্য সম্পর্কে জানতে পারি ঃ

قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ - قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ -

সুলাইমান বললো ঃ হে পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে পৌঁছার পূর্বে কে তার সিংহাসনটিকে আমার কাছে এনে দেবে ? জনৈক দৈত্য জ্বিন বললো ঃ আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে সামর্থ, বিশ্বস্ত। (সূরা নমল ঃ ৩৮-৩৯)

কিন্তু দ্বীনি উদ্দেশ্য জ্বিনদের ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। সুলাইমান (আ)-কে চুপ করতে দেখে এক মুমিন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। বললেন ঃ আমি আপনার খেদমতে হাজির। অবশ্য তাঁর ক্ষমতা ঐ জ্বিনের চেয়ে বেশি ছিল।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ -

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বললো ঃ আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা এনে আপনাকে দিচ্ছি। (সূরা আন-নামল ঃ ৪০)

এখানে সামান্য বিরতি। শুধু একবার চোখ বন্ধ করে আবার খোলা যায় এতোটুকু পরিমাণ। তারপর আবার দৃশ্যের শুরু।

فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ -

অতপর সুলাইমান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন ঃ এটি আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না-অকৃতজ্ঞ হয়ে যাই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যই তা করে আর যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জেনে রাখুক, আমার রব্ব অভাবমুক্ত কৃপানিধান। (আন-নামল ঃ ৪০)

হযরত সুলাইমানের (আ) অভ্যন্তরে যে একজন নবী ছিল তা এবার আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে জেগে উঠলো। এ মেহেরবানীর বিচ্ছুরণ ঘটান হলো তারই এক বান্দার মাধ্যমে মাত্র এক পলকে রাণীর সিংহাসন উপস্থিত করে। তাই হযরত সুলাইমান (আ) প্রশান্ত চিত্তে বার বার আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর আদায় করছেন। যাতে তাঁর দ্বীনি উদ্দেশ্য পুরা হয়ে যায়।

একটু পরই আবার সুলাইমান (আ)-এর পৌরুষ জেগে উঠলো।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ -

সে বললো ঃ তার সিংহাসনের আকৃতির পরিবর্তন করে দাও। দেখি সে বুঝতে পারে কিনা, নাকি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই। (সূরা আন-নামল ঃ ৪১)

এবার সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা জানানোর দৃশ্য। দর্শকগণ রুদ্ধশ্বাসে সম্রাজ্ঞীর আগমনের প্রতীক্ষা করছেন।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ط قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ -

যখন সম্রাজ্ঞী এসে পৌছল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সিংহাসন কি এরূপ ? সে বললো ঃ মনে হয় এটি সেইটিই।

এরপর কি হলো ? মনে হয় এখনো সম্রাজ্ঞী ইসলাম গ্রহণ করেননি।

وَصَدَّهَا مَاكَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ -

আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার ইবাদত করতো, [সুলাইমান (আ)] তাকে তা থেকে বিরত থাকতে বললো। (ইতোপূর্বে সে) নিশ্চয়ই সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সূরা আন-নামল ঃ ৪৩)

এখানে এসে সম্রাজ্ঞী এবং দর্শকদের (যার মধ্যে আমিও একজন) দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হলো।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ج فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ط قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ط قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

তাকে বলা হলো ঃ এ প্রাসাদে প্রবেশ করুন। যখন সে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলো, ধারণা করলো এটি স্বচ্ছ জলাশয়। সে তার পায়ের দিকের কাপড় উঁচু করে ধরলো। সুলাইমান বললো ঃ এটিতো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকিস বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমিতো নিজের ওপর জুলুম

করেছি। আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা নামল ঃ ৪৪)

এ ঘটনার আলোকে প্রতীয়মান হয়, বিলকিস একজন পূর্ণ নারী সত্ত্বার নাম। যেহেতু তিনি একজন নারী তাই দাঙ্গা-ফাসাদ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করেছিলেন। একথাও ভেবে দেখার মতো যে, তিনি প্রথমেই আকৃষ্ট হননি, পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু তিনি যা ছিলেন তাই রইলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে তিনি চিন্তা করলেন, যে অবস্থা তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার যে বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন তা হচ্ছে তিনি [হযরত সুলাইমান (আ)] তাঁকে সম্মান দিচ্ছেন, তাঁর সম্মানে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা দিয়েছেন। কাজেই তিনি নিজেকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। তাঁর শান-শওকত ও শৌর্যবীর্যের কাছে তিনি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। যদিও তিনি জেনেছিলেন, সমস্ত আয়োজন তাঁর জন্য করা হয়েছে, তবু তিনি নারীসুলভ সতর্কতা অবলম্বন করলেন, যে নারীসুলভ আচরণ হাওয়া (আ)-কে প্রদান করা হয়েছিল। পর্দা পড়ে যাচ্ছে।

এসব ঘটনায় দ্বীনি ও শৈল্পিক— কোন দিকেই ঘাটতি নেই। কোন একটি দিকও সংযোজন করার মতো নেই। নিরেট একটি গল্প কিংবা উপন্যাস, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কোন সম্পর্ক নেই, ব্যাপারটি এমনও নয়। এটি এমন এক কাহিনী যা দ্বীনি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এর মধ্যে (মানুষের) আবেগ-অনুভূতি ও প্রভাব সম্পর্কিত যেসব আলোচনা এসেছে 'মানুষের স্বরূপ' শিরোনামে তা সুন্দর এক স্টাইলে সাজান হয়েছে, যা নেহায়েত আনন্দদায়ক।

আমি কুরআনী কিস্সা-কাহিনীর ওপর যে আলোচনা করলাম তা এখানেই শেষ করছি। এরপর যদি কেউ আরও অগ্রসর হতে চান তবে এ আলোচনা তাকে পথপ্রদর্শন করবে।

মানুষের স্বরূপ

আল-কুরআনে নানা ধরনের দ্বীনি বিষয়ের বর্ণনার সাথে সাথে মানুষের বিভিন্ন প্রকার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে একটি কিংবা দুটি বাক্যের মাধ্যমে এমনভাবে মানুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, যেন তা জীবন্ত ও সচল হয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়।

সম্ভবত এটি সমস্ত মানুষের প্রকৃত স্বরূপের চিত্রায়ণ। এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপে মানুষের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে— যাদেরকে পৃথিবীতে অধিক সংখ্যক দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষের এ স্বরূপগুলো স্থায়ী। কোন জাতি বা কোন গোত্রই এ সকল বৈশিষ্ট্যের বাইরে নয়। (কোন না কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাকে অবশ্যই হতে হবে)।

এ আয়াতগুলো মূলত একটি বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এর মাধ্যমে মানুষের জীবন্ত ও বাস্তব এমন কিছু চিত্র অংকিত হয়েছে যা বিষয়বস্তুর দিকে অলৌকিক এবং চিরন্তনী। কেননা এ চিত্রগুলো স্থান ও কালের আবর্তনে শতাব্দীর পর শতাব্দী চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং তা সর্বদাই জীবন্ত-প্রাণবন্ত ও মূর্তমান।

এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে কিছু উদাহরণ পেশ করছি, যেভাবে আল-কুরআনে পেশ করা হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের কিছু উদাহরণ ইতোপূর্বে আমরা 'শৈল্পিক চিত্র' শিরোনামে উপস্থাপন করেছি। এর প্রকৃত জায়গা অবশ্য সে অধ্যায়টি-ই ছিল। তবু ঘটনা বা কাহিনীর সাথে এর সামঞ্জস্য আছে বিধায় আমরা একে বক্ষমান অধ্যায়ে আলোচনা করার ইচ্ছে পোষণ করছি।

১. মানব প্রকৃতি

নিম্নোক্ত আয়াতটিতে এমন এক চিত্র অংকিত হয়েছে। যে চিত্রের সাথে সমস্ত মানুষই সম্পৃক্ত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

—১৯

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖٓ اَوْقَاعِدًا اَوْقَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ -

মানুষ যখন কোন বিপদ-মুসিবতে নিমজ্জিত হয় তখন সে দাঁড়িয়ে, শুয়ে-বসে সর্বাবস্থায় আমাকে ডাকতে থাকে। যখন তার বিপদকে দূর করে দেই তখন সে এমন আচরণ করে, মনে হয় সে বিপদে পড়ে আমাকে কখনো ডাকেনি। (সূরা ইউনুস ঃ ১২)

উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তে সত্য, সুন্দর এবং শৈল্পিক সৌন্দর্যের যাবতীয় উপকরণের একত্রে সমাবেশ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রকৃতি ও ধরনই এরূপ। মানুষের ফিতরাত হচ্ছে— যখন সে বিপদগ্রস্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যায় তখন মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নাম এমনভাবে স্মরণ করতে থাকে, মনে হয় এর প্রতিকার তাঁর নিকট ছাড়া আর কারো নিকট নেই। বিপদ-মুসিবত দূর হয়ে গেলেই সে সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে ছিটকে পড়ে আগের মতোই চলতে থাকে। মনে করে, তার উপর আদৌ কোন বিপদ আসেনি। পেছনের দিকে একবার ফিরে দেখার ফুরসৎটুকুও তার থাকে না। তার কষ্টের অবস্থাকে শৈল্পিক নিপুণতায় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে ঃ

دَعَانَا لِجَنْبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا -

তারা তখন শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে (পেরেশান হয়ে) আমাকে ডাকে।
(সূরা ইউনুস ঃ ১২)

অতপর যখন বিপদ দূরীভূত হয়, তখনকার এক শৈল্পিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে।

مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ -

(যখন) বিপদ দূর হয়ে যায়, তখন এমন আচরণ করে, মনে হয় তারা কখনো আমাকে ডাকেনি। (সূরা ইউনুস ঃ ১২)

এ দুটো চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, যখন মানুষ বিপদ-মুসিবতে পতিত হয় তখন তাদের জীবনের গতি থেমে যায়। কখনো কখনো এ বাধা দীর্ঘতর হয়। আবার যখন বিপদ-মুসিবত দূর হয়ে যায় তখন জীবন তরী আবার চলতে শুরু করে। যেন কখনো তা বাঁধার সম্মুখীন হয়নি।

আল-কুরআনে এ ধরনের দৃশ্য বড় আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও তার ধরন এক নয়। তবু সবগুলোর মূল চরিত্র একই। একটি কেন্দ্রে এসে সবগুলো একত্রিত হয়ে যায়। যেমন ঃ

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا -

আমি মানুষকে নিয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়, যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে যায়। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৩)

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ - وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ ۭ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ -

আর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের স্বাদ-আস্বাদন করতে দেই অতপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই, তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। আর যদি তার ওপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পর তাকে সুখ ভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে ঃ আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে। তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অহংকারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। (সূরা হূদ ঃ ৯-১০)

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا - اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا - وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا

মানুষকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে অধৈর্য স্বভাবের করে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (সূরা আল-মা'আরিজ ঃ ১৯-২১)

এ ধরনের আয়াত আল-কুরআনে অনেক। উদ্দেশ্য মানুষের চিরন্তনী স্বভাবগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। কিন্তু মানুষের জীবনের এ তৎপরতা এক জায়গায় এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তা হচ্ছে মানুষের শক্তি ও প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রবণতা। যখন সে পুরোপুরি এ অবস্থায় জড়িয়ে যায় তখন সে মূল্যবান হায়াতটাকে এ কাজে নিয়োজিত করে। আর যদি কোন বিপদ-মুসিবত এসে সে আশার অন্তরায় হয়ে যায় তবে পিছুটান দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না।

২. ঠুনকো বিশ্বাসী

মানুষের মধ্যে এক ধরনের মানুষ আছে, যাদের বিশ্বাস খুবই ঠুনকো। যারা

তাদের বিশ্বাসের ওপর দৃঢ় থাকতে পারে না। এরা ততোক্ষণ ঈমানের পথে থাকে যতোক্ষণ নিরাপদ ও নির্ঝামেলায় তা থেকে ফায়দা লাভ করা যায়। আর যদি কোনরূপ পরীক্ষা বা কাঠিন্য আরোপ করা হয়, সাথে সাথে তারা ঈমান ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُنِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ –

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। বস্তুত এতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ১১)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ –

কতক লোক বলে ঃ আমরা আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয় তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের মতো মনে করে। যখন তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে ঃ আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্বাসীর অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ কি তা অবহিত নন? (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ১০)

৩. সুবিধাবাদী ধূর্ত প্রকৃতির লোক

কিছু লোক আছে, যারা সুবিধাবাদী ধূর্ত প্রকৃতির। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন কাজ নিজেরা করবে এবং তা থেকে ফায়দা নেবে যখনই সেই কাজ অন্য কেউ করে তখন তা অস্বীকার করে বসে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا

كَفَرُوْابِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ -

যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কিতাব এসে পৌঁছল, যা সেই বিষয়ের সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে এবং সর্বদা কাফিরদের ওপর তারা বিজয় কামনা করতো। যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল তখন তারা জেনেশুনে অস্বীকার করে বসলো। তাই অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র লানত। (সূরা আল-বাকারা : ৮৯)

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ -

ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। (সূরা আন্-নূর : ৪৮-৪৯)

৪. ভীরু কাপুরুষ

কিছু লোক এমনও আছে যারা সত্যকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকে, সত্যের সাথে পরিচিত হতে চায় না। ফলে একদিকে তাদের জিদ ও হঠকারিতা সত্য থেকে বিরত রাখে, অপরদিকে তাদেরকে কাপুরুষতায় পেয়ে বসে। যার কারণে তারা কখনো সত্যের মুখোমুখী হওয়ার সাহস পর্যন্ত পায় না।

يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ -

তারা সত্য ও ন্যায় প্রতিভাত হওয়ার পরও তোমার সাথে ঝগড়া করছিল, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তারা তা দেখছিল। (সূরা আল-আনফাল : ৬)

৫. হাসি-কৌতুক উদ্রেককারী লোক

কিছু লোক আজব প্রকৃতির। তারা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সত্য থেকে পলানোর চেষ্টা করে।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ - كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ - فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ -

তাদের কি হলো যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? যেন তারা ইস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ, হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। (মুদ্দাসসির ঃ ৪৯-৫১)

৬. শুধু আকৃতিতেই মানুষ

এ যেন চলমান জড় পদার্থ, যা দেখে লোকদের হাসি পায়।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ط وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط
كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ -

তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তুমি তাদের কথা শোন। কিন্তু তারা তো প্রাচীরে ঠেকানো কাঠের মতো। (সূরা আল-মুনাফিকুন ঃ ৪)

এটি মুনাফিকদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি চিত্র। যা বেদনা মিশ্রিত কৌতুক।

৭. প্রশংসাকাংখী

নিজেরা কিছুই করে না, কিন্তু না করা বিষয়ের জন্য লোকজন তাদের প্রশংসা করুক তা তারা চায়।

وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا -

এবং না করা বিষয়ের জন্য তারা লোকদের প্রশংসা কামনা করে।
(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৮)

প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক জায়গায়ই এ ধরনের লোকের উপস্থিতি দেখা যায়।

৮. সুবিধাবাদী

এমন কিছু লোক আছে, যারা সুবিধা দেখে একদলে ভিড়ে যায় আবার সেখানে অসুবিধা হলে অন্য দলে যোগ দেয়।

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ
نَكُنْ مَّعَكُمْ ز وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ لا قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ
عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

এরা এমন ধরনের লোক, যারা সর্বদা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা বিজয়ী হও তবে তারা বলে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? পক্ষান্তরে কাফিরদের যদি আংশিক বিজয় হয় তবে তাদেরকে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করিনি ?

৯. অদ্ভুত অহংকারী

নিচের আয়াত দুটোতে এক অদ্ভুত প্রকৃতির অহংকারীর চিত্র অংকিত হয়েছে। এ দুটো আয়াত 'শৈল্পিক চিত্র' শিরোনামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ - لَقَالُوٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ -

আমি যদি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তারা দিনভর তাতে আরোহন করে, তবু তারা এ কথাই বলবে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে, না হয় আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

(সূরা হিজর ঃ ১৪-১৫)

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ -

যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি অবতীর্ণ করতাম। অতপর তারা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করতো তবু কাফিররা এ কথাই বলতোঃ এটি প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আনআম ঃ ৭)

১০. ভীতু বেহায়া

যে ব্যক্তি ভীতু কিন্তু তার সাথে বেহায়া বা নির্লজ্জও, তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ط وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ -

আর যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের ওপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবে ঃ কতোই না ভাল হতো যদি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান হতো। তাহলে আমরা প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যে মনে করতাম না এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম। তারা ইতোপূর্বে যা গোপন করতো তা তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। যদি তাদেরকে পুনরায় পাঠান হয় তবু তারা তাই করবে, যা তাদেরকে করতে নিষেধ করা হয়েছিল। বস্তুত তারা মিথ্যেবাদী। (সূরা আন'আম ঃ ২৭-২৮)

১১. দুর্বল মুনাফিক

এখানে দুর্বল এক মুনাফিকের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সে নিজে যেমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না ঠিক তেমনিভাবে সত্যকে মেনে নিতেও পারে না। প্রতি মুহূর্তে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুদোল্যমান থাকে।

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ -

আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়। তখন তারা একে-অন্যের দিকে তাকায় এবং তারা পরস্পর জিজ্ঞেস করে কোন মুসলমান তোমাদেরকে দেখেছে কিনা, অতপর কেটে পড়ে। আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।
(সূরা আত-তাওবা ঃ ১২৭)

এ ধরনের লোক যখন চুপি চুপি ভাগতে থাকে তখন তা দেখার মতো দৃশ্য বটে।

১২. ওজর-আপত্তিকারী

এখানে এমনকিছু লোকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে যারা ভীরু, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং মিথ্যে ওজর-আপত্তিকারী।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ج يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ -

যদি নগদ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হতো, তবে অবশ্যই তারা তোমার সহযাত্রী হতো। কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ

মনে হলে তারা এমনভাবে শপথ করে বলবে ঃ আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই আমরা আপনাদের সাথে বের হতাম। সত্যিকথা বলতে কি, এরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ্ জানেন এরা মিথ্যেবাদী। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৪২)

১৩. নির্বোধ প্রতারক

কিছুলোক আছে যারা প্রতারণা ও ভণ্ডামীতে লিপ্ত। নিজেদেরকে যদিও তারা চালাক মনে করে কিন্তু তাদের মাথায় ভূষি ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করে কিন্তু বিধিবাম, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ঠকাচ্ছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ - يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ -

মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর ঈমান এনেছি অথচ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে ধোঁকা দিতে পারে না, তাদের এ অনুভূতিটুকু নেই।

১৪. বিপর্যয় সৃষ্টিকারী

এক প্রকার লোক আছে, যারা না জেনে না বুঝে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় কিন্তু যদি তাদেরকে বিরত থাকার কথা বলা হয় তবে তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ لا قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ - اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ -

আর যখন তাদেরকে বলা হয় পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না। তারা বলে আমরা তো সংস্কারের কাজ করছি। জেনে রাখ প্রকৃতপক্ষে তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কিন্তু সে উপলব্ধিটুকু তাদের নেই।

১৫. পার্থিব জীবনের মোহে মোহগ্রস্ত

এমন কিছু লোক আছে, যারা পার্থিব জীবনকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। যেখানেই থাকুক না কেন জৈবিক চাহিদাটাই তাদের কাছে বড়। তারা একে এতো বেশি

গুরুত্ব দেয়, প্রয়োজনে লাঞ্ছনার জীবন যাপন করতে রাজী (তবু তার প্রতিবাদ করে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।) যা কোন স্বাধীনচেতা ব্যক্তির দ্বারা সম্ভবপর নয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ -

তুমি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চেয়ে বেশি লোভী দেখবে।

এ আয়াতে حَيٰوةٌ (জীবন) শব্দটি অনির্দিষ্টবাচক (نكره) নিয়ে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন, তারা যে কোন ধরনের জীবনেই সুখী, হোক না তা লাঞ্ছনার কিংবা অপমানের।

১৬. গোঁয়ার ও স্থবির প্রকৃতির লোক

কিছু লোক এমনও আছে, মনে হয় তাদের পাগুলো পাথর দিয়ে তৈরী। তারা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন চেষ্টাই করে না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَايَهْتَدُوْنَ -

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তাকে মেনে চলো। তখন তারা বলে ঃ কক্ষণও নয়, আমরা তো সেই বিষয়ই মেনে চলি যার ওপর আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না। চিনতো না সরল পথ। (সূরা বাকারা ঃ ১৭০)

১৭. স্বেচ্ছাচারী দল

কিছু লোক আছে, যারা কোন নির্দিষ্ট পথের পথিক নয় কিংবা কোন দল বা জামা'আতের অন্তর্ভুক্তও তারা নয়। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ -

কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বরং অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (সূরা বাকারা ঃ ১০০)

১৮. সত্য হোক কিংবা মিথ্যে, ঝগড়া তারা করবেই

কিছু লোক আছে, যারা সত্য হোক কিংবা মিথ্যে, জেনে হোক কিংবা না

জেনে ঝগড়া বা গণ্ডগোল তারা করবেই। মানুষ এ ধরনের লোককে যেখানেই দেখুক না কেন দুঃখিত না হয়ে পারে না।

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ -

শোন! ইতোপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তা নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছো ? তোমরা যে জান না তা আল্লাহ্ ভাল মতোই জানেন।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৬)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِيْ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ - ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

কিছু লোক জ্ঞান, প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করে দেয়। সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে যেন আল্লাহ্‌র পথ থেকে গুমরাহ করতে পারে। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৮-৯)

এখানে বিতর্ককারী এবং অহংকারী ব্যক্তির এক নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। সে অহংকারের বশবর্তী হয়ে এদিক-সেদিক ঘাড় ঘুরিয়ে বিতর্ক করতে থাকে।

১৯. কৃপণ

যারা প্রয়োজনের মুহূর্তে খরচ করে না, তারা কৃপণ। যদি কেউ খরচ করার পর ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সে বিজয়ের হাসি হেসে বলে ঃ যাক আমি খরচ না করে ভালই করেছি। আমার টাকাগুলো রয়ে গেল। আর যদি জিহাদে কোন কল্যাণ লাভ হয় তখন আক্ষেপ করে বলে ঃ হায়! যদি আমিও খরচ করতাম তবে ভাল হতো।

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ج فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا - وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ

اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا -

তোমাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা গড়িমসি করবে এবং তোমাদের ওপর বিপদ হলে বলবে, ভাগ্যিস, আমি তাদের সাথে যাইনি, আল্লাহ্ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ আসে, তখন তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যে, তোমাদের সাথে তাদের কোন মিত্রতাই ছিল না। তারা বলবে ঃ হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও সফলতা লাভ করতাম।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ২০৪-২০৫)

২০. ভেতর ও বাইরের বৈপরীত্য

কিছু লোক আছে যাদের বাইরের এবং ভেতরের কোন মিল নেই। সম্পূর্ণ বিপরীত। মনে হয় সে একজন নয় দু'জন মানুষ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ - وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ -

আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে। আর তারা নিজেদের মনের কথার ব্যাপারে আল্লাহ্কে সাক্ষী স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরে যায় তখন সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করে, শস্যক্ষেত ধ্বংস ও প্রাণনাশের প্রয়াস পায়। অবশ্য আল্লাহ্ ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ২০৪-২০৫)

২১. মুমূর্ষু অবস্থায় তওবাকারী

কতিপয় লোক ইচ্ছেমাফিক গোটা জিন্দেগী যাপন করে মৃত্যু পূর্ব মুহূর্তে তওবা করে। কিন্তু তাদের এ তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ -

আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে আর যখন তাদের মাথার ওপর মৃত্যু পরওয়ানা ঝুলতে থাকে তখন বলে ঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফুরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৮)

২২. স্বল্প বুদ্ধির লোক

কিছু লোক এমন স্বল্প বুদ্ধির হয়ে থাকে, তাদের সামনে কি বলা হলো, না হলো সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا -

তাদের মধ্যে কতক লোক আপনার কথার দিকে কান পাতে ঠিকই, কিন্তু বাইরে বের হওয়া মাত্র যারা শিক্ষিত তাদেরকে বলে ঃ এই মাত্র তিনি কি বললেন ? (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৬)

২৩. প্রকৃত ঈমানদার

এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

যাদের বলা হয়, তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য বহু লোক সমাগম ঘটেছে এবং বহু সাজ-সরঞ্জাম জমা করা হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হয় এবং তারা উত্তর দেয় ঃ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আর তিনিতো কতো উত্তম অভিভাবক।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৩)

২৪. দরিদ্র অথচ অল্পে তুষ্ট

কিছু লোক সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইরশাদ ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي

الْأَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ
بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا -

দান-সাদকা তো ঐসব গরীব লোকদের জন্য। যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে। জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘুরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা হাত না পাতার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৩)

২৫. আল্লাহ্‌কে ভয়কারী

এ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফরমান হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

যারা ঈমানদার তারা এমন, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা রাখে। (সূরা আল-আনফাল ঃ ২)

২৬. আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا -

রহমানের প্রকৃত বান্দা তারা-ই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা সালাম বলে সরে যায়। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৩)

২৭. দানশীল ও উদার

দানশীল লোকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا - إِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا -

তারা আল্লাহ্ প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতিম ও বন্দীদেরকে আহার করায় এবং বলে আমরা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে খাদ্য দান করি, তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।

২৮. ধৈর্যশীল

যারা ধৈর্যশীল তাদের ব্যাপারে ঘোষণা ঃ

اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ -

তাদের ওপর যখন কোন বিপদ-মুসিবত আসে তখন তারা বলে ঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর নিকটই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৬)

২৯. অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দানকারী

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (সূরা আল-হাশম ঃ ৯)

৩০. ক্রোধ দমনকারী ও অপরকে ক্ষমাকারী

ক্রোধ দমনকারী ও ক্ষমাশীল লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ফরমান—

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ -

তারা নিজেদের ক্রোধকে সম্বরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৪)

ওপরে যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হলো তা সকল কালের এবং সকল মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। আল-কুরআন তাদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে শত শত বছর পরও মনে হয় যেন তারা সবাই আমাদের সামনে বর্তমান।

প্রজ্ঞা-প্রসূত যুক্তি

অন্যান্য দাওয়াতকে যেমন বিভিন্নভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তেমনিভাবে ইসলামী দাওয়াতকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। যারা ইসলামের দাওয়াতকে অসার প্রমাণের জন্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছে ইসলামও তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। কেননা কুরআন মূলত ইসলামী দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট, এজন্য সেখানে যুক্তি-প্রমাণও বর্তমান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই কুরআনী যুক্তির ধরন কি ? বা সেই যুক্তি-তর্কের জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং সেজন্য কি কি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমাদের দেখা উচিত, কুরআন কেন এসেছে ? এবং তা অবতীর্ণের উদ্দেশ্য কি ?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কুরআন সবচেয়ে বড় আকীদা— তওহীদের আকীদার— পুনরুজ্জীবন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছে। এমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ আকীদাকে পুনর্জীবিত করা উদ্দেশ্য ছিল, যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যদেরকেও অংশীদার মনে করতো। কাজেই তাদের জন্য এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা আর কিছুই ছিল না যে, কোন ব্যক্তি বলবে আল্লাহ্ এক।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ - وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ج اِنَّ هٰذَا الشَّيْءٌ يُّرَادُ - مَاسَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ج اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ -

সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে একজনের উপাসনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ? নিশ্চয়ই এ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করলো, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের আরাধনা করতে থাক। অবশ্যই এ বক্তব্য কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা ইতোপূর্বে এমন আজব কথা আর শুনিনি। এটি মনগড়া ব্যাপার বৈ আর কিছুই নয়। (সূরা সাদ ঃ ৫-৭)

বর্তমানে আমরা যখন মুশরিকদের এসব কথাবার্তা ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি লক্ষ্য করি তখন আমাদের হাসি পায়। আমাদের কাছে তাদের একথা সাংঘাতিক বোকামী মনে হয়। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে ঐ সময়ে তওহীদ সম্পর্কে সাধারণের ধারণা কি ছিল ?

এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তওহীদের আকীদাকে ভীষণ আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখা হতো।

আরেকটি কথা বুঝে নেয়া দরকার, আল-কুরআন আরবের যেসব লোককে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য পেশ করেছে তাদের সবাই মুশরিক ছিল না। সেখানে আহলে কিতাব (পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারী) লোকও ছিল। কিন্তু তারা পছন্দ করতো না, অন্য কোন দ্বীন এসে তাদের দ্বীনকে মিটিয়ে দিক। অথবা আসমানী কিতাব এমন এক ব্যক্তির ওপর নাযিল হোক যিনি তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নন। সেই নতুন দ্বীনের মূলনীতি ও সম্পর্ক তাদের দ্বীনের সাথে যতোই থাকুক না কেন।

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ج فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ -

এবং তারা প্রথম কাফিরদের ওপর বিজয় প্রার্থনা করতো। যাকে তারা উত্তমরূপে জানতো যখন সে তাদের কাছে পৌছল তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসলো। (সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৯)

একটি কথা ভেবে দেখার মতো, ইসলাম দ্বীনি ভিত্তি ও মূলনীতির দিক থেকে আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। (কেননা বিকৃতির পূর্বে সেটিও ইসলাম ছিল) কিন্তু তখন ইহুদী ও খ্রীস্টানদের আকীদা যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল, ইসলাম তাকে মোটেও বরদাশত করতে রাজী ছিল না। ইহুদীরা হযরত উজাইর (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বানিয়ে নিয়েছিল আর খ্রীস্টানরা ঈসা (আ)-কে। তাই ইহুদী ও খ্রীস্টানদের দাবি ছিল আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং আমরা আল্লাহ্‌র নিকটতম ও স্নেহভাজন। আমাদের যদি জাহান্নামে যেতেই হয় তবে তা সামান্য কয়েকদিনের জন্য মাত্র। যে কথা স্বয়ং কুরআন বিভিন্ন জায়গায় বলে দিয়েছে।

উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বলা যেতে পারে, ইসলাম তওহীদী আকীদাকে পুনর্জীবিত করার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছিল তা ইহুদী ও খ্রীস্টানদের জন্য অশ্রুতপূর্ব এক কথা ছিল। উপরন্তু আল-কুরআনের প্রথম দাবি ছিল বড় আকীদা (অর্থাৎ তওহীদী আকীদা)-কে নতুন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে তাকে পুনর্জীবন দান করা।

—২০

আমরা তওহীদী আকীদাকে সবচেয়ে বড় আকীদা বলেছি (যদিও বর্তমানে আমাদের কাছে এটি আশ্চর্যের কোন বিষয়ই নয়। এটি এক স্বতসিদ্ধ ব্যাপার) কারণ পূর্ব পুরুষ থেকে চলে আসা আকীদা-বিশ্বাসকে সরাসরি পরিত্যাগ করা কোন মানুষের জন্য চাট্টিখানি কথা ছিল না। আকীদা শৈশব থেকে মানব প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং মানুষের জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য হাজারো ঘটনা চিন্তা ও চেতনাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। তা সহজেই চিন্তা ও চেতনা থেকে মুছে ফেলে দিয়ে একজন ইলাহ্‌র দিকে ছুটে চলে আসবে (যিনি তার যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক শক্তির ওপর বিজয়ী) এটি সহজ ছিল না।

সত্যি কথা বলতে কি, ইসলামই প্রথম দ্বীন নয়, যে তওহীদের দাওয়াত দেয়। অন্যান্য ধর্মও তওহীদের দাওয়াত দেয় এবং সেইসব ধর্মকেও তওহীদের দাওয়াতের কারণে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, ইসলামও এরূপ দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে। অবশ্য পার্থক্য এই যে, ইসলাম যে তওহীদের দাওয়াত দেয় তা সম্পূর্ণরূপে শির্‌ক মুক্ত। এমনকি শির্‌কের সংশয় থেকেও তা পবিত্র ও মুক্ত। এটি নির্ভেজাল তওহীদ। মানবসত্তার মধ্যে রূপ বা সাকারের যে ক্ষুদ্রতম জীবাণু পাওয়া যায়, ইসলাম তারও সম্পূর্ণ বিরোধী।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় কুরআনের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তওহীদের নির্ভেজাল ও পবিত্র আকীদাকে সমুজ্জ্বল করা। উল্লেখ্য যে, আকীদা বা চেতনার স্থায়ী কেন্দ্র হচ্ছে মানুষের মন ও বিবেক। শুধু দ্বীনি আকীদাই নয় বরং সমস্ত আকীদারই আসল জায়গা মানুষের মন। মনের দিকে নিকটতর রাস্তা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। (অর্থাৎ যে কথা স্বতঃসিদ্ধ ও সহজভাবে উপস্থাপন করা হয় মন তা গ্রহণ করে) এবং বিবেক পর্যন্ত পৌঁছানোর সহজতর পথ হচ্ছে উপলব্ধি বা অনুভূতি। (অর্থাৎ অনুভূতির মাধ্যমে বিবেক প্রভাবিত হয়)। এ বিষয়ে মেধার অবস্থান একটি সংযোগ নালীর চেয়ে বেশি নয়। মেধা একটি সুরঙ্গ। এ সুরঙ্গ ছাড়া আরও অনেক সুরঙ্গ আছে। এই যে মেধা তা সমস্ত সুরঙ্গের চেয়ে প্রশস্ত নয় এবং নির্ভরযোগ্যও নয়। আবার মেধা এমন সুরঙ্গ নয় যা অন্যান্য সুরঙ্গের চেয়ে নিকটতর। বস্তুত মেধার এমন কোন বিশেষত্ব নেই যা মন ও বিবেককে পৃথক করে দিতে পারে।

অধুনা কিছু লোক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি দেখে মানুষের মেধা ও যোগ্যতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। এমনকি কতিপয় মোটা বুদ্ধির দ্বীনদার লোক পর্যন্ত এই ফিতনায় জড়িয়ে গিয়ে দ্বীনি দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনাকে মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি-তর্ক এবং বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে যাচাইয়ের চেষ্টা করে। এসব লোক মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে।

এ লোকগুলো মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে এতোটা প্রাধান্য দিচ্ছে, যা মোটেই তার প্রাপ্য নয়। একে ততোটুকু মর্যাদাই দেয়া উচিত যতোটুকু মর্যাদা তার প্রাপ্য। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে ছোট করে দেখে। মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তবু জ্ঞান ও জানার পরিধিকে সে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে না। তা বুদ্ধিবৃত্তিক হোক কিংবা অনুভূতিগত। তাছাড়া মানুষের মেধা ও বুদ্ধি তার অসংখ্য সুরঙ্গ পথের মধ্যে একটি পথের চেয়ে বেশি নয়। একজন মানুষ সেই সুরঙ্গ পথকে নিজের জন্য তখনই বন্ধ করতে পারে, যখন তার আত্মা দুর্বলতার শিকার হয় এবং তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্য এ মহান কাজে সিদ্ধান্ত নেয়ার সামর্থ থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে, মেধা দৈনন্দিন জীবনের কাজ ও প্রয়োজনসমূহ পরিচালনা করে। উপরন্তু সেসব সমস্যার মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে যা কোন না কোনভাবে মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যেখানে আকীদা-বিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িত তার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। মানুষের চিন্তা সেটির শেষ সীমায় উপনীত হতে পারে না। আকাইদের চূঁড়ায় কেবল সেই ব্যক্তি পৌছতে পারে যে হেদায়েতের পথে আছে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। বস্তুত এ প্রকৃতির লোকই নিজের অন্তর ও অনুভূতিকে হেদায়েতের নূরে আলোকিত করতে পারে।

সকল ধর্মে সর্বদা সেইসব লোক-ই বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছে যারা হেদায়েত ও অন্তর্দৃষ্টির পথের যাত্রী। যুক্তিবাদীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী তওহীদী আকীদার ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে কিন্তু বিনিময়ে তাদের কিছুই অর্জিত হয়নি। কুরআনে কারীমা মাত্র ক' বছরে যা কিছু দেখিয়েছে যুক্তিবিদ্যার পণ্ডিতগণ তার সহস্র ভাগের একভাগও করতে পারেনি। আসুন দেখি আল-কুরআন সেই উদ্দেশ্যে কি ধরনের সহজ ও সাধারণের বোধগম্য পথ অবলম্বন করেছে।

আল-কুরআনের সহজ-সরল বক্তব্য

মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে শাণিত করার জন্য আল-কুরআন সর্বদা মানুষের চেতনা ও অনুভূতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে। আরেকটু আগে বেড়ে সে মানুষের বিবেককে প্রভাবিত করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে কুরআন যা করতে চায় তা দৃশ্যের বোধগম্যতা এবং দৃষ্টিগোচরের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্য কথায় তর্কে পরিণত শিল্পকর্মও বলা যেতে পারে। আল-কুরআন সেসব স্বতসিদ্ধ বাস্তবতার মাধ্যমেও

কাজ নিয়ে থাকে, যা চিরন্তনী ও স্থায়ী। তা এমন বাস্তব, যার জন্য অন্তর্দৃষ্টির আলোকময় দরোজা খুলে যায় এবং সে সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা তা উপলব্ধি করে।

এজন্য আল-কুরআন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তা সাধারণ এক পদ্ধতি— কল্পনা ও রূপায়নের মাধ্যমে কোন বস্তুকে সচিত্র উপস্থাপন করা– যেমন আমরা বিগত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। এখানে আমরা 'তাজসীম' (রূপায়ণ) শব্দটি শৈল্পিক ভাব প্রকাশক অর্থে ব্যবহার করেছি, দ্বীনি অর্থে নয়। কেননা ইসলাম বস্তুবাদী ধ্যান–ধারণা মুক্ত পবিত্র দ্বীন, তা রূপায়নের মুখাপেক্ষী নয়।

আল-কুরআন যে পদ্ধতিতে বিরোধীদের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছে তাকে আমরা প্রজ্ঞা প্রসূত যুক্তি বলতে পারি। আর এ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে কখনো শব্দ দিয়ে, কখনো বিভিন্ন কিস্‌সা-কাহিনী দিয়ে, আবার কখনো ছবির মাধ্যমে। এ সবকিছুর সমন্বয়েই কুরআন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

তাছাড়া কিয়ামতের যে দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়েছে, শান্তি ও শাস্তির যে ছবি আঁকা হয়েছে, তাও প্রজ্ঞাপ্রসূত যুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো মানুষের অবচেতন মনের দুয়ারে কষাঘাত করে। চিন্তাকে করে শাণিত, অন্তর্দৃষ্টিকে করে প্রসারিত। অলস স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করে বাস্তব জগতে নিয়ে আসে মানুষকে। ফলে মানুষের মন সত্যকে গ্রহণ করার ও তার ওপর দৃঢ় থাকার জন্য তৈরী হয়ে যায়।

উপরন্তু আল-কুরআন মানবিক ও মনোজাগতিক চিত্র, কিস্‌সা-কাহিনী, কিয়ামতের দৃশ্য, শাস্তি ও শান্তির চিত্র ছাড়াও দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আরেকটি পন্থা অবলম্বন করেছে, তা হচ্ছে প্রজ্ঞাপ্রসূত যুক্তিকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা। এজন্য আমি একে পৃথক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তবে এ অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় যুক্তি-তর্ক নয়। আমরা কেবল আলোচনা করতে চাই সেই যুক্তি-প্রমাণের ধরন বা প্রকৃতি কি ? কারণ, আমাদের মূল আলোচনা হচ্ছে— ছবির প্রকৃতি ও ধরন নিয়ে, যার ওপর ভিত্তি করে কুরআনের অব্যাহত চলা। কেননা আমাদের এ পুস্তকের বিষয়বস্তু শুধু আল-কুরআনের শৈল্পিক দিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য কিছু নয়। আল-কুরআনের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্যই নয়।

তওহীদ (একত্ববাদ) সমস্যা

আমরা পূর্বেই বলেছি, ইসলামের প্রথম দাওয়াত ও দাবিই হচ্ছে তওহীদ। কুরআন যাদেরকে সম্বোধন করেছে তারা ছিল তওহীদের ঘোর বিরোধী। তারা একে আজব কথা মনে করতো। দেখার বিষয় হচ্ছে তওহীদ অস্বীকারকারীদের সাথে কুরআন কিভাবে তার যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই, আল-কুরআন তওহীদের দাওয়াতকে অত্যন্ত সহজ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পেশ করে মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়ার চেষ্টা করেছে। আল-কুরআনের বক্তব্য এমন স্বতঃসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট যার মধ্যে না আছে কোন জটিলতা আর না আছে পাল্টা যুক্তির অবকাশ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَمِ اتَّخَذُوٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ - لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ - اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ج هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ لا الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ -

তারা কি মাটির তৈরী মূর্তিকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছে এজন্য যে, তারা তাদেরকে জীবিত করবে? যদি আকাশ পৃথিবীতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। তাই তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না ববং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। তারা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বলো ঃ তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন, এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটিই আমার পূর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না, ফলে তারা টালবাহানা করে।

(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২১-২৪)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ -

আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন ইলাহ্ নেই।

থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একজন আরেকজনের ওপর চড়াও হতো। কাজেই তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ৯১)

তওহীদের স্বপক্ষে এ রকম স্বতঃসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ আরও অনেক আছে। এ আয়াতগুলোর তাৎপর্য হচ্ছে, আমরা পৃথিবী ও আকাশের কোন রকম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখি না। সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলছে। এতেই বুঝা যায় বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা শুধু একজনেরই হাতে। আর তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

সাথে সাথে কুরআন একথাও বলে দিয়েছে, যদি আসমান-জমিনে একাধিক ইলাহ্ থাকতো তবে তারা যার যার সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো। এতো অত্যন্ত হাসির কথা, প্রত্যেক সৃষ্টি তার ইলাহ্র কাছে আশ্রয় নেবে। তারপর প্রত্যেক ইলাহ্ তার সৃষ্টি নিয়ে পৃথকভাবে চলতে থাকবে। কিন্তু জানা নেই, সেই চলার শেষ কোথায় ? আমাদের কাছেও এর কোন জবাব নেই। তাই একাধিক ইলাহ্র কথা স্মরণ হলেই আমাদের হাসি পায়, যদি একাধিক ইলাহ্ থাকতো তবে আসমান-জমিনে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেতো

আরও প্রশ্ন হতে পারে, যদি আরেকজন ইলাহ্ থেকেই থাকেন তিনি কি করেছেন ? আসমান আর জমিন তো সৃষ্টি করা হয়েই গেছে এবং তা আমাদের সামনে মওজুদও আছে। তিনি নতুন করে কি সৃষ্টি করেছেন ?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ط اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

বলো ঃ তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর যাদের পূজা করো তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি ? দেখাও তো আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে ? অথবা নভোমণ্ডল সৃষ্টিতে তাদের কি কোন অংশ আছে ? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব কিংবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার সামনে উপস্থিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (সূরা আহকাফ ঃ ৪)

আবার দেখুন, বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্র সৃষ্টি বিদ্যমান। আল্লাহ্র কুদরতের স্পর্শ প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি বস্তুতে প্রকাশমান। আমাদের ইন্দ্রিয় তা দেখে, বিবেক তার স্বীকৃতি দেয়, অন্তর্দৃষ্টি তা অনুভব করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছেঃ

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ط اٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا
يُشْرِكُوْنَ - اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ج
فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا
شَجَرَهَا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ - اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ
قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - اَمَّنْ يُّجِيْبُ
الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ
مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ - اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط
تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ
يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

বলো ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দাদের ওপর। শ্রেষ্ঠ কে ? আল্লাহ্ না ওরা, তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে ? বলতো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ? আকাশ থেকে কে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছেন ? (অবশ্যই আমি তা বর্ষণ করি) অতপর সেই পানি দিয়ে আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিও তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি ? সত্যিকথা বলতে কি, তারা বিচ্যুত সম্প্রদায়। বলতো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন ? এবং তাকে স্থির রাখার জন্য পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন আর সমুদ্রের মাঝে আড় দিয়ে রেখেছেন ? এবার বলো, তাঁর সাথে কোন উপাস্য আছে কি ? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। বলতো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন? যখন সে ডাকে। এবং কষ্ট দূরীভূত করেন আর তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুনর্বাসিত করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে আর কোন ইলাহ্ আছে কি ?

তোমরা খুব সামান্যই চিন্তা করো। বলতো কে তোমাদেরকে জলে-স্থলে ও অন্ধকারে পথ দেখান ? এবং তিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন ? কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে আর কোন উপাস্য আছে কি ? তারা যাদেরকে শরীক করে তা থেকে আল্লাহ্ অনেক ঊর্ধ্বে। বলতো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন ? (আবার বলো) আল্লাহ্‌র সাথে আর কোন ইলাহ্ আছে কি ? বলো ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো। (সূরা আন-নামল ঃ ৫৯-৬৪)

উল্লেখিত আয়াতসমূহের বিভিন্ন বিষয় মানব সত্তায় তওহীদী চেতনাকে মজবুত ও দৃঢ় করতে একে-অপরের অংশীদার, পরিপূরক। যেমন আসমান-জমিনের দৃশ্যাবলী দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রকৃতিগত অনুভূতি যা জীবিকার কষ্টে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়ার জন্য বাধ্য করে। এসব কিছু মিলে চিন্তা, অনুভূতি, বিবেক এবং অন্তর্দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে মানব-সত্তাকে তওহীদী চেতনার দিকে ধাবিত করে। এ ধরনের আয়াত আল-কুরআনে অসংখ্য। তদ্রূপ কিয়ামত, জান্নাত এবং জাহান্নামের দৃশ্যাবলীও আল-কুরআনে কম নয়। তেমনিভাবে তওহীদের আকীদা (চেতনা)-কে মানুষের মন-মগজে বদ্ধমূল করার আয়াতেরও কোন ঘাটতি নেই। এসব কিছুই মূলত প্রজ্ঞা-প্রসূত যুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান

যে দাবিটি বুঝাতে ইসলামের সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়, সেটি হচ্ছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, কিয়ামত, হাশর ইত্যাদি। ইসলাম সেইসব আরবকে উদ্দেশ্য করে বলেছে যারা বলেছিল ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ -

আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা মরি কিংবা বাঁচি সব এখানেই এবং আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবো না। (সূরা মুমিনুন ঃ ৩৭)

পুনরুত্থানের বিষয়টি আরবদের মধ্যে তওহীদের দাওয়াতের চেয়েও বেশি আশ্চর্যের বিষয় ছিল। যারা পুনরুত্থানের বিষয়টিকে মেনে নিত তাদেরকে তারা পাগল বলতো। তাদের ধারণা ছিল কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক একথা মেনে নিতে পারে না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ - اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ -

কাফিররা বলতো ঃ আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব না, যে খবর দেয় তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে ? সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যে বলে, না হয় পাগল ?

(সূরা আস্-সাবা ঃ ৭-৮)

হাশর-নশরকে তারা এরূপ আশ্চর্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতো। এবার দেখা যাক এমন আশ্চর্যজনক পরিস্থিতিতে আল-কুরআন তাদের সামনে কি ধরনের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।

কুরআন তাদেরকে সৃষ্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেশ করেছে। জমিনে বিশেষ করে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে মানুষকে এক বিশেষ জীবন প্রদানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানে কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল— আল্লাহ্ যেমন সৃষ্টির সূচনা করতে পারেন, আবার তিনি তার পুনরাবৃত্তিও করতে পারেন এবং তিনি এ ব্যাপারে সক্ষম।

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۭ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ -

আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৫)

আল-কুরআনের চিত্রায়ণ পদ্ধতিতে যা কুরআনের একটি বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি জমিন ও মানুষের মধ্যে জীবনের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় সেই বিশেষ ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করেছে।

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ - مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ - مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ - ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ - ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ - ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ - كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ - فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ - اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا - ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا - فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا - وَّعِنَبًا

وَّقَضْبًا - وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا - وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا - وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا - مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ -

মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতো অকৃতজ্ঞ! তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন ? বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। অতপর তার পথ সহজ করেছেন, তারপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছে করবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন। সে কখনো কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন সে তা পূর্ণ করেনি। মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমি অলৌকিকভাবে তাতে পানি বর্ষণ করেছি, তারপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি তারপর সেখানে উৎপন্ন করেছি শষ্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, ঘনো বাগান, ফল এবং ঘাস। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ প্রাণীদের উপকারার্থে।

(সূরা আবাসা ঃ ১৭-৩২)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ - وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَط - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

তিনি মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন আর মৃত জমিনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন হচ্ছে, তিনি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এখন তোমরা (মানুষ), পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। আরেক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে একজন সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অবশ্যই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন আছে। তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। তাঁর আরও একটি নিদর্শন এই যে, রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয়ই এতে যারা মনোযোগী তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তাঁর আরেক নিদর্শন তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখান ভয় ও ভরসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে মৃত জমিনকে জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আর রুম ঃ ১৯-২৪)

কুরআন তাদের সামনে এমন কিছু ছবি উপস্থিত করেছে যা তাদের বোধগম্য এবং যে সম্পর্কে তারা ভালোভাবে অবগত। তাদের ইন্দ্রিয় সারাক্ষণ এসব চিত্র অবলোকন করতো। এসব ছবি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে প্রতিনিয়ত তার (শিক্ষার) দিকে টানত।

এসব দৃশ্যাবলী আরবদের জীবন-জীবিকা এবং তাদের বিবেক ও অনুভূতির সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতো। এ দৃশ্যগুলো তাদের সত্তায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। কুরআন তাদেরকে সেসব দৃশ্যের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মনে হয় তা কোন নতুন দৃশ্য। অবশ্য যে ব্যক্তি চোখ-কান খোলা রেখে সেসব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে সে নিশ্চয়ই সেখানে নতুনত্বের সন্ধান পায়—যদি সে নিজের জিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে। মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তির কোন স্থায়ীত্ব নেই, বড়জোর তা নৈপুণ্যতার দলিল হতে পারে।

মানুষের মেধা বা ইন্দ্রিয় উভয়ে এটি চায় যে, আকীদা (চেতনা)-এর গভীর পর্যন্ত সে পৌঁছে যাক। মানুষ অজানা বিষয়ে জানতে আগ্রহী। কোন আকীদা চেতনা ও অনুভূতি থেকে যতোটুকু গোপন ও দূরে থাকে, সেই পর্যন্ত পৌঁছতে তা আকাংখিত হয়। এজন্য কুরআন আকীদার ব্যাপারেও ছবি ও কল্পনার স্টাইলে বর্ণনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ -

তুমি কি দেখ না, আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে এবং উড়ন্ত পাখীগুলো তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত, পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। (সূরা আন-নূর ঃ ৪১)

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই, যা তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের সে মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ - رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ط وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এই বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব

থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালকর্তা, তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন, আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। সেটি হবে মহাসাফল্য। (সূরা মুমিন ঃ ৭-৯)

এসব আয়াতে যে ছবি আঁকা হয়েছে, তা মানব প্রকৃতিতে এমন ভয়ের সৃষ্টি করে যেরূপ অজানা বস্তুর ছবি দেখে সে ভীতু-বিহ্বল হয়ে পড়ে। আবার অজানা-অচেনা জগৎ সম্পর্কে তার মধ্যে ঔৎসুক্যেরও সৃষ্টি করে। সে এমন এক জগৎ যেখানে ফেরেশতাগণ আরশ বহন করছে এবং সেই সাথে তাঁর গুণগান করছে। সাথে সাথে পৃথিবীতেও এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্র তাসবীহ ও গুণগান করছে না।

অনেক সময় অদৃশ্য বস্তু খুব কাছাকাছিই থাকে কিন্তু মানুষের বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। তবু তা মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে এবং তা থেকে আল্লাহ্র কুদরত প্রমাণিত হয়। মানুষের মন তার প্রভাবে ঈমানের আলোতে ঝলমলিয়ে উঠে।

اِنَّ اللّٰهَ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ - هُوَ الَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ -

আল্লাহ্র নিকট আসমান ও জমিনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। তিনিই সেই (আল্লাহ্) যিনি মায়ের গর্ভে ইচ্ছেমতো তোমাদের আকার-আকৃতি বানিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫-৬)

এ আয়াতে ঐ কথার প্রমাণ, আল্লাহ্ সমস্ত অদৃশ্য জগতের খবর জানেন। এটি মূলত বিবেকের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রমাণ, এটি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের বিষয় নয়। নিচের আয়াতে এর চেয়েও প্রশস্ত এবং নজর কাড়া এক ছবি আঁকা হয়েছে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَآ اِلَّاهُوَ ط وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَايَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ -

তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্য জগতের চাবি। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা আছে তিনি জানেন। তাঁর অজান্তে একটি পাতাও ঝরে না। একটি শস্য দানাও তাঁর অজান্তে অন্ধকার মাটিতে পতিত হয় না কিংবা কোন আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তুও কোথাও পতিত হয় না। সবকিছুই প্রকাশ্য এক কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম ঃ ৫৯)

আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালীভাবে আল্লাহ্র ক্ষমতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। দেখানো হয়েছে, আল্লাহ্র জানার পরিধি কতো বিস্তৃত। এ উদ্দেশ্য বুঝাতে সর্বোত্তম শব্দ চয়ন করা হয়েছে এবং সেই শব্দ দিয়ে চমৎকার ছবি আঁকা হয়েছে। এ আয়াতের শব্দগুলো আল্লাহ্র ইল্মের প্রশস্ততার প্রকাশ করছে। শুধু তাই নয় বরং এ শব্দগুলো দিয়ে আশ্চর্যজনক এক কাল্পনিক ছবিও আঁকা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে— 'কোন পাতাও এমনভাবে ঝরে না যা তিনি জানেন না। আর পৃথিবীর অন্ধকার কোন কোণে এমন একটি দানাও নেই যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। তাছাড়া তিনি ভেজা কিংবা শুকনো সবকিছু সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল।' মনে হয় এ কোন বর্ণনা নয় বরং হুবহু এক ছবি।

এ আয়াত পাঠ করে মানুষ কল্পনার চোখে গোটা পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখতে চায়, সেই ঝরা পাতাটি কোথায়? ঐ দানাটাও খুঁজে ফেরে যা অন্ধকার মাটিতে লুক্কায়িত। কিন্তু এগুলোতে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানার উপায় নেই। চিন্তা করতে করতে যখন মানুষ নিজের দিকে ফিরে আসে তখন আল্লাহ্র ভয় ও মর্যাদা তার ওপর ছেয়ে যায়। ঐ মুহূর্তে সে দরবারে বারী তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং অত্যন্ত তন্ময়তার সাথে তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান করতে থাকে।

এই হচ্ছে আল-কুরআনের যুক্তি-প্রমাণ, যাকে যুক্তির চিত্রও বলা যেতে পারে। এর সাথে মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তির কি সম্পর্ক থাকতে পারে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের যুক্তিবাদীগণ দিয়ে এসেছেন?

অনেক জায়গায় মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তি-তর্ককে আল-কুরআন এড়িয়ে চলেছে। আমরা তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ -

তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের পূজা করো, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আর তোমরা সবাই সেখানে প্রবেশ করবে।
(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৯৮)

এ আয়াত শুনে আরবের মুশরিকদের ধারণা হয়েছিল, খ্রীস্টানদের মধ্যে এ ধরনের লোক আছে যারা ঈসা (আ) কে ইলাহ্ মনে করে। তবে কি ঈসা (আ)ও জাহান্নামে যাবে ? তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ও খ্রীস্টানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটান। এজন্য তারা মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তির অবতারণা করেছে।

এ প্রসঙ্গে নিচের আয়াতটিতে সুন্দর জবাব দেয়া হয়েছে।

مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ -

তারা তোমার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত এরা হচ্ছে বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৮)

অতি সাধারণভাবে বর্ণিত এ বাক্যটি। এখানে মানতেক বা যুক্তিশাস্ত্রের কোন সাহায্য নেয়া হয়নি।

যদি কুরআন মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তি-তর্কের স্টাইলে কথা বলতো, তবে কোন কাজই হতো না। কারণ এভাবে কুরআনের মূল লক্ষ্য অর্জিত হতো না। কেননা বাদানুবাদ কিংবা বিতর্কের মাধ্যমে কোন বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। বিশ্বাসের স্থান বিতর্কের উর্ধ্বে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কুরআন মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়ার চেষ্টা করেছে। সে জন্য কাহিনী বর্ণনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ তার মূল বক্তব্যকে উপমেয় স্টাইলে উপস্থাপন করে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। যেহেতু আল-কুরআন দ্বীনি ও শৈল্পিক উভয় বিষয়ের ধারক ও আঁধার। সে জন্যই আল-কুরআন বক্তব্য উপস্থাপনের যে স্টাইল গ্রহণ করেছে তা সৌন্দর্য ও সুষমার শীর্ষে অবস্থিত।

আল-কুরআনের বর্ণনা রীতি

পেছনের যাবতীয় আলোচনার মূল কথা হচ্ছে আল-কুরআন একক ও ব্যতিক্রমী স্টাইলে তার বক্তব্য পেশ করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করে। এমনকি দলিল-প্রমাণ কিংবা যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের বেলায়ও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তাছাড়া কল্পনা ও রূপায়ণের মাধ্যমে প্রতিটি ঘটনাকে ছবির মতো করে উপস্থিত করেছে। অর্থাৎ কুরআন অশরীরি অর্থকে শরীরি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে উপস্থাপন করেছে।

আমরা দেখতে চাচ্ছি, বর্ণনার এ শৈল্পিক পদ্ধতি কতোটুকু সফল ও কার্যকরী। এটিই আমাদের এ পুস্তকের বিষয়বস্তু। আল-কুরআন দ্বীনি যে প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে এসেছে, আইনগত যেসব প্রসঙ্গ আল-কুরআন আলোচনা করেছে, সেগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। ইতোপূর্বে আমরা যেসব আলোচনা করেছি সেখানে এসব বিষয়ে কিছু আলোচনা এসেছে, তা শুধু এজন্য, কুরআন সেই বিষয়টিকে কিভাবে উপস্থিত করেছে এবং তার ধরন ও পদ্ধতি কি, সেই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

অনেকে আল-কুরআনের বিষয়বস্তুকে যখন গভীরভাবে দেখেন, তার প্রশস্ততা, সর্ব ব্যাপকতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন তখন বলে উঠেন— এ বিষয়বস্তুই এর স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য। আর এটিই যথেষ্ট। আল-কুরআনের বর্ণনা, এপ্রোচের ঢং ও তার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ, সেগুলো গৌণ ব্যাপার। তাদের দৃষ্টিতে আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব, তা সবটুকুই বিষয়বস্তুর মধ্যে। আবার অনেকে শব্দ ও বাক্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন— আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব পৃথক পৃথকভাবে উভয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে— আল-কুরআন তার বর্ণনার যে স্টাইল অবলম্বন করেছে, উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু তা থেকেই সৃষ্ট। তাই দুটোর মর্যাদাই সমান। আমরা শব্দ ও অর্থ নিয়ে অনর্থক বিতর্কে জড়ান পসন্দ করছি না। যদিও প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ সেসব শব্দ ও অর্থ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন।

ইবনু কুতাইবা, কুদামাহ, আবু হিলাল আসকারী প্রমুখ সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। তবে আমরা মনে করি এ বিষয়ে আবদুল কাহির জুরজানী 'দালাইলুল ইজায' নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তা গভীর পাণ্ডিত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন— একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একথা চিন্তাও করতে পারেন না, শব্দ নিয়ে কোন বিতর্ক চলতে পারে, তা শুধু এজন্য। অবশ্য শব্দটি কি অর্থে প্রয়োগ করা হবে তা নিয়ে কথা হতে পারে। মনোপুত কোন অর্থ নিয়েও বিতর্ক হতে পারে না। হ্যাঁ, অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বিতর্ক করা যেতে পারে তাহলো— বোধগম্য অর্থটি কোন্ শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। শব্দটি সেই অর্থেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তাছাড়া সেই অর্থ কেবল তখনই প্রকাশ হতে পারে, যখন তা এক বিশেষ ছন্দে ও মাত্রায় সংকলন করা যায়, নইলে নয়। শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ পৃথক পৃথক হবে অথচ অর্থেরও মিল থাকবে, তা সম্ভব নয়।

যদি আবদুল কাহির জুরজানী এ উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে কিছু লিখতেন, আমরা তা হুবহু তুলে দিতাম। কিন্তু আফসোস, তিনি পুরো পুস্তকই এ আলোচনা দিয়ে ভরে দিয়েছেন। সেজন্য আমরা তার চিন্তাকে পুরোপুরি উপস্থাপন করতে পারছি না। এমনকি কোন অংশের উদ্ধৃতিও দিতে পারছি না। আমরা দেখেছি তার উপকরণ বড় জটিল।

তবে বলিষ্ঠভাবে যে কথাটি বলা যায়, তা হচ্ছে— এসব ব্যাপারে সমাধানের যোগ্যতা তার ছিল। তিনি যদি বিষয়টি নিয়ে আরেকটু অগ্রসর হতেন, তাহলে তিনি শৈল্পিক চূড়া স্পর্শ করতে পারতেন।

আমরা আবদুল কাহিরের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে বলতে চাই, তার রচনার বিন্যাস ও ছন্দ, অর্থের চিত্রাংকনে বড় পারদর্শী। যেখানে অন্তর্নিহিত একটি অর্থ বুঝানোর জন্য দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সেখানে মন ও মানসে দুটো ভিন্ন অর্থই প্রতিভাত হয়। মনে হয় সেই অর্থ ও বর্ণনার ধরনের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক আছে যা গ্রহণের পর সেই ব্যাপারে আর কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না, যাতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে পৃথক চিন্তা করা যেতে পারে। একটি অর্থের প্রকাশ এমনভাবে হয় যখন বিন্যাস ও মিল এক রকম হয়। শব্দের অবস্থা ভেদে যতোটুকু পরিবর্তন প্রতিভাত হবে অর্থের মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেক সময় মেধাগত দিক প্রভাবিত হয় না কিন্তু মন-মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, শিল্পকলায় যেই জিনিসের ওপর নির্ভর করা হয়, তা হচ্ছে মনোজাগতিক অবস্থা। এজন্য শিল্পকলায় যে স্টাইলে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তা শুধু মনোজগতকে প্রভাবিত করার জন্যই করা হয়। এজন্যই যখন বাক্যের প্রভাবে পরিবর্তন সূচিত হবে তখন অর্থের মধ্যেও পরিবর্তন আসবে।

উপরোক্ত আলোচনা একথারই ইঙ্গিত করে, আল-কুরআনে দৃশ্যায়নের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি সেই বর্ণনা পদ্ধতি যেখানে কুরআনী অর্থ, উদ্দেশ্য ও বিষয়কে সেই রূপই দেয়া হয়েছে, যে রূপে আমরা তা দেখতে পারি। আর এ অবস্থাটি তার মান-মর্যাদার নির্ণায়ক। যদি সেখানে এ অবস্থা না হয়ে অন্য কিছু হতো তাহলে বর্তমানের মতো তা গুরুত্বপূর্ণ হতো না।

উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করতে চাই। যদিও এ পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের উদাহরণ আছে এবং আমরা সে বিষয়ে বিশদ বিবরণও দিয়েছি যা থেকে আল-কুরআনের বাচনভঙ্গির ধরনটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু যেহেতু এটি পুস্তকের শেষ অধ্যায় এজন্য আমরা 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি' স্বরূপ আরও কিছু আলোচনার উদাহরণ পেশ করছি। কারণ, আমাদের কাছে তো উদাহরণের অভাব নেই।

আল-কুরআনের বর্ণনা-রীতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাকে চিত্ররূপ দিয়ে তাকে বোধগম্য অবস্থায় তুলে ধরা। একই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক চিত্র, অতীতের ইতিহাস, ঘটনা ও উদাহরণ, কিয়ামতের দৃশ্যাবলী, শাস্তি ও শান্তির দৃশ্যসহ মানুষের স্বরূপকে এমনভাবে আল-কুরআন তুলে ধরেছে, মনে হয় এরা সবাই চোখের সামনে উপস্থিত। এভাবে কুরআন চৈন্তিক বিষয়কে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতায় এনে দিয়েছে। আবার চিন্তা শক্তির মাধ্যমে সেগুলোর মধ্যে গতিও সৃষ্টি করা হয়েছে। যা কল্পনার চোখে সর্বদা চলমান মনে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে— আল-কুরআন দৃশ্যায়নের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা অন্য পদ্ধতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন, যেখানে অর্থ এবং অবস্থা আসল রূপে বর্ণনা করা হয়? তদ্রূপ কোন দুর্ঘটনা কিংবা কাহিনীকে প্রকৃত অবস্থায় বর্ণনা করা হয়। যদি কোন দৃশ্যের বর্ণনা উদ্দেশ্য হয় এবং তাও যদি সাদামাঠা কিছু শব্দে বর্ণনা করা হয়, তার কল্পিত চিত্র না আঁকা হয়।

আল-কুরআনের গৃহীত ধরন ও পদ্ধতির মর্যাদা সম্পর্কে শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট, প্রথমে আমরা সেগুলো তার আসল সুরুত বা অবগুণ্ঠন মুক্ত অবস্থায়ই দেখি। তারপর দৃশ্যাকারে কল্পনায় তা সামনে নিয়ে আসা হয়। এভাবে উভয় অবস্থা পরস্পর সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রথম অবস্থায় অর্থ, মেধা ও অনুভূতিকে সম্বোধন করে এবং বহনকারী প্রতিবিম্ব থেকে পৃথক হয়ে তার কাছে পৌঁছে। আর যখন চিত্রায়ণ পদ্ধতিতে অর্থ ইন্দ্রিয় ও বিবেককে সম্বোধন করে এবং ভিন্ন পথে মানুষের কাছে পৌঁছে। এভাবেই বিবেক প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ব্যতিক্রমী পথে এ প্রভাব মানুষের কাছে

পৌছে। সেসব পথের মধ্যে মেধাও একটি পথ। এটি বলা যাবে না যে, মেধা-ই একমাত্র পথ। এ পথ ও পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পথই নেই।

এতে কোন সন্দেহ নেই, আল-কুরআন দৃশ্যায়নের যে স্টাইল গ্রহণ করেছে তা অত্যন্ত চমকপ্রদ।

সকল আকীদার দাওয়াত দিতেই এ পদ্ধতিটি ভারসাম্যপূর্ণ কিন্তু আমরা শুধু শৈল্পিক সৌন্দর্যের দিকটিই যাচাই করতে চাই। নিঃসন্দেহে এ বর্ণনারীতি শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য শৈল্পিক প্রথম দাবি, বিবেককে প্রভাবিত করে সেখানে শৈল্পিক আকর্ষণ সৃষ্টি করা। সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে জীবনের আভ্যন্তরীণকে আলোকজ্জ্বল করা এবং দৃশ্যের মাধ্যমে চিন্তাশক্তির খোরাক যোগান। উদ্দিষ্ট বাক্যটি এভাবেই সচিত্র ও মূর্তমান হয়ে উঠে। ইতোপূর্বে আমরা যেসব উপমা দিয়েছি তা থেকে একটি উপমা পুনরায় তুলে ধরলাম।

১. ঈমানের প্রতি কঠোর ঘৃণা প্রকাশের কথাটি, যারা ঈমানের পথ থেকে দূরে চলে যায়, তাদেরকে কুরআন সোজাসুজি বলে দিলেই পারতো, অমুক অমুক ব্যক্তি ঈমানকে ঘৃণা করে। এ বাক্যটি শুনামাত্র মানুষের চিন্তায় ঘৃণার কথাটি বদ্ধমূল হয়ে যেতো এবং পূর্ণনিশ্চয়তা ও এতমিনানের সাথে এ শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো। কিন্তু এ ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের চিত্রটি নিচের বাক্যটির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ - كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ - فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ -

তাদের কি হলো, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গর্দভ, হট্টগোলের কারণে পলায়নপর।

(সূরা আল-মুদ্দাসির ঃ ৪৯-৫১)

এ পদ্ধতিতে বর্ণনায় মেধার সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তাশক্তিও অংশগ্রহণ করে। সেই সাথে যারা ঈমানকে ঘৃণা করে তাদের একটি সুন্দর ব্যাঙ্গচিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। জঙ্গলী গাধা যেমন শোরগোল শুনে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে দিক-বিদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে, তেমনিভাবে কাফির ও মুশরিকরাও আল্লাহ্‌র কথা শুনে পালাতে চেষ্টা করে। এ ছবিতে শৈল্পিক সৌন্দর্য তখনই সৃষ্টি হয় যখন কল্পনায় হট্টগোলের কারণে গাধার দলের দৌড়ে পালান, নড়াচড়া এবং তাদের পিছু ধাবমান বাঘের দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে উঠে।

২. আরবরা যেসব বাতিল মা'বুদের উপাসনা করতো তাদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কথাটি সাদামাটাভাবে বলে দিলেই হতো, 'আল্লাহ্কে ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা আল্লাহ্র এক নগণ্য সৃষ্টির চেয়েও দুর্বল।' এভাবে বক্তব্যটি অন্য কিছুর সাথে না মিলে সোজা মানুষের চিন্তার দরজায় পৌছে যেতো।

কিন্তু তা না করে বরং চিত্ররূপ দেয়া হয়েছে। এভাবে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ط وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ –

তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের পূজা-অর্চনা করো, তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা মাছির কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও সক্ষম নয়। প্রার্থনাকারী ও যার প্রার্থনা করা হয় উভয়েই কতো অসহায়। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৩)

মূর্ত ও চলমান হয়ে গোটা চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে এবং তা তিনটি স্তরে প্রতিভাত হয়।

(১) তাদের বাতিল মা'বুদরা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়।

(২) সবাই মিলে যদি চেষ্টা করে তবু নয়।

(৩) সৃষ্টিতো দূরের কথা, মাছি যদি তাদের কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারা সেই বস্তু মাছির কাছ থেকে উদ্ধার করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম।

এ হচ্ছে তাদের (বাতিল মা'বুদদের) দুর্বলতা ও অক্ষমতার ছবি। এ ছবিতে এমন ভঙ্গিতে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে মানুষের মনে বাতিল মা'বুদদের সম্পর্কে অবজ্ঞা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে কি মিশ্রতার অতিশয়োক্তি ঘটানো হয়েছে ? এবং বালাগাত (ভাষার অলংকার) কি মিশ্রতার অতিশয়োক্তিতে একাকার হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই নয়। এখানে অতিশয়োক্তির কোন উপাদান নেই। মূল কথা হচ্ছে, সমস্ত বাতিল মা'বুদরা যদি একটি মাছি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তবু তা করতে সক্ষম হবে না। নিঃসন্দেহে মাছি অত্যন্ত ছোট্ট ও নগণ্য একটি প্রাণী। কিন্তু তা সৃষ্টি করার মধ্যে ঐ ধরনের অলৌকিকত্বই বিদ্যমান যা একটি উট কিংবা হাতি সৃষ্টি করার পেছনে থাকে । এ 'মুজিযা' জীবন সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। চাই তা কোন

বড় প্রাণীর সৃষ্টি হোক কিংবা কোন ছোট প্রাণীর। শুধু বড় বড় প্রাণী সৃষ্টি করাটাই মুজিযা নয় বরং অতি তুচ্ছ ও নগণ্য একটি প্রাণী সৃষ্টির ব্যাপারেও অলৌকিকতা বিদ্যমান।

এই ছবিতে যে শৈল্পিক সৌন্দর্য বর্তমান, তা হচ্ছে— তারা যেহেতু (বাতিল মা'বুদরা) একটি ছোট্ট মাছি সৃষ্টি করার যোগ্যতাও রাখে না, কাজেই তারা আর কি সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ থেকে আপনা আপনি তাদের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তারপর বলা হয়েছে সৃষ্টি তো দূরের কথা যদি এ ছোট্ট মাছিটি তাদের কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তা উদ্ধার করতেও তারা সক্ষম নয়। এসব কিছুই শৈল্পিক সৌন্দর্যের উপকরণ।

৩. কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সাধারণভাবে বলে দিলেই হতো "সেদিন বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে, আর যাদের অনুসরণ করা হয় তারা তাদের অনুসারীকে প্রত্যাখ্যান করবে।" এভাবে বলে দিলে যে বর্ণনা একেবারে মানসম্পন্ন হতো না, তা ঠিক নয়। কিন্তু এজন্য কুরআন যে ঢংয়ে ছবি এঁকেছে এর সাথে তার সম্পর্ক নেই, বরং এটি প্রাণ স্পন্দনে ভরপুর।

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ ط قَالُوا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ
صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ - وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ
اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ
عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ج فَلَا تَلُومُو
نِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ط مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط
إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ط إِنَّ الظّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ -

(সেদিন অনুসারীরা নেতাদেরকে বলবে ঃ) আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম— অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে কি ? তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন তবে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই সৎপথ দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই বা ধৈর্য

ধারণ করি সবই সমান, আমাদের রেহাই নেই। যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা করেছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম, আজ ভঙ্গ করছি। তোমাদের ওপরতো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, শুধু এটুকু ছাড়া, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করেছি আর তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না বরং নিজেদেরকে ভর্ৎসনা করো। আমি তোমাদের কোন উপকার করতে সক্ষম নই, আর তোমরাও আমার কোন উপকার করতে পারবে না। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছ, আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম। বস্তুত যারা জালিম তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(সূরা ইবরাহীম ঃ ২১-২২)

উপরিউক্ত আয়াতে তিনটি দলের চিত্র অংকিত হয়েছে। যা মূর্তমান হয়ে কল্পিত দৃশ্যে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

ক. দুর্বল লোক

এরা বড় লোকদের করুণা ভিখারী ছিল। এরা সর্বদা নিজেদের দুর্বলতা, মূর্খতা ও মুখাপেক্ষীতার কারণে নেতাদের জামার আস্তিনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে ব্যাকুল থাকতো। কিয়ামতের দিন তারা তাদের নেতাদের নিকট প্রথমে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য নিবেদন করবে। তারপর তারা তাদেরকে গুমরাহ করার জন্য দায়ী করবে।

খ. অহংকারী

এ দলটি হচ্ছে— নেতৃস্থানীয়, আমীর-ওমরা গোছের লোক, তখন লাঞ্ছনা ও অপমানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। নিজেদের পরিণতি তারা দেখতে পাবে। অনুসারীদেরকে দেখে তারা অত্যন্ত রাগান্বিত হবে। এদিকে অনুসারীদের অবস্থা হবে, নেতাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থা দেখেও তারা বিরত না হয়ে তাদের নিকট মুক্তির জন্য আবদার জানাবে। অথচ তারাই তখন মুক্তির জন্য অপরের মুখাপেক্ষী থাকবে। কিন্তু কেউ তাদের জন্য এগিয়ে আসবে না। তখন অনুসারীরা বলতে থাকবে— এ নেতারাই তো আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। অবশ্য এতে কোন উপকার তাদের সেদিন হবে না। আর নেতারা শুধু একথা বলেই চুপ হয়ে যাব, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখাতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে পারতাম।

গ. শয়তান

ইবলিস ধোঁকা, প্রতারণা এবং শয়তানীসহ সমস্ত অপকর্মের হোতা। সেদিন সে তার অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু আমি যে ওয়াদা তোমাদের কাছে করেছিলাম তা ছিল মিথ্যে, প্রতারণা। তারপর স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে ঃ আমিতো তোমাদেরকে জোর করে পথভ্রষ্ট বানাইনি। আমিতো শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছি, অমনি তোমরা দৌড়ে এসেছ। কাজেই আজ আমাকে ভর্ৎসনা না করে নিজেদেরকে ভর্ৎসনা করো।

এরপর সে শেষ কথা বলে দেবে। তোমরা যে সমস্ত কাজে আমাকে অংশীদার মনে করছো, সে সমস্ত কাজের দায়-দায়িত্ব থেকে আমি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।

ওপরের ছবিতে যে দৃশ্যের উপস্থাপন করা হয়েছে তা একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ দৃশ্যে আমরা দেখি নেতা ও অনুসারীগণ কেউ কাউকে চিনছে না। সবাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছে। তবু সে স্বীকারোক্তি কোন কল্যাণ বয়ে আনছে না। উপরন্তু এ বীভৎস্য দৃশ্য দেখে নিজের অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, যদি সে এমন কথা না-ই বলবে তবে আর তাকে শয়তান বলা হবে কেন। এ চিত্রটি মানুষের পুরো মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যদি সাদাসিদেভাবে কথাগুলো বলে দেয়া হতো, তবে ঐ শৈল্পিক সৌন্দর্য আর প্রস্ফুটিত হতো না, যা এই চিত্রে হয়েছে।

৪. সাধারণভাবে শুধু একথা বলে দিলেই হতো, কাফির-মুশরিকরা যে আমল করছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই এ অগ্রহণযোগ্য আমলকে যেসব কাফিররা প্রাধান্য দিচ্ছে তারা নিঃসন্দেহে বোকার স্বর্গে বাস করছে। তারা স্থায়ী বিভ্রান্তির শিকার সেখান থেকে তাদেরকে ফেরান বা সঠিক পথ প্রদর্শনের আর কেউ নেই। তাদের মস্তিষ্ক এ বুঝকে গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু যখন এ কথাগুলো এভাবে বলা হয় যেভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে তখন তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন এবং গতি সৃষ্টি হয়ে যায়। ইচ্ছে-অনুভূতির পৃথিবীকে আলোড়িত করে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ط
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ط
وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ - اَوْكَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ

فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ط ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَا
اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ط وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ –

যারা কাফির তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার মতো, যাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন সেখানে যায় তখন কিছুই পায় না, পায় আল্লাহ্‌কে। অতপর আল্লাহ্ তার হিসেব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্‌তো দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের কর্ম) উত্তাল সমুদ্রবক্ষে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এবং ওপরে ঘনকালো মেঘ। অন্ধকারের ওপর অন্ধকার। এমনকি যখন সে তার হাত বের করে তখন তা একেবারেই দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে আলোহীন করেন সে আর কোন আলোই পায় না। (সূরা নূর ঃ ৩৯ ঃ ৪০)

আলোচ্য আয়াতে এমন শৈল্পিক এক ছবি আঁকা হয়েছে যা একজন মানুষকে চূড়ান্তভাবে সম্মোহিত করে দেয়। এ যেন এক রূপকথা। চিন্তাশক্তি এখানে তার সমস্ত ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছে, কিন্তু রঙিন ছবির উপকরণ এবং তাকে চলমান করার জন্য এখনও এক বিরল তুলি এবং উৎকৃষ্ট ক্যামেরার প্রয়োজন।

প্রশ্ন হচ্ছে এমন তুলি ও ক্যামেরা কোথা থেকে সরবরাহ্ করা হবে যা সেই অন্ধকারকে উজ্জ্বলতর করে ফুটিয়ে তুলবে এ আয়াতে যে অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে। তারপর এক পিপাসার্তের ছবি যে মরীচিকার পেছনে দৌড়ে চলছে, সেখানে পৌছে কিছুই দেখতে পাবে না। হ্যাঁ, হঠাৎ সেখানে এমন জিনিস পায়, যা সে স্বপ্নেও চিন্তা করেনি। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র সত্তা। অতপর আল্লাহ্ চোখের পলকে তার হিসেব চুকিয়ে দেন।

এ আয়াতে আমরা সেই দ্বীনি উদ্দেশ্য দেখতে পাই— যে জন্য এ দৃশ্যটির অবতারণা করা হয়েছে। সেই সাথে আমরা অত্যাধুনিক এক শিল্পকলারও পরিচয় পাই, যা সদা প্রাণবন্ত এ ছবিতে বিদ্যমান।

৫. নিচের আয়াত ক'টিতে হেদায়েত পাওয়ার পর যারা গুমরাহ হয়ে যায় তাদের সুন্দর একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বের দেয়া উদাহরণের সাথে এটির মিল আছে। এখানেও কিছু জীবন্ত ছবি একের পর এক পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ص فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ – مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ج فَلَمَّآ

أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ - صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ - أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ج يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَٰفِرِينَ - يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ط كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ ق وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

তারা সেই সমস্ত লোক যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গুমরাহী খরিদ করে। বস্তুত তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং হেদায়েতও তাদের নসীব হয়নি। তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো, যে কোথাও আগুন জ্বালাল, যখন আগুন তার চতুর্দিকে আলোকিত করে ফেললো তখন আল্লাহ্ তার চারিদিকের আলো উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। আর তাদের উদাহরণ সেই সব লোকের মতো, যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ের রাতে পথ চলে, যা আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকে পরিপূর্ণ। মৃত্যু ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়, অথচ সমস্ত কাফিরই আল্লাহ্ কর্তৃক পরিবেষ্ঠিত। বিদ্যুতের চমকে যখন সামান্য আলোচিত হয় তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করেন তবে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে পারেন, আল্লাহ্তো সবকিছুর ওপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬-২০)

উল্লেখিত আয়াত ক'টিতে পর্যায়ক্রমে এক মনোজ্ঞ চিত্র অংকন করা হয়েছে। কিছুলোক রাতের আঁধারে আগুন জ্বালাল, তাতে তাদের চারদিক আলোকিত হয়ে গেল, হঠাৎ সে আলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় তারা সীমাহীন আঁধারে ডুবে গেল এবং সেই আঁধারের মধ্যেই তারা পথ চলতে লাগল। সাথে শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি।

একদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, অপরদিকে মেঘের গুরু-গম্ভীর নিনাদ, সাথে বিদ্যুতের চমক। ভয়ে দিশেহারা। বিজলীর সামান্য ঝিলিক দেখলেই বজ্রপাতের ভয়ে কানে আঙ্গুল ঠেসে ধরে। আবার বিজলীর

ঝিলিকে সামান্য ক্ষণের জন্য আলোকিত হয়, সে আলোকে ক'কদম পথ চলে পুনরায় থমকে দাঁড়ায়। সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তখন কি করবে।

এরূপ জীবন্ত ও চলমান ছবি তুলতে অত্যন্ত মূল্যবান ও স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার প্রয়োজন। কিন্তু এখানে ক্যামেরা নয় সামান্য ক'টি শব্দের মাধ্যমে জীবন্ত ও চলমান ছবিটি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে ছবিটিকে প্রাণবন্ত ও চলমান করার জন্য এমন কিছু আছে কি, যা ক্যামেরার দ্বারা সম্ভব— কিন্তু শব্দের দ্বারা সম্ভব হয়নি ? বরং মানব সত্তা শাব্দিক ছবি দেখেই বেশি আনন্দিত হয়। কারণ এর সাথে চিন্তাশক্তিও কাজ করে। সে ছবি আঁকে আবার মুছে দেয় এবং ছবিকে চলমানও করে। এ সময় মানব সত্তার মধ্যে আবেগের ঢেউ খেলে যায়। বিবেক প্রভাবিত হয়। হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। জানেন এটি কেন হয় ? শুধু কিছু শব্দের প্রভাবে।

উপসংহার

কুরআনে কারীমে চিত্রায়ণের যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার উপসংহারে আমরা ঐ জীবনী শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই যা দৃশ্যসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং যার উদাহরণ এ পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু দৃশ্যকে জীবনের স্পন্দন দিয়ে চলমান করা এ পদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কুরআনে কারীমে উপস্থাপিত ছবি শুধু এরূপ নয় যে, তার প্রকৃত অর্থটিই ছবিতে রূপান্তর হয়ে যায় বরং সেই ছবিতে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করা হয়। এবং তাকে জীবন্ত বস্তুর সাথে তুলনা করে যাচাই-বাছাইও করা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ কিয়ামতের বিভীষিকাময় চিত্রটির কথা বলা যেতে পারে। সেখানে দেখানো হয়েছে দুগ্ধদানরত মা তার সন্তানের কথা ভুলে গিয়ে ছুটতে থাকবে। গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। মানুষ দিশেহারা হয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে দৌড়াতে থাকবে, প্রকৃতপক্ষে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। এ অবস্থা শব্দের দ্বারা নয় ভীতির দ্বারা সৃষ্ট যা মানুষকে প্রভাবিত করে। এ অবস্থার সৃষ্টি শব্দ থেকে নয়, ভয়ঙ্কর ঐ অবস্থা থেকে যা মানুষের ওপর সংঘটিত হয়।

অন্যত্র সেই বিভীষিকার চিত্র অংকিত হয়েছে এভাবে ঃ মানুষ সেদিন পিতা, মাতা, ভাই ও বন্ধুদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيهِ –

সেদিন প্রত্যেকেরই একই চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (সূরা আবাসা ঃ ৩৭)

কিয়ামতের সেই ভয়াবহ চিত্রকে এমভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দেখে

মানুষ পেরেশান হয়ে যায়। ঘটনা যাচাই-বাছাই করার জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় সেই চিত্রে স্থির ও প্রাণহীন বস্তুকেও জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। যেন তারাও তাদের সাথে শামিল হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا -

সেদিন পৃথিবী পর্বতমালা কাঁপতে থাকবে এবং পবর্তমালা গুঁড়ো হয়ে বালুর টিবিতে রূপান্তর হবে। (সূরা আল-মুজ্জাম্মিল ঃ ১৪)

মনে হয় পৃথিবী কোন জীবন্ত বস্তু, যা ভয়ে কাঁপতে থাকবে।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا - السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ -

অতএব তোমরা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে, যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার করো যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে দেবে ? সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (সূরা আল-মুজ্জাম্মিল ঃ ১৭-১৮)

এ আয়াতে প্রথমে বালককে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে, তারপর আসমান ফেটে যাবার কথা বলা হয়েছে।

হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনায় তুফানের বিভীষিকাময় চিত্রটি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, অপরদিকে পিতা ও পুত্রের মাধ্যমে এক করুণ চিত্র অংকিত হয়েছে। পিতা নৌকায় আরোহণ করে প্লাবন থেকে বেঁচে যাচ্ছেন কিন্তু কলিজার টুকরা পুত্রের জন্য তিনি পেরেশান। প্লাবন পুত্রকে গ্রাস করে নিচ্ছে। (পিতা চিৎকার করে বলছেনঃ) 'আজতো সেই রক্ষা পাবে যাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করবেন।' ঝড়-তুফান ও প্লাবনের এক বিভীষিকাময় চিত্র অংকন করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ বড় বড় পাহাড় সমান ঢেউয়ের মধ্যে নৌকা চলতে লাগল। পিতা ও পুত্রের বিচ্ছেদের মাধ্যমে এ দৃশ্যকে আরও করুণ অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ করুণ অবস্থাটি এমন, যাকে ঝড়-তুফানের বিভীষিকাও ঢেকে দিতে পারেনি।

জাহান্নামীদের দুঃখ-কষ্টের প্রকাশ ঘটবে চিৎকারের মাধ্যমে, যার ছবি নিচের শব্দমালায় আঁকা হয়েছে ঃ

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ -

তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক! তোমার রব্বকে বলো আমাদেরকে যেন মৃত্যু দিয়ে দেন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে।

(সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৭৭)

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا -

এবং তারা (জাহান্নামীরা) সেখানে চিৎকার করতে থাকবে।

কিয়ামতের দিন একজন জাহান্নামী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে কি অবস্থায় পৌছবে তা শুধু কয়েকটি শব্দের মাধ্যমেই তুলে ধরা হয়নি বরং তা যেন এক জীবিত মানুষের মুখ দিয়েই বলানো হচ্ছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ط قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ -

আর যদি দেখ, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন ঃ 'এটি কি বাস্তব সত্য নয় ?' তারা উত্তর দেবে ঃ 'হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ।' তখন তিনি বলবে ঃ নিজেদের কুফুরীর কারণে আজ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করো। (সূরা আল-আনআম ঃ ৩০)

জাহান্নামীরা কিয়ামতের দিন প্রকাশ্যে আফসোস-অনুতাপ করবে, যেভাবে মানুষ কোন সুযোগ হারিয়ে আফসোস করতে থাকে।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا -

জালিমগণ সেদিন নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে কামড়াতে বলবে ঃ হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (আল-ফুরক্বান ঃ ২৭-২৮)

মুমিন এবং কাফিরের অবস্থার চিত্র অংকন করে জিহাদের উৎসাহ দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ - وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالَا يَرْجُوْنَ -

> তাদের পশ্চাদ্ভাবনে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাক তবে তারাও তো তোমাদের মতোই আঘাতপ্রাপ্ত। আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে আশা করো, তারা আশা করে না। (সূরা আন্-নিসা ঃ ১০৪)

কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ঈমানদার ও কাফিরদের পার্থক্য দেখিয়ে এক ছবি আঁকা হয়েছে। এ পার্থক্য দু'দলের অবস্থান ও তার পরিণতিকে কেন্দ্র করে।

বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা যেসব দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করেছি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কুরআনী দৃশ্যসমূহের প্রকার ও তার প্রাণশক্তি সম্পর্কে এ আলোচনাটুকুই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। যেভাবে এক প্রাণের স্পন্দন আরেক প্রাণে সঞ্চালিত হয়। যেভাবে কোন প্রভাব একটি জীবন্ত ও বাস্তব শরীর থেকে আরেকটি জীবন্ত শরীরকে স্পর্শ করে। তেমনিভাবে চিত্র ও বর্ণনার প্রভাবও মানুষের মনে পড়ে এবং সে-ও তার সাথে একাকার হয়ে যায়।

আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গির আরো একটি বৈশিষ্ট্য

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র অসামান্য ও অনুপম কলম যেসব জড় বস্তুর স্পর্শ করেছে তার মধ্যেই জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। যে পুরনো বস্তুকে ছোঁয়া দিয়েছে তা-ই নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এর কারণে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অলৌকিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সৃষ্টি অন্যান্য মুজিযা বা কুদরতের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

সকাল বেলার দৃশ্য প্রতিদিন দেখা যায়, জীবনের বার বার আসে এ সকাল। কিন্তু কুরআনের বিশেষ বর্ণনায় তা জীবন্ত রূপ লাভ করেছে কিন্তু কোন মানুষের চোখ তা দেখে না।

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ -

সকাল বেলার শপথ, যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে (উদ্ভাসিত হয়)।

(সূরা তাকভরি ঃ ১৮)

রাত সময়ের নির্দিষ্ট একটি অংশের নাম কিন্তু কুরআনের বর্ণনায় তাকে জীবিত ও নতুন মনে হয় ঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -

এবং রাতের শপথ, যখন তা অতিক্রান্ত হয়। (সূরা আল-ফজর ঃ ৪)

আল-কুরআনের মতে দিন দ্রুতবেগে রাতের পেছনে ধাবমান, রাতকে ধরার জন্যে ঃ

يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا –

তিনি পরিয়ে দেন রাতের ওপর দিনকে। এমতাবস্থায় দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৫৪)

ছায়া এক অতি পরিচিত বস্তু, কিন্তু কুরআন তাকে জীবন্ত ও চলমান প্রাণীরূপে উপস্থাপন করেছে ঃ

وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ – لَّابَارِدٍ وَّلَاكَرِيْمٍ –

এবং সে ছায়া হবে ধুঁয়ার, যা শীতল কিংবা আরামদায়কও নয়।

(সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৪৩-৪৪)

দেয়াল পাথরের মতোই এক জড় পদার্থ কিন্তু কুরআন তাকে বোধ ও অনুভূতিসম্পন্ন জীবিত প্রাণী হিসেবে উপস্থাপন করেছে ঃ

فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ –

অতপর তারা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা ঝুঁকে রয়েছে, পড়ে যাবার উপক্রম, তা তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

(সূরা কাহাফ ঃ ৭৭)

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ –

তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার ওপর উড়ন্ত পাখীদের প্রতি পাখা বিস্তাকারী ও পাখা সংকোচনকারী ? মহান আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন।

(সূরা আল-মুল্ক ঃ ১৯)

আল-কুরআন যে সমস্ত বস্তুর ছবি এঁকেছে তার মধ্যে আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, জঙ্গল, আবাদী জায়গা, অনাবাদী জমি, গাছপালা ইত্যাদি অন্যতম। এগুলোর জীবন্ত ছবি দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সে ছবিকে কেউই মৃত বলতে পারবে না, একেবারে জীবন্ত-চলমান।

এ হচ্ছে আল-কুরআনের বর্ণনা ও উপস্থাপনার পদ্ধতি। যা আল-কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

পরিশিষ্ট-১

সাত বছর আগে এ পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! ভাষাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক ও দ্বীনি মহলে এটি সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। এতে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, দ্বীন এমন বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চার পথে অন্তরায় নয় যা যাবতীয় বন্ধন ও শর্তাবলী মুক্ত হয়ে তার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আলোচনা করেছে। তাছাড়া এ থেকে আরো বুঝা যায়, নিয়ত যদি খালেস হয় এবং আত্মঅহমিকা ও প্রদর্শনেচ্ছা না থাকে তাহলে শিল্প ও বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বীনি চেতনার সাথে কোনভাবেই সাংঘর্ষিক নয়। তাই বলে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাধীনতার অর্থ মোটেও এই নয় যে, দ্বীন থেকে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে হবে। যা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী একদল লোকের ধারণা। কারণ তারা বিশেষ কোন জাতির ও ইতিহাসের ভিত্তিতে এ বিষয়টিকে দেখে থাকে। পাশ্চাত্যে যেমন দ্বীন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মধ্যে বৈপরীত্য ও সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তেমনিভাবে তারা ইসলামী দুনিয়ায়ও সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে চায়। অথচ একটি মুহূর্তের জন্যও ইসলামে দ্বীন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি। ইতিহাস তার সাক্ষী।

দ্বিতীয় আরেকটি কথা, যা এ মুহূর্তে বলা অত্যন্ত প্রয়োজন। তা হচ্ছে, চিত্রায়ণ পদ্ধতিই কি আল-কুরআনের প্রধান ও ভিত্তির মর্যাদা রাখে?

এ প্রশ্নের উত্তর আমি 'আল-কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এভাবে দিয়েছি ঃ

এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ গভীরভাবে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। এতে কোন সন্দেহ নেই, কুরআনী কিস্‌সা-কাহিনী, কিয়ামতের দৃশ্যাবলী, মানবিক উপমা উৎক্ষেপণ এবং প্রজ্ঞাপ্রসূত যুক্তির সাথে যদি মনোজাগতিক অবস্থা, চিন্তা ও মনন, কল্পনা ও রূপায়ণ এবং নবুওয়তের কতিপয় ঘটনার উদাহরণকেও শামিল করা যায়— তাহলে দেখা যাবে সেগুলোর অনুপাত ৪ ঃ ৩ প্রায়। উপরিউক্ত সবগুলো বিষয়ই চিত্রায়ণ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু সেইসব জায়গা এ পদ্ধতির বাইরে রাখা হয়েছে যেখানে শরয়ী কোন নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে কিংবা যুক্তি-প্রমাণের রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। অথবা সাদাসিদাভাবে কোন মাসয়ালা

বর্ণনা করা হয়েছে। চিত্রায়ণ পদ্ধতি ছাড়া এরূপ সাদাসিদা বর্ণনা আল-কুরআনের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। তাই আমার বক্তব্য অতিশয়োক্তি নয় যে, "আল-কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে চিত্রায়ণ ও দৃশ্যায়নের ওপর অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।"

যদি আল্লাহ্ তাওফিক দেন এবং আল-কুরআনের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করি তাহলে লোকের মনে ততোটুকু নিশ্চয়তা আসবে যতোটুকু নিশ্চয়তা আছে আমার মনে। যেমন—

১. তওরাত ও আল-কুরআনের কিস্সা-কাহিনী।

২. আল-কুরআনে মানুষের স্বরূপ।

৩. আল-কুরআনে যুক্তি-প্রমাণ।

৪. আল-কুরআনে শৈল্পিক উপকরণ।

এটি আমার জন্য অত্যন্ত খুশীর ব্যাপার যে, এ পুস্তকের মাধ্যমে আল-কুরআনের চিত্রায়ণ পদ্ধতির দিকে সামান্য হলেও মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে পেরেছি। এটি এ পুস্তকেরই ফল যে, আল-কুরআনের অধিকাংশ পাঠক ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ এমন জায়গায়ও শৈল্পিক চিত্র পান, যেসব জায়গার বর্ণনার আমার এ পুস্তকে পাওয়া যায় না। এরা যখন কোন জায়গায় শৈল্পিক সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করেন, তখন খুশীতে আত্মহারা হয়ে যান। একইভাবে তারা আল-কুরআন ছাড়াও বিভিন্ন কাব্য ও গদ্যের মধ্যেও শৈল্পিক সৌন্দর্য অনুসন্ধানে লেগে যান।

একজন লেখককের জন্য এটি কোন সাধারণ কথা নয় যে, তিনি শৈল্পিক সৌন্দর্যের যে সন্ধান দিলেন তা অন্যান্য লেখকগণও সাদরে গ্রহণ করলেন। এ সৌভাগ্য আমাকে খুশীতে আপ্লুত করেছে। এজন্য আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

শিল্পকলা পরিভাষাটির ভুল ব্যবহার

এখানে আরেকটি কথা না বললেই নয়। অধুনা শিল্পকলা পরিভাষাটির অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে, অথবা তার অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝা যায় না। কুরআনুল কারীমের তাফসীরেও এ শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়।

স্বীকার করছি, আজ থেকে সাত বছর আগে যখন এ পুস্তকের নামকরণ করলাম 'আত্ তাসভীরুল ফান্নী ফিল কুরআন' (আল-কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য) তখন আমার মাথায় একটি খেয়ালই ছিল— বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সৌন্দর্য

এবং তার ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো। এ রকম চিন্তাও কখনো আসেনি যে, শিল্পকলাকে কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিলে তা মনগড়া জিনিস হয়ে যায়, যার ভিত্তি খেয়ালীপনার ওপর। তার কারণ, আমি কুরআনের যে দীর্ঘ অধ্যায়ন করেছি তাতে এ ধরনের তাৎপর্য গ্রহণ করা যায় না।

আমি স্পষ্ট বলতে চাই এবং স্বীকারও করছি, মস্তিষ্ক প্রসূত কোন জিনিসকে দ্বীনি আকীদা হিসেবে আমি গ্রহণ করিনি। তবে তা এজন্য গ্রহণ করেছি, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অবশ্য আমি উপলব্ধি করেছি, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সমীহ্ করলেও আমার বিবেক আমাকে বাধ্য করেছে যেন তার সীমালংঘন না করা হয়। শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতে এমন কথাকে মেনে না নেয়া, যার পেছনে কোন দলিল-প্রমাণ নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, শিল্পকলা পরিভাষাটি এমন মনগড়া ও নতুন অর্থে কেন ব্যবহার করা হয় যার সমর্থনে যথার্থ কোন প্রমাণ নেই। তাহলে কেন এরূপ করা হয় ? এটি কি সম্ভব নয়— সত্যিকারের ঘটনাকে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ঢঙে বর্ণনা করা। যাতে তার সত্যতা ও কাহিনী বলবত থাকে ?

তাহলে কি হোমার ইলিয়িডের ভিত্তি মনগড়া কল্প-কাহিনীর ওপর রেখেছিল?

পাশ্চাত্যের যেসব গল্পকার, উপন্যাসিক এবং নাট্যকার আছেন তাদের শিল্পকর্মে কি সত্যের লেশমাত্র নেই ?

অবশ্য মিথ্যে একটি গল্পও শিল্পকলার সাথে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু শিল্পকলা সেখানে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় না। নিঃসন্দেহে সত্য ও মর্মের ভেতর সেই যোগ্যতা থাকে যা পুরোপুরি শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা যায়। এটি বুঝতে হলে খুব একটা কষ্ট করতে হয় না। শুধু পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামী পরিহার করতে হবে এবং ভাষার ব্যবহারিক দিকটির প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

চিন্তা ও দৃষ্টির স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, মানুষ যা ইচ্ছে তাই বলবে এবং যা খুশী তাই করবে। আমরা দ্বীনের পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে আল-কুরআনের ওপর এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নজর দিতে চাই। তাতে আমাদের সামনে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে, তা হচ্ছে গোটা সৃষ্টিলোকে এমন কোন গ্রন্থ্ নেই যা মানব ইতিহাসের এমন ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান যেখানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপকরণ রয়েছে, যতোটুকু উপকরণ আল-কুরআনের ঐতিহাসিক অংশে আছে।

আল-কুরানের বক্তব্যের যথার্থতা

আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য আমাদের কাছে শুধু দু'টো উপায় আছে। তার মধ্যে একটিও অকাট্য নয়। তাছাড়া সেখানে প্রমাণের শক্তিও বর্তমান নেই, যা আল-কুরআনে পাওয়া যায়।

উল্লেখিত দু'টো উপায়ের মধ্যে একটি হচ্ছে— ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ। যদি আল-কুরআন দ্বীনি পবিত্রতা থেকে না দেখে শুধু ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়, তো দেখা যাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস গ্রন্থ হতে এর মর্যাদা উর্ধ্বে। এ গ্রন্থের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর পুরনো ও নতুন দুশমনরাও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য যে, তিনি অতি সত্যবাদী একজন লোক ছিলেন।

এতে শুধু সেই ব্যক্তিই দ্বিমত করতে পারে, যে অপরের প্রতি অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে অনড়। কুরআনুল কারীমের সংকলন ও বিন্যাস এমন বিজ্ঞচিতভাবে করা হয়েছে সেখানে খুঁত ধরার কিংবা অঙ্গুলি নির্দেশ করার কোন অবকাশ নেই। একথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

আল-কুরআনে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এসেছে তা অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া সহজসাধ্য নয়। চাই তা কোন পবিত্র কিতাব হোক কিংবা ইতিহাসের। অন্যান্য আসমানী কিতাব যা কালের আবর্তনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। আল-কুরআন যেভাবে পর্যায়ক্রমে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে অন্য কোন কিতাব-ই সেভাবে (সুরক্ষিত অবস্থায়) আমাদের কাছে পৌছেনি। রইল ইতিহাসগ্রন্থ, যে সম্পর্কে সর্বদা সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ রয়েই যায়। মানব সমাজে যতো ইতিহাস গ্রন্থ আছে তার মধ্যে এমন একটি গ্রন্থও নেই, যার যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সুনিশ্চিত বলে ধারণা করা যেতে পারে।

এ কারণেই বুদ্ধি ও যুক্তির কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যে, একটি সাধারণ ইতিহাসের মানদণ্ডে আল-কুরআনের ঐতিহাসিক অংশের মূলায়ণ করা হবে। বিশেষ করে সেই ইতিহাসের সাথে যা যথার্থ নয়।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে— জ্ঞান-বুদ্ধি। আমি নির্দ্বিধায় সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সম্মানার্হ ও গ্রহণযোগ্য। একথা আমি দ্বীনের ভিত্তিতে নয়, চিন্তা ও গবেষণার ভিত্তিতে বলছি। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক যখন দাবি করে, সব বিষয়েই সে জেনে ফেলেছে, কোন জিনিসই তার জানার বাইরে নেই, তখন নিজেই তার সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট করে ফেলে। বুদ্ধি নিজেই জানে না সে কি জিনিস। কাজেই সে মানসিক ধারণার বিমূর্ত বিষয়সমূহ উপলব্ধি করবে কিভাবে ? এর অর্থ এই নয় যে, আমি মানুষের

বুদ্ধি-বিবেক ও স্বাধীনতার গুরুত্বকে অস্বীকার করছি। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে ততোটুকু মর্যাদা দেয়া উচিত যতোটুকু তার পাওনা।

ইউরোপের ধার্মিকগোষ্ঠী বস্তুবাদী দুনিয়ায় বসবাস করা সত্ত্বেও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় স্বাধীন মতামত প্রদান পছন্দ করতেন না। প্রতিক্রিয়া তার এই হয়েছে যে, বুদ্ধিজীবি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আমরা এ বিষয়টিকে প্রাচ্য ও ইসলাম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। কেননা এরূপ স্বাধীন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ অন্যদের ওপর বিনা দলিলেই প্রভাব বিস্তার করে বসবে যাকে আমরা নিন্দনীয় তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ বলতে পারি। এ থেকে বুঝা যায়, চিন্তার স্বাধীনতা বন্ধুত্বের একটি পন্থা। সেই বন্ধুত্বের সুবাদে আমরা বানরের মতো অপরের অনুকরণ করেই চলছি।

এতে সন্দেহ নেই, যারা 'আল-কুরআনের ঘটনাবলী' এবং 'কুরআনে আঁকা কিয়ামতের চিত্র' নিয়ে চিন্তা ও অনুসন্ধান করছিলেন তারা আমার মতোই বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। আমি ভাবতাম, আল-কুরআনে যেসব দৃশ্যের চিত্রায়ণ করা হয়েছে, তা কি এভাবেই সংঘটিত হয়েছে ? নাকি তা উপমা আকারে বর্ণিত হয়েছে ?

দীর্ঘদিন আমি এ সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি কিন্তু ঐতিহাসিক এমন একটি ঘটনাও পাইনি যার ওপর আমার অকাট্যভাবে বিশ্বাস স্থাপন হয় এবং আমি কুরআনের সাথে সেগুলোর তুলনা করবো, তার চিন্তাও করতে পারিনি যে, শুধু ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে কোন ঘটনা কুরআনের সাথে তুলান করা যেতে পারে। তখন এমন একজন দ্বীনদারও ছিলেন না, দ্বীনি বিষয়ে আমাকে খোলামেলা আলাপ করার ব্যাপারে নিষেধ করবে। পক্ষান্তরে আমি এতোটুকু বুঝতে পারতাম যে, আমার কথাগুলোকে কেউ যেন মিথ্যের ওপর ভিত্তি বলে উড়িয়ে দিতে না পারেন।

যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন সত্য পেয়ে যান যাকে কুরআনের সাথে তুলনা করা চলে তাহলে আমি শান্ত মনে তার কথা নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করতে তৈরী আছি। কিন্তু এমন সত্য অনুসন্ধানের আগে যদি এক ভিত্তিহীন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমার এ পুস্তককে মিথ্যে প্রতিপন্ন করা হয়, তা হবে স্বল্পবুদ্ধির পরিচায়ক। দ্বীনি মর্যাদায় আমার এ পুস্তকের মান যা-ই হোক না কেন।

কুরআনী পরিভাষার আলোকে বিরল বক্তব্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সৌন্দর্য এবং শক্তিশালী বর্ণনার নাম 'শিল্পকলা'। তার মধ্যে কোন কিছুই একথার দাবি করে না যে, সে সবের ভিত্তি শুধু অলীক চিন্তা-কল্পনার ও তার প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তবে শর্ত হচ্ছে— ব্যক্তির মধ্যে দৃঢ়তা, বুঝ ও উপলব্ধি যদি যথাযথভাবে থাকে।

আল-কুরআনের সূরা অবতীর্ণের ক্রমধারা

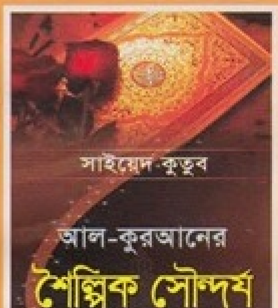
সূরার নাম	অবতীর্ণ ক্রম	সংকলন ক্রম
▼ সূরা আল-আলাক / সূরা ইক্‌রা বিইস্‌মি	০১	৯৬
▼ সূরা আল-মুজ্জাম্মিল	০২	৭৩
▼ সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির	০৩	৭৪
▼ সূরা আল-কলম	০৪	৬৮
▼ সূরা আল ফাতিহা / আস্‌ সাবাউল মাছানী	০৫	০১
▼ সূরা লাহাব / সূরা মাসাদ	০৬	১১১
▼ সূরা আত্‌-তাকভীর	০৭	৮১
▼ সূরা আল-আ'লা	০৮	৮৭
▼ সূরা আল-লাইল	০৯	৯২
▼ সূরা আল-ফাযর	১০	৮৯
▼ সূরা আদ-দোহ	১১	৯৩
▼ সূরা ইনশিরাহ / সূরা আলাম নাশরাহ সূরা আশ্‌ শর্‌হ	১২	৯৪
▼ সূরা আল-আসর	১৩	১০৩
▼ সূরা আল-আদিয়াত	১৪	১০০
▼ সূরা আল-কাওছার	১৫	১০৮
▼ সূরা আত-তাকাছুর	১৬	১০২
▼ সূরা আল-মাউন	১৭	১০৭
▼ সূরা আল-কাফিরূন	১৮	১০৯
▼ সূরা আল-ফীল	১৯	১০৫
▼ সূরা আল-ফালাক	২০	১১৩
▼ সূরা আল-নাস	২১	১১৪
▼ সূরা আল-ইখলাছ	২২	১১২
▼ সূরা আন-নায্‌ম	২৩	৫৩
▼ সূরা আবাস	২৪	৮০

সূরার নাম	অবতীর্ণ ক্রম	সংকলন ক্রম
▼ সূরা আল-কাদর	২৫	৯৭
▼ সূরা আশ-শাম্‌স	২৬	৯১
▼ সূরা আল-বুরূজ	২৭	৮৫
▼ সূরা আত্‌-তীন	২৮	৯৫
▼ সূরা কুরাইশ	২৯	১০৬
▼ সূরা আল-ক্বারিয়াহ	৩০	১০১
▼ সূরা আল-ক্বিয়ামাহ	৩১	৭৫
▼ সূরা আল-হুমাযা	৩২	১০৪
▼ সূরা আল-মুরসালাত	৩৩	৭৭
▼ সূরা ক্বাফ	৩৪	৫০
▼ সূরা আল-বালাদ	৩৫	৯০
▼ সূরা আত্‌-ত্বারিক	৩৬	৮৬
▼ সূরা আল-ক্বামার	৩৭	৫৪
▼ সূরা সাদ	৩৮	৩৮
▼ সূরা আল-আ'রাফ	৩৯	০৭
▼ সূরা জ্বিন	৪০	৭২
▼ সূরা ইয়াসীন	৪১	৩৬
▼ সূরা আল-ফুরক্বান	৪২	২৫
▼ সূরা ফাতির	৪৩	৩৫
▼ সূরা মারইয়াম	৪৪	১৯
▼ সূরা ত্ব-হা	৪৫	২০
▼ সূরা ওয়াকিয়া	৪৬	৫৬
▼ সূরা আশ-শুয়ারা	৪৭	২৬
▼ সূরা আন-নাম্‌ল	৪৮	২৭
▼ সূরা ক্বাসাস	৪৯	২৮
▼ সূরা বানী ইসরাইল/ সূরা আস্‌রা	৫০	১৭
▼ সূরা ইউনুস	৫১	১০
▼ সূরা হুদ	৫২	১১
▼ সূরা ইউসুফ	৫৩	১২
▼ সূরা আল-হিয্‌র	৫৪	১৫
▼ সূরা আল-আনআম	৫৫	০৬

সূরার নাম	অবতীর্ণ ক্রম	সংকলন ক্রম
▼ সূরা আস্-সাফ্ফাত	৫৬	৩৭
▼ সূরা লুকমান	৫৭	৩১
▼ সূরা আস্-সাবা	৫৮	৩৪
▼ সূরা আয্-যুমার	৫৯	৩৯
▼ সূরা আল-মুমিন / সূরা গাফির	৬০	৪০
▼ সূরা হা-মীম আস্-সাজদা / সূরা ফুস্সিলাত	৬১	৪১
▼ সূরা আশ্-শুরা	৬২	৪২
▼ সূরা যুখরুফ	৬৩	৪৩
▼ সূরা আদ্-দুখান	৬৪	৪৪
▼ সূরা আল-জাছিয়া	৬৫	৪৫
▼ সূরা আল-আহ্কাফ	৬৬	৪৬
▼ সূরা আয-যারিয়াত	৬৭	৫১
▼ সূরা আল-গাশিয়া	৬৮	৮৮
▼ সূরা আল-কাহ্ফ	৬৯	১৮
▼ সূরা আন্-নাহ্ল	৭০	১৪
▼ সূরা নূহ	৭১	৭১
▼ সূরা ইব্রাহীম	৭২	১৪
▼ সূরা আল-আম্বিয়া	৭৩	২১
▼ সূরা আল-মুমিনূন	৭৪	২৩
▼ সূরা আস্-সাজদাহ	৭৫	৩২
▼ সূরা আত্-তূর	৭৬	৫২
▼ সূরা আল-মুল্ক	৭৭	৬৭
▼ সূরা আল-হাক্কাহ্	৭৮	৬৯
▼ সূরা আল-মাআরিজ	৭৯	৭০
▼ সূরা আন-নাবা	৮০	৭৮
▼ সূরা আন-নাযিয়াত	৮১	৭৯
▼ সূরা ইনফিতর	৮২	৮২
▼ সূরা ইন্শিক্বাক	৮৩	৮৪
▼ সূরা আর-রূম	৮৪	৩০
▼ সূরা আল-আনকাবূত	৮৫	২৯
▼ সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন	৮৬	৮৩

সূরার নাম	অবতীর্ণ ক্রম	সংকলন ক্রম
▼ সূরা আল-বাকারাহ	৮৭	০২
▼ সূরা আল-আনফাল	৮৮	০৮
▼ সূরা আলে-ইমরান	৮৯	০৩
▼ সূরা আল-আহ্যাব	৯০	৩৩
▼ সূরা মুমতাহিনা	৯১	৬০
▼ সূরা আন-নিসা	৯২	০৪
▼ সূরা আল-যিলযাল	৯৩	৯৯
▼ সূরা আল-হাদীদ	৯৪	৫৭
▼ সূরা মুহাম্মাদ / সূরা কিতাল	৯৫	৪৭
▼ সূরা আর্-রা'দ	৯৬	১৩
▼ সূরা আর-রাহ্মান	৯৭	৫৫
▼ সূরা আদ্-দাহর / সূরা ইনসান	৯৮	৭৬
▼ সূরা আত্-তালাক	৯৯	৬৫
▼ সূরা আল-বাইয়্যিনাহ্	১০০	৯৮
▼ সূরা আল-হাশর	১০১	৫৯
▼ সূরা আন-নূর	১০২	২৪
▼ সূরা আল-হাজ্জ	১০৩	২২
▼ সূরা আল-মুনাফিকূন	১০৪	৬৩
▼ সূরা আল-মুজাদালাহ	১০৫	৫৮
▼ সূরা আল-হুজুরাত	১০৬	৪৯
▼ সূরা আত্-তাহ্রীম	১০৭	৬৬
▼ সূরা আত্-তাগাবুন	১০৮	৬৪
▼ সূরা আছ-সফ	১০৯	৬১
▼ সূরা আল-জুম'আ	১১০	৬২
▼ সূরা আল-ফাত্হ	১১১	৪৮
▼ সূরা আল-মায়িদা	১১২	০৫
▼ সূরা আত্-তওবা / সূরা বারায়াত	১১৩	০৯
▼ সূরা আন-নাসর	১১৪	১১০

সমাপ্ত



খায়রুন প্রকাশনী

ISBN-984-8455-15-3